# জানু ভানু কৃশানু

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭১, জানুয়ারি ১৯৬৪

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুনীল গুহ

মুদ্রাকর : বিশ্বনাথ কবিরাজ, হাতিবাগান প্রিণ্টার্স

৫৭, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৬

[illegible] বেশ কিছুটা নীচে [illegible] যেন ওই সমস্ত মেঘের ফাক-[illegible]র দিয়ে নীচে যাবার চেষ্টা করছে। তবে এটুকু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না, মেঘ ক্রমেই মসীবর্ণ হয়ে উঠছে—ঘন হয়ে উঠছে কোথাও কোথাও। হাওয়ার বেগও বোধহয় বেড়ে চলেছে।

অনেকক্ষণ থেকে একই ভাবে বসে আছি। লণ্ডন থেকে বৃটিশ ওভাবসিজেব সুপার কনষ্টালেশনে রওয়ানা হয়েছি দুপুব দুটোয়। তাবপব তিন ঘণ্টা পাব হয়ে গেছে। অবশ্য প্লেন যতই আমেরিকার দিকে এগিয়ে চলেছে ঘড়িব কাঁটা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে সেই অনুসাবে। আমি আড়মোড়া ভাঙ্গলাম। আর ঠায় বসে থাকা যায় না। গা এলিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

এধাব ওধাব তাকাতেই লক্ষ্য করলাম, অনেক যাত্রীই দিব্যি শুয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার গভীর ঘুমে অচেতন। আমি আর দ্বিরুক্তি না কবে দুধাবের হাতলে চাপ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিটের পিছনেব অংশ অনেকখানি হেলে গেল। সামনের দিক প্রসারিত হয়ে যাওয়ায় চমৎকার শোবাব জায়গা হয়ে গেল।

আমি শুয়ে পড়ার উপক্রম কবছি এমন সময় মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেনেব গলা ভেসে এল, অ্যাটেনশন প্লীজ। বাইবেব টেম্পারেচার এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তীব্র ঠাণ্ডা পড়েছে। প্রবল ঝড় ওঠার সম্ভাবনা আছে। ঝড় যদি কোন রকম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করে তবে অ্যাটলান্টিক অতিক্রম করতে আমাদের মোট পোনে আট ঘণ্টা সময় লাগবে।

মাইক্রোফোন নীরব হল।

ক্যাপ্টেন বোধ হয় আবার নিজের কাজে মন দিলেন।
—আপনি কি শরীর খারাপ বোধ করছেন?
ঘাড় ফিরিয়ে এয়ারহোষ্টেসের মিষ্টি মুখ দেখলাম
—না, না. তেমন কিছু নয়। আমি এখন ঘুমবার চেষ্টা করব
—বেশ তো।
মুখে হাসি টেনে এয়ারহোষ্টেস সরে গেল।

আমি এবার সত্যি সত্যিই ঘুমবার চেষ্টায় একাগ্র হলাম। কিন্তু চোখ বন্ধ করে দশ মিনিট পড়ে থাকার পরও ঘুম এল না। নানা চিন্তা মনের আনাচে কানাচে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। আট দিন হল দেশ থেকে যাত্রা করেছি। লণ্ডনে এক সপ্তাহ থেকে যেতে হয়েছিল—তারপর উড়ে চলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। আবার দেশে ফিরে যেতে সময় লাগবে পাকা দু' বছর।

এই বিচিত্র অবকাশে ফেলে আসা দিনের কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন শহর মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে আমি যখন কলকাতার জনারণ্যে মিশে গেলাম তখন আমার বয়স কুড়ি বছরের বেশী নয়। ছোট বেলা থেকেই ইতিহাস আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর ঝোঁক ছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন শেষ হল তখন আমি বিজ্ঞানের অন্তিম বেড়া টপকে গেছি।

গবেষণার সুযোগ পাব না জানতাম।

এবার চাকরী চাই।

অধ্যাপনার সুযোগ পেলেই ভাল হয়।

অনেক অবজ্ঞা, উপেক্ষা সহ্য করে—তিনটি বছর ধরে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েও কিছু হল না। খুঁটির জোর যাদের আছে তারা সহজেই উতরে যেতে পারছে। আমার তেমন খুঁটির জোর কই? হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ার কথা তখন ভাবতে আরম্ভ করেছি—ঠিক এই সময় ভাগ্যের করুণা ধারায় আমি ভেসে গেলাম।

চাকরী হল।

মোটা মাইনের চাকরী।

বছর দশেক আগে বম্বের উপকণ্ঠে মার্কিন মূলধনে একটি ওষুধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চাকরী পেলাম সেখানেই। আরো আটটি দেশে এঁদের কারখানা ছড়িয়ে রয়েছে। বিরাট প্রতিষ্ঠান। প্রধান কারখানা লস এঞ্জালেসে।

উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলাম কাজে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পাঁচটি বছর।

ইতিমধ্যে আমার পদমর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। জীবন যে শুধু ধূসর নয়, রঙ্গীনও তা অনুভব করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এই সময় চরম উৎকর্ষতার সন্ধান আমি পেলাম। মনের অবচেতনে যে সম্ভাবনা মাঝ মধ্যে উঁকি-ঝুকি মারতো তাই বাস্তবে রূপ নিল শেষ পর্যন্ত। লস এঞ্জালেসের প্রধান কারখানায় গিয়ে হাতে-কলমে কাজ দেখে-শুনে আসার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকেই মনোনীত করলেন।

সেদিন তেইশে মে।

এয়ার ইণ্ডিয়ার সেভেন জিরো সেভেন-এ যাত্রা করলাম।

প্রায় দেড় হাজার মাইলের দূরত্ব বিরাট বাধা স্বরূপ—তাই বাড়ীর কেউ বিমানবন্দরে উপস্থিত হতে পারেন নি। আমি অবশ্য মুঙ্গেরে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। বন্ধুবান্ধব আর অফিসের সহকর্মীরাই এসেছিলেন বিদায় জানাতে। লণ্ডনে পা দিয়েই বিশ্রী বৃষ্টির মুখোমুখি হলাম। বিশ্বের প্রাচীনতম এই শহরটিকে ভেজা জল হাওয়া সারা বছরই যেন গ্রাস করে থাকে।

অফিসের কিছু কাজ ছিল।

ওল্টার রবিন্স বললেন, তুমি যে কাজের ভার নিয়ে এসেছো তা দুদিনেই শেষ করে ফেলতে পারবে। বাকী পাঁচদিন লণ্ডনে স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়াতে পার।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আমাদের যে ব্যবসা হয় তার প্রধান ভারপ্রাপ্ত

হলেন রবিন্স। বললাম, অনুগ্রহ করে একজন গাইড ঠিক করে দেবেন। যে আমায় সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবে।

—গাইডের দরকার নেই। তুমি একাই পারবে।

—এই অজানা বিশাল শহরে—

আমাকে বাধা দিয়ে রবিন্স বললেন, তোমাকে লণ্ডনের একটা চার্ট দিয়ে দেব। নিশ্চিত ভাবে কোন কোন জায়গা দেখা দরকার টিক মার্ক দেওয়া থাকবে। ট্যাক্সিতে বসে জায়গাগুলোর নাম বললেই হল। এছাড়া অপেরা বা শেক্সপিয়ারের নাটকও দেখতে পার।

—আগাথাক্রিষ্টির "মাউস ট্র্যাপ" হচ্ছে নাকি ?

—গত কয়েক বছর ধরে নাটকটা হচ্ছে। টিকিট ঘরের সামনে এখনও যেমন ভীড় শুনছি তাতে মনে হয় এই সেঞ্চুরিতে শেষ হবার সম্ভাবনা নেই।

মৃদু হেসে কথাটা শেষ করলেন রবিন্স। তারপর সিগারেটকেস বাড়িয়ে ধরলেন।

—"মাউস ট্র্যাপ" আমাকে দেখতেই হবে।

আমরা সিগারেট ধরালাম।

লণ্ডনকে কেন্দ্র করেই আমাদের কথাবার্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। এক সময় বললাম, বেশ অস্বস্তি নিয়েই আমেরিকার মাটিতে পা দিতে হবে।

—কেন ?

—বৈভব আর বিত্ত উপচে পড়ছে ওখানে। আমার মত গরীব দেশের নাগরিকের পক্ষে ওখানে মানিয়ে নেওয়া বেশ অসুবিধা হবে নাকি ?

—অন্য যে কোন দেশের চেয়ে ওখানে ধনীর সংখ্যা অনেক বেশী তাতে সন্দেহ নেই। সমৃদ্ধিও তুলনাহীন। তবে ওখানেও মধ্যবিত্ত আছে, গরীব আছে, অসংখ্য বেকারও আছে।

একটু থেমে রবিন্স বললেন, ব্যাপারটা কি জান, দূর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা যতটা আলোকিত দেখি ততটা কিন্তু নয়, কাছে গিয়ে বুঝতে পারা যায় ওখানেও অন্ধকার আছে।

—অন্ধকার!

—বেশ গাঢ় অন্ধকার।

—নিগ্রোদের নিয়ে যে সমস্যা ওখানে রয়েছে, আপনি কি তারই কথা বলছেন?

একটু হেসে রবিন্স বললেন, ধরেছো ঠিক। বিশ্বমানবিকতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রাণ কাঁদতে থাকে। অথচ নিজের দেশের বেশ কিছু মানুষ যে উপেক্ষিত সে দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ তাঁদের নেই। আমি তিন বছর ওখানে ছিলাম। দেখেছি সাদা আর কালোর মধ্যেকার অসাম্যটা কি বিরাট। রেলের পোর্টার, হোটেলের বয়, কুলি অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম করেই নিগ্রোদের ওখানে বেঁচে থাকতে হয়।

ওয়াল্টার রবিন্সের মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনতে পাব ভাবতে পারিনি। বিশেষে তিনি একটি প্রখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তি। তাঁর কথার পর কিছু বলার পরিবর্তে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—কি ভাবছো?

—আপনার কথাই ভাবছিলাম।

—আমার কথা! আচ্ছা, বুঝলাম। দেখ, ওরা আমায় পদমর্যাদা দিয়েছে, অনেক টাকা মাইনেও দেয়, তাই বলে মনুষত্ব বিকিয়ে দেব তা কখনই হতে পারে না। উচিত কথা আমি সব সময় বলতে প্রস্তুত।

—আপনি বলছেন নিগ্রোদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না?

—শুধু আমি নয়, সমস্ত দুনিয়া বলছে একথা। এসমস্ত ব্যাপার নিয়ে ওদের কোন মাথা ব্যাথাই নেই। গোলমাল দেখা দিলে,

পুলিশ গিয়ে গুলি চালায়। এইভাবে বেশ কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ওরা দাবিয়ে রেখেছে।

—লিঙ্কনের পর জন কেনেডি নিগ্রোদের জন্য ভাল কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু—

—দুজনকেই গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

বললাম, অবশ্য আবার আশার আলো দেখা দিয়েছে। রবার্ট কেনেডি প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হয়েছেন। যদি জিততে পারেন, নিগ্রোদের উপকারই হবে।

—মনে হয় উনি জিতবেন। কিন্তু আর কথা নয়। তুমি তাড়াতাড়ি নিজের কাজকর্ম সেরে ফেলার চেষ্টা কর গিয়ে।

—আপনি কি পাকিস্তানী?

চটকা ভেঙ্গে গেল। ওয়াল্টার রবিন্সের খাস কামরা থেকে আমি ফিরে এলাম নিউইয়র্কগামী সুপার কনষ্টালেশনে। ঘাড় ফেরাতেই লক্ষ্য করা গেল প্রশ্ন কর্তা আমার পাশের সিটেই রয়েছেন। পোড় খাওয়া প্রৌঢ় মানুষ। ইংরাজীতে অবশ্য প্রশ্ন করলেন, তবে কোন দেশীয় সঠিক ভাবে বোঝা কষ্টকর।

—আমি ভারতীয়।

—নিউইয়র্ক পর্যন্তই যাচ্ছেন না, আর কোথাও যাবার ইচ্ছে আছে?

—লস এঞ্জালেসে যাব।

—আমি ইজরায়েলের লোক। অবশ্য কিছু দিন ধরে ইংলণ্ডেই আছি। এখন ব্যবসা উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে যাচ্ছি।

আমাদের আলাপ জমে উঠল। আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধের কথা উঠল। ভারত এখনও কেন ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করছে না এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন উনি। আমি অনেক যুক্তির অবতারণা না করে কেন এখন তা সম্ভব হচ্ছে না বুঝিয়ে বললাম।

কথায় কথায় যে বেশ কিছু সময় কেটে গেছে বুঝতে পারি নি।

মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আমরা যাত্রা শেষ করে এনেছি। আর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে নিউইয়র্কে প্লেন অবতরণ করবে।

আমি জানালার কাচের উপর ঝুঁকে পড়লাম। সুপার কনষ্টালেশন আর ত্রিশ হাজার ফিট উপরে নেই। অনেক নীচে নেমে এসেছে। অজস্র গগনলেহী স্কাই স্ক্রাপারগুলির উদ্ধত ভঙ্গী দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরের এই হোর্ম্ম-শিল্পের বুঝি তুলনা নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুপার কনষ্টালেশন তার যাত্রা শেষ করল। ল্যাণ্ড করবার সময় আমি সামান্য জার্ক অনুভব করলাম। এবার নামার পালা। কোন ব্যস্ততা নেই, কোন হুড়োহুড়ি নেই। অথচ মাটির সংস্পর্শে আসার জন্য সকলেই নিদারুণ উৎসুক। সারিবদ্ধভাবে যাত্রীরা নেমে চললেন। এক সময় আমিও পা দিলাম নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে।

তীব্রসুখাবেগ মনকে উদ্বেল করে তুলল। মহাবিস্ময়কর এই সেই নিউইয়র্ক—সুদূর কল্পনাতেও মনে স্থান পায়নি সেখানে কোন দিন আমি পৌছাতে পারব। অথচ সেই অকল্পনীয় ব্যাপারই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। কোটের চওড়া কলার একটু তুলে দিয়ে আমি দ্রুত পায়ে এগুলাম।

কাষ্টমস চেকিং-এর ঝামেলা আছে। লণ্ডন বিমান বন্দরে এই ব্যাপারে বেশ দুর্ভোগ গেছে। মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। যাত্রীরা বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলেছেন। ট্রলি বাসে মেন বিল্ডিং-এর কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য রয়েছে। কিন্তু কেউই বাস ব্যবহার করেননি। মাটিতে হেঁটে চলার আনন্দ সকলেই উপভোগ করতে চান।

আরো একটা চিন্তা আমার মনকে পাক দিয়ে চলেছে। লণ্ডন থেকেই আমাদের নিউইয়র্কের প্রতিনিধি ফ্রেড রেমার্ককে তার করে

দিয়েছিলাম। তিনি বিমান বন্দরে এসে আমাকে রিসিভ করবেন। ভদ্রলোক যদি না এসে থাকেন তবে অথৈ জলে পড়তে হবে।

ক্রমে আমরা লাউঞ্জকে পাশ কাটিয়ে কাষ্টমস চেকিং হলে প্রবেশ করলাম। তল্লাস আরম্ভ হল। কাগজ পত্রের পরীক্ষা চলতে লাগল। লণ্ডনের মত বিরক্তিকর পরিবেশ নয় লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলাম। চেকিং-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন মহিলা—তাঁকে বিমান বন্দর কর্মী বলেই মনে হয়, যাত্রীদের কি সমস্ত প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে আসছেন। ভারতীয়রাই যে তাঁর লক্ষ্য তাও বুঝতে পারলাম।

ক্রমে তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—আপনি কি মিঃ ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ।

—ফ্রেড রেমার্ক আপনার জন্য রেষ্টুরেণ্টে অপেক্ষা করছেন।

—ধন্যবাদ।

—তিনি প্রবেশ দ্বারের ডান ধারের তৃতীয় টেবিলে আছেন। তাঁর গায়ে আছে চেষ্টনাট কালারের স্যুট আর চোখে আছে মোটা ফ্রেমের চশমা—চিনতে পাবার সুবিধার জন্য তিনি এ সমস্ত কথা বলতে বলেছেন।

—আমার বড় উপকার করলেন মিস। ধন্যবাদ।

চেকিং শেষ হল একসময়। বলতে গেলে বেশ দ্রুতই ব্যাপারটা ঘটল। লণ্ডনের মত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হল না। চেকিং হল থেকে বেরিয়ে আমি লাউঞ্জে এলাম। মালপত্র নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বিমান কোম্পানীর অফিসেই ওগুলি চলে যাক, পরে সময় করে ছাড়িয়ে আনলেই হবে।

এধার ওধার তাকাচ্ছি। অজস্র দরজার মধ্যে রেষ্টুরেণ্টে ঢোকার পথ কোনটা তাই নিয়েই এখন আমার মাথাব্যথা। একজন পোর্টার কয়েকহাত দূর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। অগত্যা এগিয়ে গিয়ে তাকেই

প্রশ্ন করলাম। নিগ্রো পোর্টার মৃদু হেসে সমস্যার সমাধান করে দিল।

রেষ্টুরেণ্টের অবস্থান লাউঞ্জের আরেক প্রান্তে।

ব্যস্ত মানুষদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে পৌঁছালাম সেখানে। কাঁচের ভারী পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ডান দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। তৃতীয় টেবিলের সামনে চেষ্টনাট কালারের স্যুট আর ভারী ফ্রেমের চশমা পরা যে লোকটি দৈনিক পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন তাঁর বয়স মোটেই আজ্ঞে আপনি করার মত নয়।

একটু বাড়িয়ে যদি ধরা যায়, তবুও আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বেশী বড় হবে না। আমি একটু অবাক হলাম এই ভেবে যে, নিউ-ইয়র্কের মত জমজমাট কেন্দ্রে আমাদের কোম্পানীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ওই অল্প বয়সী লোকটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা মনের মধ্যে জমে উঠল। নিশ্চয় অপরিসীম যোগ্যতা আছে, নইলে এমন হবার নয়।

নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক মুখ তুললেন।

—আপনি কি মিঃ ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ। আমি বোধ হয় মিঃ রেমার্কের সঙ্গে কথা বলছি।

—ঠিক তাই। বসুন—বসুন—

আমি বসলাম।

ফ্রেড রেমার্ক ঠোঁটের কোণে হাসি জাগিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি নিশ্চয় ক্লান্ত। কোকো আনতে বলি।

—আমাদের দেশে কোকোর তেমন চল না থাকায় অভ্যস্ত নই। বরং কফি—

—বেশতো কফিই আসুক।

তিনি কফির অর্ডার দেবার পর বললেন, আমাদের দেশে পা দেবার পর কেমন লাগছে বলুন?

স্মিত হেসে বললাম, দারুন ভাল লাগছে।

—এখনও তো এদেশের কিছুই দেখেন নি। দারুণ ভাল লাগছে কি রকম?

—ব্যাপারটা কি জানেন, আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি আমেরিকার মাটিতে পা দেব। সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়ে উঠার মুহূর্তেই তাই মন ভরে উঠেছে।

—বাইরে থেকে এদেশকে সোনায় মোড়া মনে হয় বটে। তবে কি জানেন, আমরা—আমেরিকানরা বুঝতে পাচ্ছি ক্রমেই আমেরিকার জৌলুস কমে যাচ্ছে।

কফি ও স্যাণ্ডউইচ এসে পড়ল।

কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই খাওয়া শেষ হল একসময়। রেমার্ককে আমার বেশ ভাল লাগছে। বিল মিটিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে কারপার্কের জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মোটর কারের যেন সমুদ্র। কত রং-এর, কত ডিজাইনের গাড়ী যে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হিসাব করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ।

নিজের গাঢ় নীল রং প্যাকার্ডখানা বার করে আনতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল রেমার্কের। এবার আমরা যাত্রা করলাম। বিমান বন্দর থেকে মূল শহরের ব্যবধান অতিক্রম করার পর চোখ ঝলসান পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লাম। চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ ডলারের খেলা এক নজরেই বুঝতে পারা যায়।

চতুর্দিকে স্বচ্ছলতা যেন উপচে পড়ছে।

বিস্ময় মনের মধ্যে পাক দিয়ে চলেছে। আমরা কোথায় পড়ে আছি ভাবতেও খারাপ লাগছে। ক্রমে বিশ্বশ্রুত মাডিসান স্কোয়ার অতিক্রম করলাম আমরা। দক্ষ চালকের হাতেই পরিচালিত হচ্ছে প্যাকার্ড।

একসময় গাড়ী বাঁদিকে মোড় নিয়ে, গজ পঞ্চাশেক এগুবার পর

একটি বাড়ীর সামনে থামল। গাড়ী থেকে নামলাম আমরা। বাড়ীর উপরিভাগ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। কুড়ি তলা বা তার বেশী অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না।

—সতেরো তলায় আমার এ্যাপার্টমেণ্ট। আসুন—

রেমার্কের পিছু পিছু আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলাম। ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ। সারি সারি লিফ্ট—বহু লোক উঠানামা করছে। অথচ এতটুকু চেঁচামেচি নেই। কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়ীগুলোর কথা মনে পড়ল, শুধু কলকাতার কথা বলা বৃথা—বম্বের ও ওই এক অবস্থা, বাড়ীগুলো যেন মেছোহাট।

সুদৃশ্য অটোমেটিক লিফটের সাহায্যে আমরা সতেরো তলায় এসে পৌঁছলাম অল্প সময়ের মধ্যে। লম্বা করিডর চলে গেছে। দুপাশে ঝকঝকে বিস্কুট রং-এর দরজার শ্রেণী। এই তলায় কতগুলো এ্যাপার্টমেণ্ট আছে কে জানে। যে দরজাব সামনে রেমার্ক আমাকে নিয়ে উপস্থিত হল, তার মাথায় এন ১৯২ লেখা রয়েছে দেখলাম।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল।

চৌকাঠের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রগাঢ় যৌবনা এক তরুণী। মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলেছে। অপূর্ব সুন্দরী অবশ্য তাকে বলা চলে না। তবে মিলিয়ে জুলিয়ে মুখের মধ্যে এমন কিছু আছে যা যেকোন পুরুষের মনে হিল্লোল তুলবে।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সুসজ্জিত বিশাল ঘর। ওধারে কিছু দূরের ব্যবধানে দুটি দরজা। বুঝলাম ওয়ান রুম এ্যাপার্টমেণ্ট। ঐ দুটি দরজা দিয়ে বোধ হয়, কিচেন কাম ডায়নিং স্পেস আর বাথরুমে যাওয়া যায়।

বেমার্ক সাড়াম্বরে আমার পরিচয় দেবার পর বললেন. ইনি আমার ভাবী স্ত্রী হান্না রাইগার।

হান্না হাসিমুখে বলল, ফ্রেড গতকালই আপনার এখানে আসার কথা আমায় বলেছে। বলতে গেলে আপনাকে দেখার জন্য আমি

একটু ব্যস্তই ছিলাম। মুখে হাসি টেনে আমি বললাম, এ আমার সৌভাগ্য। তবে আমাকে দেখে বোধ হয় হতাশ হচ্ছেন।

—কখনই নয়। আপনি এত স্মার্ট হবেন বরং তাই ভাবতে পারিনি। ভারতীয় আমি দেখেছি অনেক—শুনলে অবাক হবেন, আপনার সঙ্গেই প্রথম আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছি।

—আমিও কিন্তু প্রথম একজন মার্কিন মহিলার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছি।

—তাই নাকি!

রেমার্ক বললেন, হান্না, মিঃ ব্যানার্জী নিশ্চয় ক্লান্ত। ওঁর জন্যে কিছু নিয়ে এস।

—হুইস্কি না জিন কি খাবেন বলুন?

হান্নার কথায় আমি একটু বিব্রত হলাম।

—হুইস্কি বা জিনে আমি অভ্যস্ত নই। এয়ারপোর্টে তো কফি খেয়েছি। এখন আর কিছু দরকার হবে না।

আপনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন? মদ খাওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র বাহাদুরী নেই। তবে একেবারেই গলা ভেজাবেন না, তা হতে পারে না। আমি বরং আপনার জন্যে এক গেলাস বরফ দেওয়া সিরাফ নিয়ে আসি।

হান্না ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে অদৃশ্য হল। ডায়নিং স্পেসে গেল নিশ্চয়। রেমার্ক সিগার ধরালেন। আমিও ভারতীয় ক্যাপষ্টান নিজের দুই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিলাম।

কালচে হলদে ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করে রেমার্ক বললেন, কেমন দেখছেন হান্নাকে?

—চমৎকার।

—আগামী মাসের দশ তারিখে আমাদের বিয়ে। আপনাকে সময় মত খবর পাঠাব।

—উনি থাকেন কোথায়? কাছাকাছি নিশ্চয়?

—কাছাকাছি ঠিক নয়। লং আইল্যাণ্ডে অর্থাৎ নিউইয়র্কেরই আরেক প্রান্তে বাবা মার সঙ্গে থাকে। দিন তিনেক হল আমার অ্যাপার্টমেণ্টে এসে রয়েছে। আজই কিছুক্ষণ পরে চলে যাবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। অবিবাহিতা যুবতী তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে একই ঘরে কয়েক রাত কাটাচ্ছে, অথচ—। অথচ রেমার্কের বলার মধ্যে কোন সংকোচ নেই। কেমন নির্লিপ্ততা রয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা আমার যেন কেমন লাগছে।

—কি বলুন তো?

—আপনাদের এখনও বিয়ে হয়নি। অথচ—

রেমার্ক হাসলেন।

—আমেরিকায় এ অতি সাধারণ ব্যাপার। এ সমস্ত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, মনের মিলই হল আসল কথা। বিয়ে আজ নয় কাল তো হবেই। আর শেষ পর্যন্ত কোন কারণে যদি নাই হয়, তাতেও কিছু যায় আসে না।

—এর আরেকটা দিকও তো আছে। সুবিধাবাদী পুরুষের সংখ্যাও তো অল্প নয়। মহিলাটি প্রেগনেণ্ট হবার পর যদি কেউ কেটে পড়ে?

—কেউ কেন, মধু খেয়ে অধিকাংশ ভ্রমরই তো উড়ে যায়। তাতেও কোন অসুবিধা হয় না। অ্যাবরশানের ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কেউ অ্যাবরশানে রাজী না হয়, তাতেও কিছু যায় আসে না। আজকের মার্কিন প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে দেখুন—কত বড় বড় পোষ্টে জারজরা কাজ করছে।

এরপর একটু থেমে বললেন, মজার কথা জানেন, আমার মা'রও বিয়ে হয়নি আমার বাবার সঙ্গে।

আমি অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়লাম।

বললাম নম্র গলায়, কিছু মনে করবেন না। এ প্রসঙ্গ অবতারণা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

—আপনি মিথ্যে সঙ্কোচ করছেন। এ সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র ইতঃস্ততবোধ নেই। গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমার ঠাকুর্দাদা ভাগ্যের সন্ধানে জার্মানীর ষ্টুটগার্ড থেকে এখানে এসেছিলেন। করিত-কর্ম্মা লোক ছিলেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই মোটা আয়ের ব্যবস্থা তিনি করে ফেললেন। বাবা ছিলেন কেমিষ্ট। এই নিউইয়র্কেই তাঁর সঙ্গে মা'র আলাপ হয়। দুজনের বিয়ে যখন পাকাপাকি আমি তখন মার পেটে এসে গেছি। দুজনের বিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না। ল্যাব্রটারীর এক দুর্ঘটনায় বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা কিন্তু পরে আর বিয়ে করেননি। আপ্রাণভাবে আমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছেন। আমার কলেজ জীবনের তৃতীয় বছরে তিনি মারা গেলেন।

নির্লিপ্ত ভঙ্গীতেই রেমার্ক নিজের কথা শেষ করলেন।

এবার কি বলব প্রথমে ঠিক করতে পারলাম না। একটু চুপ করে থেকে বললাম, আপনার মা'র শরীরেও কি জার্মান রক্ত ছিল?

—হ্যাঁ। আপনি শুনলে অবাক হবেন, হান্নার ঠাকুর্দাদার বাবাও জার্মানী থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন।

এই সময় হান্না ঘরে প্রবেশ করল। এগিয়ে এসে সেণ্টার পিসের উপর ট্রে নামিয়ে রাখল। একটা গেলাসে বরফ দেওয়াই ছিল, বোতল থেকে বিয়ার ঢেলে এগিয়ে ধরল হান্না। আমি গেলাস হাতে নিলাম। ততক্ষণে হুইস্কিতে সোডা মিশিয়ে ফেলেছেন রেমার্ক।

গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার এত দেরী হল?

হান্না মৃদুগলায় বলল, কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে নিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমায় যেতে হবে। আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জী এতদূরে চলে এসেছেন বান্ধবীর জন্য নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে?

মুখে হাসি টেনে বললাম, আমার কোন বান্ধবী নেই।

—সে কি!

মহা আশ্চর্য্য হল হান্না।

রেমার্ক বললেন, নারী বিহীন পুরুষের জীবনের কোন মূল্য আছে?

—নেই। আমার স্ত্রী আছেন।

—তাই বলুন। বাচ্চা—?

—একটি। দেখুন না—

আমি কোটের ভিতরের পকেট থেকে ওয়ালেট বার করলাম। তার মধ্যে ছবি ছিল। হান্না তাড়াতাড়ি ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। রেমার্কও সাগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন।

—চমৎকার। কি নাম রেখেছেন মেয়ের?

হান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

—গুঞ্জা।

—এর মানে কি?

—সুমধুর ধ্বনী। আমরা—বাঙ্গালীরা ইদানিং নামের বৈচিত্রের দিকে ঝোঁক দিয়েছি।

আরো কিছুক্ষণ সময় কাটল আমার পারিবারিক আলোচনায়। তারপর রেমার্ক উঠে পড়লেন। এবার তিনি হান্নাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। দুজনে বেরিয়ে যাবার পর আমি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরু-কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো ঝলমল নিউইয়র্কের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। আমি এখন যা দেখছি, কখনও তা দেখতে পাব বলে কি আশা করেছিলাম। নিজের উপরই হিংসা হতে লাগল।

অভ্যাস মত ঘুম ভেঙ্গে গেল সকালেই। একটা বড় সোফা কাম বেডে আমি ও রেমার্ক শুয়েছিলাম। ভারী পর্দা জানালা-গুলোর উপর টানা থাকায় মোটেই দিনের আলো ঘরে প্রবেশ করছিল

না। সোফা ছেড়ে উঠে পর্দা অল্প সরিয়ে দিতেই প্রকৃতির গোমড়া মুখ চোখে পড়ল।

বৃষ্টি অবশ্য পড়ছে না। তবে আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। পর্দা আবার যথাস্থানে সরিয়ে সোফার দিকে ফিরে আসছি—দেখলাম, রেমার্ক উঠে পড়েছেন। তিনি ঘরের আলো জ্বালালেন। তারপর নব ঘুরিয়ে সচল করে দিলেন টিভি।

—আপনি গতকালের সংবাদ চিত্র দেখুন। আমি কফি করে আনি।

কথা শেষ করেই তিনি ডায়নিং স্পেসের দিকে চলে গেলেন। আমি টেলিভিশানের পর্দার দিকে তাকালাম। সচল এই যন্ত্রটিকে জীবনে প্রথম দেখছি। দেশে দিল্লীতে টিভি ষ্টেশন আছে। কিন্তু আমি বম্বের অধিবাসী, কাজেই সুবিধা হয়নি। লণ্ডনে অবশ্য এই অভিজ্ঞতা হতে পারতো। কিন্তু কাজ আর বেড়ান নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্যদিকে তাকাবার ফুরসত পাইনি।

ডকুমেণ্টারি ফিল্মের মত রাজনৈতিক টুকরো চিত্র দেখান হচ্ছিল। প্রেসিডেণ্ট জনসন ওয়াশিংটনে বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন—দুজন ভারতীয় সাংবাদিকও রয়েছেন দেখলাম। পশ্চিম এশিয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর চলছে।

বেশ কয়েক মিনিট ধরে এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখান হল। এরপর রবার্ট কেনেডিকে দেখলাম। চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট নেই। সাদা মাটা মুখ। তবে চোখের ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করার মত। তিনিও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। সাংবাদিক ছাড়াও, বেশ কয়েকজন সুবেশ ও বিশালদেহী নিগ্রো রয়েছে তাঁর আশে পাশে। নিক্সনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক আস্থাসূচক ভোটের ফলাফল কি হবে সে সম্পর্কেই কথা হচ্ছে সাংবাদিকদের সঙ্গে।

রেমার্ক হাতে ট্রে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

ধূমায়িত কফি ও কিছু খাদ্যবস্তু রয়েছে ট্রেতে। আমি সহজাত অভ্যাস অনুসারে বাথরুমে চলে গেলাম। প্রাতকৃতঃ সেরে ফিরে আসতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগল না। খেতে খেতে আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল।

প্রশ্ন করলাম, রবার্ট কেনেডি সম্পর্কে আপনার ধারনা কি ?

—আমার তো মনে হয় উনিই আমাদের ভাবী প্রেসিডেণ্ট।

—এই ধারনার পিছনে নিশ্চয় কোন সঙ্গত কারণ আছে ?

—দেখুন, নিক্সনের চেয়ে ববি কেনেডি অনেক বেশী পপুলার। তাছাড়া মধ্যবিত্তদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাঁর উপর। এরপর নিগ্রোদের কথা ধরুন, লিঙ্কনের পর তারা সবচেয়ে বেশী সম্মান জানিয়েছে 'জন কেনেডিকে'। জনের মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুতে তারা নিদারুণ শোকাহত হয়েছিল। এখন ববি তাদের কাছে দেবতা বিশেষ।

আমি সিগারেট ধরালাম।

বললাম এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আমেরিকা সারা পৃথিবীর অভাব আর বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যস্ত—অথচ নিজের দেশে কালোরা যে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত সে সম্পর্কে উদাসীন। একথা যখনই ভাবি অবাক হয়ে যাই। কিছু মনে না করলে এসম্পর্কে কিছু বলুন ?

রেমার্কও সিগারেট ধরিয়েছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে ধোঁয়া তাঁর মুখকে আড়াল করে সরে যাচ্ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু সময় নিলেন তিনি। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে মৃদু হাসলেন।

—ব্যাপারটা কি জানেন, বিষয়টি হল বিতর্কিত। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈষম্য নেই। কোথাও কোথাও এত তীব্র যে প্রায়ই দাঙ্গা হয়। অবশ্য দিন কাল ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। আজকাল নিগ্রোদের অধিকারের সীমা প্রসারিত হয়েছে। ভাল ভাল চাকরীতে নেওয়া হচ্ছে তাদের। মনে হয়, আগামী শতাব্দীতে সাদা কালো বলে কোন সমস্যাই থাকবে না আমেরিকায়।

আমি অবশ্য ভাল ভাবেই জানি সমস্যা থাকবে। বরং আরো উগ্র আকার ধারন করবে। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম রেমার্ক বিব্রত বোধ করছেন। উনি হয়তো ভীষণ কালো বিরোধী। কিম্বা হয়তো কিছুই নন—ও সমস্ত নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না। আসল কথা হল, যে সমস্ত আমেরিকানের শালিনতা বোধ আছে, তারা বিদেশীদের সামনে এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হলে, কি ভাবে পরিস্থিতিকে সামাল দেবে তার হদিশ খুঁজে পায় না।

আমি এবার প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম।

আরো ঘন্টাখানেক নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হল। তারপর রেমার্ক বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। আমার স্যুটকেশ ইত্যাদি কিছুই কাছে নেই। গতরাত্রে গৃহস্বামীর পাজামা পরেই শুয়েছিলাম। এখন দ্রুতহাতে নিজের পোষাক পরে নিয়ে তৈরী হয়ে রইলাম।

দুজনে যখন লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন সবে সাড়ে সাতটা। নামতে নামতে একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় প্রশ্ন করলাম, আপনি কাল গাড়িটা বাইরে রেখেই চলে এলেন। চুরি যাবার সম্ভাবনা নেই ?

—কার অ্যাটেণ্ডেট আছে।

—রাতের পর রাত গাড়ী খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকে ? মৃদু হেসে রেমার্ক বললেন, এই নিউইয়র্ক শহরে কম করেও দু'লাখ গাড়ী খোলা আকাশের নীচেই পড়ে থাকে। আমেরিকায় বিরাট গ্যারেজ সমস্যা। অবশ্য সেদিক থেকে আমাকে আপনি ভাগ্যবান বলতে পারেন। এই বাড়ীর নীচেই পেট্রোল পাম্প আছে। ওখানে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

নীচে নেমে আমরা সদর দরজা পেরিয়ে ফুটপাথে এলাম। রেমার্কের গাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। বুঝলাম, চাবি সুইচে লাগানই থাকে। পাম্পের লোকেরা এসে যথাস্থানে নিয়ে যায়।

বিশাল বাড়ীটার দক্ষিণ দিকের নীচের অংশে পৌছে আমি এমনকিছু দেখলাম, যার সঙ্গে আমাদের দেশের পেট্রোল পাম্পের কোন তুলনা চলেনা। ঝকঝকে তকতকে ছাদ বিশিষ্ট বিশাল অংশ। বার আছে, রেষ্টুরেন্ট রয়েছে—রয়েছে টয়লেট রুম। নানা মডেলের অসংখ্য গাড়ী সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান কয়েক সারিতে। সাদা ও কালো কর্ম্মীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ছে।

একজন বয়স্ক নিগ্রো এগিয়ে এসে আমাদের সুপ্রভাত জানাল।

রেমার্ক বললেন, সুপ্রভাত জেফ্রি। আমার এই ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে রাস্তায় একটু ঘোরা-ফেরা করতে চাই। গাড়ীটা বার কর।

—এখুনি স্যার—

সে চলে গেল।

—জেফ্রি চমৎকার মানুষ। গ্রাহকরা সকলেই ওকে পছন্দ করে। ও এই পাম্পের প্রাণ বলতে পারেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেমার্কের গাড়ী পাম্পের বাইরে নিয়ে এল জেফ্রি। এবার লোকটকে ভালো করে দেখলাম। শক্তপোক্ত বিশাল চেহারা। ঘন কোঁকড়া চুল ধূসর হয়ে এসেছে। পুরু ঠোঁটের কানায় কানায় ভাল লাগে এমন হাসি। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্নর মধ্যে।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন রেমার্ক।

—আমরা কোথায় চলেছি।

—নিউইয়র্ক বিরাট শহর। একমাসেও সমস্ত কিছু দেখে শেষ করা যাবে না বোধ হয়। তবু যতটা পারি আপনাকে দেখিয়ে আনি।

আমরা দ্রুত ডাউন টাউন ম্যান হাটানের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগলাম। সুবিখ্যাত ফিফ্‌থ এভিনিউ-এর চোখ ঝলসান রূপ আমাকে মূক করে রাখল। ক্রমে আমরা সেনট্রাল পার্কের সামনে এসে পড়লাম। পার্কের আয়তন বিশাল। পাশ কাটিয়ে চলেছি তো চলেছিই। ক্রমে রকেফেলার সেন্টার অতিক্রম করলাম।

—সামনের ওই বিশাল বাড়ীটা দেখুন—ওই হল এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং।

উচ্চতায় বিশ্বের সমস্ত বাড়ীকে যে ছাপিয়ে গেছে, সেই এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এর দিকে আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। রেমার্ক ওই বাড়ীর বিস্তৃত পরিচয় আমাকে দিলেন। একশ দু তলা উঁচু এই বাড়ীটি ১৯৩১ সালে তৈরী করতে খরচ পড়েছিল চারকোটি ডলার। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা দশ হাজারের বেশী। এছাড়া প্রতিদিন ওই বাড়ীতে নানা কাজে আসেন আরো বিশ হাজার মানুষ। মজার কথা হচ্ছে, বিশাল উচ্চতার দরুণ জল হাওয়ারও পার্থক্য অনুভব করা যায় প্রতিদিন। বিরাশি তলা যখন রোদে ঝলমল করছে, আটত্রিশ তলায় তখন চলেছে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংকে বাড়ী না বলে একটি ছোটখাট শহর বলাই ভাল। আমরা ক্রমে ওই বিস্ময়কর বাড়ীটি পিছনে ফেলে ওয়াশিংটন আর্চ অতিক্রম করলাম। ফিফ্থ এভিনিউ এবার শেষ হল। ব্রডওয়ে ধরে চলেছি। নামী আর দামী অপেরা ও থিয়েটার হলের ছড়াছড়ি এখানে। কত অখ্যাত শিল্পী এখানকার পাদপ্রদীপে এসে পরবর্তী কালে বিখ্যাত হয়েছেন। ব্রডওয়ে ছাড়িয়ে ফুলটন ষ্ট্রীটের মোড় অতিক্রম করে আমরা পার্ক রো-তে প্রবেশ করলাম। তারপর ব্রুকলিন ব্রীজ মাড়িয়ে অতিক্রম করলাম ইষ্ট রিভার।

অর্থাৎ আমরা ম্যানহাটন থেকে ব্রুকলিনে এসে পড়লাম। অ্যাটলান্টিক এভিনিউ-এ এসে গাড়ী থামালেন রেমার্ক। লং আইল্যাণ্ড কলেজ অব মেডিসিনে তাঁর কিছু কাজ ছিল। আমি আর গেলাম না। উনি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কলেজ অব মেডিসিন ভবনের ভেতরে চলে গেলেন। আধঘণ্টাটাক আমায় অপেক্ষা করতে হল। এই সময়টুকুর মধ্যে আমি দুটো সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করলাম। রেমার্ক দ্রুতপায়ে ফিরে এলেন কিছুটা লজ্জিতভাব নিয়ে।

—আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। নিশ্চয় খুব বিরক্তবোধ করছিলেন।

—না, তেমন কিছু নয়। আপনার কাজ হল?

—কিছু বাকী রয়ে গেল। কাল আসতে হবে আবার। চলুন, এবার অন্য পথ দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাই।

গাড়ী আবার সচল হল।

আমরা আবার ব্রুকলিন ব্রীজ অতিক্রম করে রুজভেল্ট ড্রাইভ ধরলাম। ইষ্ট রিভারের ধার-ঘেঁসা এই রাস্তাটি বহুদুর বিস্তৃত। এই ধরনের রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে আরাম। আগে, পিছনে বা পাশদিয়ে অজস্র গাড়ী এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দ গতিতে। হর্ণের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে কচিৎ। বড় ভাল লাগছিল।

আন্দাজ মাইল চারেক এগুবার পর আমরা ফর্টি সেকেণ্ড ষ্ট্রীটে মোড় নিলাম। বিশাল এক বাড়ীর চমৎকার পেভমেণ্টের সামনে রেমার্ক গাড়ী থামালেন। কাচ দিয়ে ঢাকা এই উজ্জ্বল বাড়ীটাকে যেন বড় চেনা লাগছিল।

আমরা গাড়ী থেকে নামলাম।

বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল।

রেমার্ক বললেন, এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভবন।

তাই আমার বাড়ীটাকে এত পরিচিত মনে হচ্ছিল; নানা পত্র—পত্রিকায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভবনের ছবিতো বহুবারই দেখেছি। এখানেই বিশ্বের শতাধিক দেশের প্রতিনিধিরা বহুবিধ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কত মুখ দেখাদেখি, কত স্বার্থপরতা চলেছে।

বিশাল আয়তন। আমরা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম।

—এখন কল্পনাও করা যায় না, আগে এখানে জলাছিল। প্রচণ্ড রকম অস্বাস্থ্যকর জায়গা হওয়ায় এধার কেউ মাড়াতে চাইত না।

আমি বললাম, ঘিঞ্জি জায়গায় কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভবনকে মানাত না। সেদিক থেকে মার্কিন সরকার ভাল একটা দিক উপহার দিয়েছেন।

—আমি যতদূর জানি, মার্কিন সরকার নয়, এই জমির মালিক ছিলেন রকেফেলাররা।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আচ্ছা, কত কোটি ডলার রকেফেলারের আছে বলতে পারেন ?

রেমার্ক ও হাসলেন।

—কোটি কোটি ডলার। প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী। ঈশ্বর জানেন, এত কিছুর কি হবে শেষ পর্যন্ত।

আমাদের কাছে ভিজিটার্স-কার্ড ছিল না বলেই ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। শুনলাম, গতরাত এগারটা পর্যন্ত মিশর আর ইজরায়েলের মধ্যেকার যুদ্ধ নিয়ে ঘন-ঘোর বাক-বিতণ্ডা হয়ে গেছে। আজ আবার কিছুক্ষণ পরেই অধিবেশন বসবে।

আধঘণ্টার কিছু বেশী আমরা ওখানে ছিলাম। তখনও এখানে ওখানে সাংবাদিকদের জটলা চলেছে। ফেরার পথে রেমার্ক বললেন, লস এঞ্জালেস থেকে আবার যখন আমি নিউইয়র্কে আসব তখন ভিজিটার্স কার্ড সংগ্রহ করে রাখবেন। বাকযুদ্ধ উপভোগ করার তখন আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

ফর্টি সেকেণ্ড ষ্ট্রীট ধরে বেশ কিছুটা এগুবার পর আমরা ফিফ্‌থ এভিনিউ-এ পড়লাম। শুনলাম এখান থেকে আমাদের আবাস বেশী দূরে নয়। মহানগরীর কিছু অংশ আমাকে দেখাবার উদ্দেশ্যেই ঘোরা পথ দিয়ে ব্রুকলিন ব্রীজের মুখে যাওয়া হয়েছিল।

মোড় থেকে সামান্য কিছু দূরে একটি রেষ্টুরেণ্টের সামনে গাড়ী থামালেন রেমার্ক। আগে থেকে স্থির হয়েছিল পথেই লাঞ্চ সেরে নেওয়া হবে। বড় বড় অক্ষরে লেখা সাইন বোর্ডের দিকে তাকালাম—

আপনার সেবায় “ব্লু বার্ড”।

ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটা চল্লিশের ঘরে।

ভেতরকার বিস্তীর্ণ হলে বসার পর রেমার্ক বললেন, এই জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ। হান্নাকে নিয়ে মাঝে মাঝে আসি এখানে।

—এটা কি খুব নামকরা রেষ্টুরেন্ট ?

—মোটেই নয়। নিউইয়র্কের প্রথম শ্রেণীর রেষ্টুরেন্টগুলির যে তালিকা আছে তার মধ্যে এর নাম খুঁজে পাবেন না। তবু এখানকার চার্জ বেশ বেশী।

হলে খুব বেশী লোক ছিল না। দু-একজন করে অবশ্য আসছেন। কেতাদুরস্ত বয় অর্ডার নিয়ে যাওয়ার অল্প পরেই খাবার পরিবেশন করে গেল। গল্প করতে করতে আমরা খাওয়া শেষ করলাম। যা পরিবেশন করা হয়েছিল তার কয়েকটি পদ খাওয়া দূরের কথা, আগে চোখে পর্যন্ত দেখিনি। অবশ্য সুখাদ্য সন্দেহ নেই।

আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ওখান থেকে বেরুলাম প্রায় সোয়া একটার সময়। রেমার্ক আমাকে তাঁর বাসা বাড়ীর সদর দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। একটা জাহাজ চার্টার করতে হবে কোম্পানীর প্রয়োজন—সেই ব্যাপারেই গেলেন উনি। কাজ মিটিয়ে হান্নার সঙ্গে দেখা করে সন্ধ্যার সময় ফিরবেন। অবশ্য যাবার আগে অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিয়ে গেছেন।

দুপুরের বাকী সময়টা আমার অলসভাবে কেটে গেল। ঘুমবার চেষ্টা করে ছিলাম কিন্তু চোখের দুপাতা এক করতে পারলাম না। পত্রিকার পাতা উল্টালাম কিছুক্ষণ। একটা ব্যাপারে মন ভীষণ খুঁতখুঁত করছিল। বৃটিশ ওভারসিজের অফিস থেকে আমার ল্যাগেজ আনতে ভুল হয়ে গেছে। আজও জামাকাপড় বদলাতে পারব না।

ক্রমে চারটে বাজল।

টিভি সেটের সামনে বসে সুইচ অন করলাম। প্রোগ্রামের কিছুই জানি না। এক জায়গায় দেখলাম সুইজারল্যাণ্ডের নৈসর্গিক শোভা সম্পর্কে ফিচার দেখান হচ্ছে। ক্যামেরার কাজ উঁচুদরের। আমি মনযোগী হলাম। তন্ময় হয়ে কতক্ষণ দেখেছি জানি না, চটক ভাঙ্গল কলিং বেলের ঝনঝনানিতে।

রেমার্ক ফিরে এলেন। টিভি বন্ধ করে দরজার দিকে এগুলাম। বাইরে ঘোর হয়ে আসায় ঘরে আবছা অন্ধকার নেমেছে। জানলা খোলা থাকার দরুন এতক্ষণ ঘরে আলো জ্বালা ছিল না। আমি দরজা খুলে দিয়েই করিডরের আলোয় দেখলাম, একজন সুবেশা তরুণী অস্থির ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। তরুণী দ্রুত চৌকাঠ পেরিয়ে, নিজের দুই সুডৌল বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। উগ্র কসমেটিকের গন্ধে আমার শরীর শিরশির করে উঠল। তারপরই মহা বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম তরুণীর ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর নেমে আসছে।

বাধ্য হয়েই বাধা দিতে হল, ক্ষমা করবেন। আপনি ভুল করেছেন—

ভুল যে হয়েছে তরুণীও ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিল। সে তাড়াতাড়ি সরে গেল আমার কাছ থেকে। আমি পিছিয়ে গিয়ে আলো জ্বাললাম। এবার মেয়েটিকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। সুরূপা সন্দেহ নেই। বিব্রত হয়েছে হাবেভাবে মনে হল না। বেশ সহজ ভঙ্গীতেই সে এগিয়ে এল।

—টেডি কোথায়?

—টেডি! আপনি কি মিঃ রেমার্ককে খুঁজছেন?

—হ্যাঁ। ওকে আমরা টেডি বলেই ডাকি। বেরিয়েছে নাকি?

—দুপুরেই কাজে বেরিয়েছেন। অনুগ্রহ করে নামটা বলুন। ফিরে এলে তাঁকে আপনার কথা জানাব।

—আমি লিজা পামার। আপনার পরিচয় তো পেলাম না।

নাম বললাম। কি প্রয়োজনে আমেরিকায় এসেছি তাও বললাম।

আমার অনুরোধের তোয়াক্কা না করেই লিজা সোফায় বসল। সঙ্কোচ আমাকে জড়িয়ে ধরল। একজন মহিলা—বিশেষ করে

গৃহকর্তার যিনি পরিচিতা, তাঁকে বসতে বলা উচিত ছিল। বুঝলাম, পাশ্চাত্যের শিষ্টাচার আয়ত্ব করতে আমার সময় লাগবে।

— একটা কথা বলতে পারেন, হান্না রাইগার নামে কোন মেয়েকে এই অ্যাপার্টমেন্টে দেখেছেন ?

আমি যে হান্নাকে দেখেছি। তার সম্পর্কে কিছু কথাও যে আমার জানা হয়ে গেছে—বলতে মুখে বাধল। মনে হল, সে সমস্ত কথা বললে রেমার্ককে বেশ বেকায়দায় ফেলা হবে।

অম্লান বদনে বললাম, এসে অবধিতো আর কাউকে দেখিনি।

—আপনি কবে এসেছেন ?

—কাল দুপুরের দিকে।

লিজা গুম হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বলল, হান্না ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে টেডির পিছু পিছু। টেডিরও মতলব ভাল নয়।

—ভাল নয় কি রকম ?

—শুনছি হান্নাকে টেডি বিয়ে করবে।

আমি ভাল মানুষের মত বললাম, এতো সুসংবাদ। রেমার্ক বিয়ে করতে চলেছেন এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে।

লিজা গরম হয়ে উঠল।

ঝাঁঝাল গলায় বলল, আপনি কিছু বুঝতে পারেননি। এই বিয়ের ব্যাপারটা মোটেই সুসংবাদ নয়—দারুন একটা কেচ্ছা।

কলিং বেলের ঝনঝনানি শুনতে পাওয়া গেল।

নিশ্চয় রেমার্ক এসেছেন।

লিজা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। অনুমান ভুল নয়। রেমার্ক ঘরে প্রবেশ করার মুখেই সচকিত হলেন, তারপরই তাঁর মুখে নেমে এল অস্বস্তির ভাব। তিনি কিন্তু কিছু বলার অবকাশ পেলেন না, তার আগেই লিজা নিজের দুই সুডৌল বাহু দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে।

আমি সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

এরকম ঘোরাল পরিস্থিতিতে আমার এখানে এখন না থাকাই ভাল। যতদূর মনে হল লিজা বেশ চড়া মেজাজের তরুণী। একটা হেস্তনেস্ত না করে সে যে এখান থেকে আজ যাবে বলে মনে হয় না। রেমার্কের রঙ্গীন নেশা আমার সামনে টুটে যাক তা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখেই কিন্তু তিনি আমায় ডাকলেন। রেমার্ক সবে মাত্র নিজেকে লিজার কাছ থেকে সরিয়ে এনেছেন।

—কোথায় চললেন ?

—আপনারা কথা বলুন। আমি নীচে গিয়ে একটু ফুটপাথে পায়চারী করি। অনেকক্ষণ ঘরে আছি।

আর কিছু শোনার আগেই করিডোরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর এগিয়ে গেলাম লিফ্টের দিকে। আরো দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে নীচে নেমে এসে ফিলিং স্টেশনের দিকে এগুলাম। আজই সকালে রেমার্কের মুখে জানতে পেরেছি, এখানে পেট্রোল পাম্পকে ফিলিং স্টেশন বলে।

কয়েক পা এগুতেই দেখলাম দেওয়াল ঠেস দিয়ে জেফ্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কালো নিরেট চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব। জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটের এক পাশে ঝুলছে। পাঁশুটে রংএর ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে অল্প অল্প। মনে হয় ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পর, বাড়ী ফেরার আগে ওই ভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে। এখান থেকে ওর বাড়ী কত দূরে কে জানে।

আমাকে দেখেই সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটের ফাঁক থেকে খসিয়ে এনে এক গাল হাসল জেফ্রি। সকালে অল্পক্ষণ আমাদের দেখা হয়েছিল, কিন্তু ও যে আমায় ভুলে যায়নি তাই বোধহয় বোঝাবার চেষ্টা করল।

আমিই কথা আরম্ভ করলাম।

—ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পর মনে হচ্ছে বিশ্রাম নিচ্ছ?

—বিশ্রাম!

জেফ্রির হাসি বিস্তার লাভ করল।

—আমাদের জীবনে বিশ্রামের স্থান নেই স্যার। বাড়ী ফিরেও মাঝরাত পর্যন্ত পেটের জন্য খাটতে হয়।

বুঝলাম অজান্তেই নরম জায়গায় ঘা দিয়ে ফেলেছি।

—তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছো তাই ভাবলাম—

—আপনি কুণ্ঠিত হবেন না স্যার। মনের মধ্যে অনেক ব্যাথা—অনেক দুঃখ চেপে রেখেছি। সময় সময় মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ে। আপনি ভারতীয়, আমার বিশ্বাস আপনারা আমাদের সমব্যাথী। এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছি জানতে চাইছিলেন?

—হ্যাঁ। মানে—

—আমার এক ভাগনের অপেক্ষায় রয়েছি। কিছু ছাঁটকাপড় এনে দেবে বলেছিল। ছোকরা আবার ব্ল্যাক মুশলিম। কোন মিটিংএ আটকে পড়েছে বলে বোধহয় দেরী হচ্ছে।

—ব্ল্যাক মুশলিম!

—ওদের কথা শোনেন নি? যে সমস্ত ক্রিশ্চান নিগ্রো মুশলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে তাদের ব্ল্যাক মুশলিম বলে। কালে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বেশ জবরদস্ত হয়ে উঠবে। মার্কিন সরকার এদের নিয়ে কিছুটা চিন্তিত।

ব্ল্যাক মুশলিমদের কথা সময় সময় ভারতীয় সংবাদ পত্রেও পড়েছি মনে পড়ল। ওরা নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে দাঙ্গা বাধায় বলে অভিযোগ। আর বেশী কিছু জানতাম না। কাজেই নিজের অজ্ঞতা আর প্রকাশ হতে না দিয়ে কথার মোড় ঘোরালাম।

—ছাঁটকাপড় দিয়ে কি করবে?

জেফ্রি সিগারেটে শেষ বারের মত টান দিয়ে বলল, আটজনের

অন্ন আমায় জোগাতে হয় স্যার। ফিলিং স্টেশন থেকে যা পাই তাতে চলে না। ছাঁটকাপড় দিয়ে বাচ্চাদের ফ্রক সার্ট এই সমস্ত তৈরী করি আমি আর আমার স্ত্রী। আয় বাড়াবার চেষ্টা আর কি।

—তৈরী করা মাল দোকানে দোকানে দিয়ে আসতে হয় নিশ্চয় ?

—তাহলে তো বেঁচে যেতাম। সাদা দোকানদার হারলেসের তৈরী মাল নেবে কেন ? গরীব কালো বাচ্চাদের মা-বাপ কোন রকমে পয়সা জুটিয়ে আমাদের কাছ থেকে ফ্রক বা সার্ট কেনে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, তুমি হারলেসে থাক নাকি ?

—আর কোথায় থাকবো বলুন ? নিউইয়র্কের অধিকাংশ নিগ্রোর তো ওখানেই মাথা গোঁজবার জায়গা।

—এখানে নতুন তো, কিছুই চিনি না। আমাকে একদিন হারলেসে নিয়ে যাবে ?

—আপনি যাবেন !

জেফ্রি বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ে।

—তুমি না নিয়ে গেলে আমি কি ভাবে যাব বল ?

—সে কি কথা স্যার ! আপনি যেতে চাইছেন আর আমি নিয়ে যাব না, তা কি হয় কখনও। আপনার মত বিদেশীদের যত বেশী আমাদের দুর্দ্দশা দেখান যায় ততই ভাল। কালই চলুন না—

—কাল ? বেশ। কিন্তু তোমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বিদেশীদের দেখিয়ে কি লাভ তা তো বুঝলাম না ?

—এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলেন না। আমরা তো নিজেদের অবস্থা উন্নত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, ফল কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কালো নেতা মার্টিন লুথার কিং দাবী প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে উঠতেই গুলিতে প্রাণ দিলেন—তবুও মার্কিন সরকারকে টলান গেল না। তাই আমরা চাইছি, সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে আমাদের করুণ অবস্থার কথা ছাপা হোক—যদি এরা লজ্জা পায়।

লজ্জা পেয়ে যদি—ওই যে ছোকরা আসছে। হাতে ছাঁটকাপড়ের বাণ্ডিলটাও রয়েছে দেখছি।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, বছর পঁচিশেকের একটি নিগ্রো ছেলে হন্তদন্ত হয়ে আসছে। বেশ স্বাস্থ্যবান। পরনে ডগডগে সবুজ রংএর ট্রাউজার আর বাদামি সার্ট। দেরী হয়ে গেছে বলেই এত জোরে পা ফেলে আসছে।

জেফ্রি আবার বলল, আমার ডিউটি বেলা দুটোয় কাল শেষ হবে। আপনি ওই সময় অনুগ্রহ করে আসবেন। আমি তৈরী থাকব।

কথা শেষ করে সে নিজের ভাগনের দিকে এগুলো। আমি বিপরীত দিকে পা চালালাম। জেফ্রির কথাগুলি মনের আনাচে কানাচে ঘোরা-ফেরা করছে। আমাদের দেশের কোন পেট্রোল পাম্পের সাধারণ কর্মী এত সাবলীল ভঙ্গীতে কথা বলতে পারবে? নিজেদের সম্পর্কে এত সচেতন হবার কোন প্রয়োজনীয়তা কি তারা মনে করে?

এলোমেলো চিন্তার মধ্যে ফুটপাথ ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে। লিজা পামার তখন নেই। রেমার্ক একাই বসে বসে সিগারেট ধ্বংস করছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। হাসিটা করুণ সন্দেহ নেই।

আমি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললাম, বেশ বিপদে পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?

—বিপদ ঠিক নয়। ঝামেলা—

—অর্থাৎ—

—লিজা চড়া মেজাজের কেলি গার্ল। ওর সঙ্গে—

রেমার্ককে বাধা দিয়ে বললাম, কেলি গার্ল কাকে বলে ঠিক বুঝলাম না।

—কেলি হল এক স্বার্থক প্রতিষ্ঠান। যার কাজ হল মেয়েদের

চাকরীর সন্ধান দেওয়া। যে সমস্ত বেকার মেয়েরা চাকরীর আশায় নিজেদের নাম নথি ভুক্ত করে তাদের কেলি গার্ল বলা হয়। লিজার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় দৈবাৎ। কিন্তু ক্রমে ওঠার মুখেই বুঝলাম, ওর মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা আমার কর্ম নয়। পালাই পালাই যখন করছি তখনই হান্নাকে কাছে পেলাম। আপনি তো জানেন তাকে আমি বিয়ে করব স্থির করেছি।

—কিন্তু মহিলা আপনাকে সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না।

—তাই তো আগামী মাসের প্রথম দিকেই হান্নাকে বিয়ে করে ফেলতে চাই। অবশ্য লিজা একটু গোলমাল করবে। তা করুক।

—মিস রাইগার এই সমস্ত কথা জানেন তো?

—নিশ্চয়। তাকে সমস্ত বলেছি। ভাল কথা, আমার একজন অ্যাসিটেণ্টকে আপনার মাল পত্তর আনার জন্য স্লিপ দিয়ে এসেছি। সে বৃটিশ ওভারশিজের অফিস থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে মনে হয়।

--ধন্যবাদ। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা? কোনো রেষ্টুরেণ্টে যেতে হবে নাকি? রেমার্ক হাসি মুখে বললেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি। না, কোন রেষ্টুরেণ্টে যেতে হবে না। ফ্রাই মাংস ইত্যাদি নিয়ে এসেছি। গরম করে নিলেই চলবে। তবে পরের বার যখন নিউইয়র্ক আসবেন তখন আর কোন অসুবিধা হবে না। হান্না খাওয়াবে রান্না করে।

আমিও হাসলাম।

ক্রমে খাওয়া শেষ হল আমাদের। সেই অ্যাসিটেণ্ট ভদ্রলোক আমার মালপত্র দিয়ে গেলেন। খাপছাড়া ভাবে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে করতে দশটা বেজে গেল। শুয়ে পড়ার বিশেষ তাগিদ ছিল না।

প্রশ্ন করলাম, ব্ল্যাক মুশলিমদের সম্পর্কে বিশদ ভাবে কিছু বলতে পারেন?

—বিশদ ভাবে বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু জানি না। কিছু নিগ্রো মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে আর তারা মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে গোলমাল করে এইটুকুই জানি। সত্যি কথা বলতে কি আমার তেমন আগ্রহও নেই। আপনি বরং কিছু বই-টই পড়ুন।

—বই!

—ব্ল্যাক মুশলিমদের সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো, আপনি হঠাৎ—

—তেমন কিছু নয়। নির্দোষ আগ্রহ বলতে পারেন।

একটু চিন্তা করে রেমার্ক বললেন, এই তলাতেই ইতিহাসের এক অধ্যাপক থাকেন। তাঁর কাছে ওই ধরনের বই-টই থাকতে পারে। দাঁড়ান, ফোন করে এখুনি জেনে নিচ্ছি।

রেমার্ক ফোন ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গেলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতে থাকলাম, এই হল প্রকৃত মার্কিন চরিত্র। কোন কিছুই এরা ফেলে রাখতে চায় না। অতিথির যে কোন অসুবিধা দূর করতে বা আগ্রহ নিরসন করার ব্যাপারে সদাই যেন বিশেষ তৎপর।

ফোনে কথা হল অধ্যাপকের সঙ্গে। ব্ল্যাক মুশলিমদের সম্পর্কে বই আছে তাঁর কাছে। পাঠিয়ে দিচ্ছেন কয়েক মিনিটের মধ্যে। সত্যি, ফর্মা বিশেকের একখানা বই এসে পড়ল তাড়াতাড়িই। দিয়ে গেল অধ্যাপকের কিশোর বয়স্ক পুত্র।

রেমার্ক বললেন, আমি শুয়ে পড়ছি। আপনি ইচ্ছে করলে এখন বইটা পড়তে পারেন।

—আলো জ্বালা থাকলে আপনার ঘুম আসবে কি?

—টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে নিন, তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না।

সোফাকে বিছানায় পরিণত করে রেমার্ক শুয়ে পড়লেন। ঘরের অন্য প্রান্তে হ্যারিংটন জাতীয় একটা চেয়ার ছিল। বেশ গা ঢেলে বসা যায়। পাশেই ছোট টেবিল। তারই উপর সুদৃশ্য

ল্যাম্প রাখা রয়েছে। বইটির নাম, "ব্ল্যাক মুশলিম আন্দোলনের সূত্রপাত কবে থেকে।"

আমি পড়তে আরম্ভ করলাম।

ঘুম ভাঙ্গল বেশ বেলায়।

ঘুমের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। পৌনে তিনটে পর্যন্ত পড়ে তবে শুতে গেছি। উঠতে দেরী হওয়াই স্বাভাবিক। আশার কথা বই শেষ করা গেছে। বিশ ফর্মায় ছড়ান তথ্য ওই সময়টুকুর মধ্যে শেষ করা আমার কর্ম্ম নয়। অনেক ছোট খাট বিষয়কে দীর্ঘায়ত করা হয়েছে। কাজেই বাদছাদ দিয়ে পড়েছি।

রেমার্ক খবর কাগজ পড়ছিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমাদের কফি পর্ব আরম্ভ হল।

বললাম, এখানে যে আফিসিয়াল কাজটুকু আছে তা আজ সেরে নেওয়াই ভাল।

—বেশ তো। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে পড়লেই হবে। বইখানা কেমন পড়লেন?

—মন্দ নয়। ব্ল্যাক মুশলিমদের জন্ম থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

—তাই নাকি। বলুন, শোনা যাক।

—সে কি! আপনার তো আগ্রহ ছিল না?

—ছিল না ঠিকই। ভেবে দেখলাম জেনে রাখা খারাপ নয়। বিশেষে ব্যাপারটা যখন নিজের দেশের।

এবার বেশ কিছু সময় নিয়ে আমি রেমার্ককে ওই আন্দোলন সম্পর্কে বললাম।

ব্ল্যাক মুশলীম সম্প্রদায়ের জন্ম প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে। নিজেদের সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত ড্রিউ নামে একজন মার্কিন নিগ্রো আফ্রিকার নানা দেশে বেড়াতে গিয়ে একসময়

মরক্কোয় উপস্থিত হন। ওখানকার রাজার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রভাবিত হন তিনি। মরক্কোর রাজা ড্রিউ-কে বোঝান, দাস হিসাবে আমেরিকায় যাবার আগে নিগ্রোরা সকলেই প্রায় মুসলমান ছিল। মুসলমান ধর্ম্মে মার্কিন নিগ্রোদের আবার যদি বাঁধা যায় তবে তাদের মঙ্গল দ্রুত সূচীত হবে।

কথাটা মনে লাগার মত। দেশে ফিরে এসে ড্রিউ নিগ্রো সমাজের মধ্যে ইসলাম ধর্ম্ম ছড়িয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। তিনি বলে বেড়াতে থাকেন নিগ্রোরা যেন আর নিজেদের নিগ্রো বলে পরিচয় না দেয়—তারা মুর। মরক্কোর অধিবাসী মুরদের রক্ত আমেরিকার প্রতিটি নিগ্রোর শরীরে বইছে।

কেটে ছেঁটে কোরান অনুবাদ করা হল। সেই "হোলি কোরান" এর লক্ষ লক্ষ কপি বিতরিত হল নিগ্রোদের মধ্যে। এইভাবে আমেরিকায় ইসলাম ধর্ম্মের সূচনা হল। অচিরেই কিন্তু ড্রিউ আলি এক শক্তিমান প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হলেন। তিনি নিগ্রো সম্প্রদায়েরই এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গ্ল্যাড গ্রীন। ড্রিউ আলি অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেলেন। ওরকম একজন প্রতিপক্ষ থাকলে তো সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখা যাবে না। সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে যা অনিবার্য্য তাই ঘটল। চিকাগোর "ইউনাইটেড ক্লাবে" রহস্যজনক ভাবে খুন হলেন গ্ল্যাড গ্রীন।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ড্রিউ আলিও মারা গেলেন আততায়ীর হাতে। কে তাঁকে খুন করেছিল আজও জানা যায় নি। এরপর ব্ল্যাক মুসলীমদের নেতা হয়ে বসলেন এলিজা মহম্মদ। ইনিই ইসলাম ধর্ম্ম নিগ্রোদের মধ্যে ভাল ভাবেই ছড়িয়ে দিতে পারলেন। প্রতিষ্ঠিত হল "আল্লাহ টেম্পল অব ইসলাম"। কিন্তু এলিজার এমনই শিক্ষা যে, এই সম্প্রদায় ক্রমেই মারমুখী হয়ে উঠতে লাগল।

১৯৩৫ সালের ৫ই মার্চ চিকাগোয় যা ঘটল তা অভাবনীয় ব্যাপার। হিংস্র ব্ল্যাক মুসলীমরা মারাত্মক সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল পুলিশ বাহিনীর উপর। খণ্ডযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর দেখা গেল, এক ডজন পুলিশ কর্ম্মচারীর ছিন্নভিন্ন দেহ রাস্তার চারিধারে ছড়িয়ে রয়েছে।

এই শেষ নয়। এই ধরনের ছোট বড় ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল। ১৯৪২ সালের মে মাসে যখন এলিজা মহম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অন্য ধরনের। জর্জ্জিয়ার এই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মানুষটি কারা জীবনকে সহজ ভাবেই মেনে নেন। এবং ওখান থেকেই স্ত্রী ক্লারা মহম্মদ ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৪৬ সালে এলিজা মহম্মদকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে পঞ্চাশটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সমস্ত মসজিদে ঘুরে ঘুরে সহগামীদের উৎসাহিত করতে থাকেন তিনি। দিন গড়িয়ে চলে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে বৈভবও করায়ত্বে এসে যায়। শিকাগোর সবচেয়ে দামী ও নামী পাড়া হাইডপার্ক। সেই পাড়ায় আঠারোটি কক্ষবিশিষ্ট এক বিলাস বহুল ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন। এখানে বসেই তিনি সমস্ত নির্দেশ দেন। সর্ব্বস্তরের মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "Islam dignities the black man, and it gives him the desire to be clean, internally and externally, and to have for the first time a sense of dignity."

শুধু ধর্ম্মপ্রচারে যদি এঁদের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকত তবে কারুরই কিছু বলার থাকত না। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের উগ্রতা ক্রমেই চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিল। প্রখ্যাত নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আমেরিকার বহুল প্রচারিত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি এখন সোচ্চার হয়ে উঠেছে এদের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে। মনে হয়, মার্কিন সরকারও এদের সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন।

কাঁটায় কাঁটায় ছুটোর সময় আমি ফিলিং স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খাকি রং-এর ভারী রুমালে হাত মুছতে মুছতে জেফ্রি কয়েক মিনিট পরে এল। এতক্ষণ বেশ খাটা খাটুনি করেছে— বয়সও হয়েছে, তবুও তাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে না।

—আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না।

—কেন? একথা ভেবেছিলে কেন?

—আমাদের অবস্থার কথা শুনে অনেকেই সহানুভূতি জানায়। উজিয়ে আর কে দুঃখ দুর্দ্দশা দেখতে যায় স্যার?

—আমি যে তোমার সঙ্গে যাব তাতো দেখতেই পাচ্ছ। আসল কথা কি জান, আমি গরীব দেশের মানুষ। নির্যাতিতের বেদনা অনুভব করতে করতেই তো বয়স পাকিয়েছি।

আমরা মন্থর পায়ে এগিয়ে চললাম।

কাছেই টানেল স্টেশন। আমি এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে চলেছি। লণ্ডনে টিউব ট্রেনে চড়া হয়নি। অবিরাম গাড়ী যাওয়া আসা করছে। নির্দিষ্ট ট্রেনে জেফ্রি আমাকে নিয়ে উঠল। কলকাতার শহরতলিগামী লোকাল ট্রেনগুলির মত বাদুড় ঝোলা অবস্থা নয়। মাঝারি ধরনের ভাড়া। কামরায় সাদা-কালো দুই ধরনের যাত্রীই রয়েছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে গন্তব্যস্থলে পৌছালাম।

চলন্ত সিঁড়ির সাহায্যে উপরে উঠে এলাম আমরা। কিছুদূর এগুবার পরই বেশ বুঝতে পারা গেল, নিউইয়র্কের সেই চোখ ঝলসান রূপ এখানে অনুপস্থিত। আকাশ ছোঁয়া একটি বাড়ীও চোখে পড়ে না। এই হল হার্লেম। কালোরা আবর্জনার মত এখানে পড়ে আছে।

আমরা এগিয়ে চললাম। এখানে ওখানে অলস ভঙ্গীতে জটলা পাকাচ্ছে নিগ্রো যুবকরা। ওরা নিশ্চয় বেকার। পথে পথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলে বেড়াচ্ছে, মারামারি করছে—এই বয়সেই অশ্রাব্য গালি গালাজ করছে নিজেদের মধ্যে।

ভাল বাড়ীও অনেক নজরে পড়ল। কয়েক-তলা উঁচুও। এখানে উচ্চ বিত্ত নিগ্রোরাই নিশ্চয় থাকে। তবে অধিকাংশ বাড়ীরই ত্রিভঙ্গ মুরারী অবস্থা। কিছু কিছু আবার জরাজীর্ণ। অনেকের সঙ্গে আবার শুধুমাত্র পায়রার খোপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই অঞ্চলের অনেকাংশ কলকাতা বা বম্বের বস্তির চেয়ে খুব বেশী উন্নত নয়।

—কি দেখছেন ?

মন বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললাম, নিউইয়র্কের একধারে যে এত অন্ধকার না দেখলে ধারণাই করতে পারতাম না।

—এখন তো অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। বছর, পঁচিশ আগে এলে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাস্তা পার হতে হত।

—সরকারি দাক্ষিণ্য তাহলে আজকাল কিছু কিছু জুটছে ?

—জন কেনেডির আমলে আমরা ভাল রকমই সুযোগ সুবিধা পেতে আরম্ভ করেছিলাম। এত সুখ কপালে সইল না। নিগ্রোদের ভালবেসেছিলেন বলেই তাঁকে রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিতে হল।

—আমি যতদূর জানি, ওসোয়াল্ড কেনেডিকে মেরেছিল তা রহস্যাবৃত থাকলেও, সে কিন্তু নিগ্রো বিদ্বেষী ছিল না।

জেফ্রির মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল।

—সরকারি মারপ্যাঁচ ওখানেই স্যার। ইচ্ছে করেই ব্যাপারটাকে রহস্যাবৃত করে রাখা হয়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ কখনই নিগ্রোদের উন্নতি চায়নি। এই বিংশ শতাব্দীতেও তারা আমাদের 'দাস' বানিয়ে রাখতে চায়। ভুলে যাবেন না স্যার, যেখানে কেনেডি মারা গেছেন, সেই টেক্সাসেরই অধিবাসী উইক্লিফ বুথ ছিল এব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যাকারী।

—তুমি বলতে চাইছো—

—কালো বিদ্বেষীদের চাপে পড়েই সেদিন ওসোয়াল্ড কেনেডিকে

লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য স্যার, এতবড় বন্ধুকে কাছে পেয়েও ধরে রাখতে পারলাম না।

জেফ্রি হয়তো ঠিকই বলছে। তাই যদি না হবে, তবে বিচারালয়ে উপস্থিত হবার আগে ওসোয়াল্ডকে খুন করা হল কেন? জেরার মুখে যদি সে আসল কারণ বলে দেয়—যে সমস্ত হোমড়া-চোমড়া লোক এই কাজে তাকে নিয়োগ করেছিল পাছে তাদের নাম প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই কি এই ভাবে মুখ বন্ধ করা হয়েছিল?

আমি অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, তোমার বাড়ী আর কতদূর?

—আর বেশী দূর নয়। সামনের বাঁকটার পরেই।

বাঁকের কাছে পৌঁছাতেই এক উৎকণ্ঠিত তরুনের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য সে নিগ্রো। তার ট্রাউজার এবং সার্ট দুটোই ময়লা এবং ছেঁড়া খোঁড়া।

—কি ব্যাপার মিকি?

—এই যে জেফ্রি খুড়ো। বিলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আপনি তাকে কোথাও দেখলেন নাকি?

—কই নাতো।

—পাঁচটার সময় একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ও ফিরে না এলে বেরুতে পাচ্ছি না।

—পাঁচটা বাজতে এখনও দেরী আছে। বিল তার আগে নিশ্চয় ফিরে আসবে।

আমরা আবার এগুলাম।

জেফ্রি প্রশ্ন করল, বলুন তো মিকি—মানে ওই ছেলেটি বেরুতে পাচ্ছে না কেন? ভাই-এর জন্য অপেক্ষা করার অর্থই বা কি?

বিচিত্র প্রশ্ন।

বললাম, বোধহয় কোন দরকারী কথা আছে। সেই কথা বলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

—হার্লেসের আর্থিক অবস্থা এখনও আপনি ভাল ভাবে বুঝতে

পারেননি তাই এ কথা বললেন। আসল কথা হল, ভদ্রগোছের একটাই স্যুট আছে বাড়ীতে। সেটা পরে ছোট ভাই বেরিয়েছে। সে ফিরে এলে তবে বড় ভাই সেই স্যুট পরে বেরুতে পারবে।

ডলারের ঝনঝনানিতে মুখর আমেরিকার এ আরেক রূপ।

আমরা জেফ্রির বাসস্থানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখে বুঝতে পারা যায় জীর্ণ বাড়ীটি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। সামনের দিক অ্যাসবেসটার বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে ছাওয়া। একটি কিশোরী ভেজা কাপড় ক্লিপ দিয়ে আটকে শুকোতে দিচ্ছিল। কাছেই দাঁড়িয়ে একটি যুবতী এবং একজন মোটাসোটা মহিলা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন।

—আসুন স্যার, পরিচয় করিয়ে দিই। আমার স্ত্রী—আমার মেয়েরা। ইনি হলেন—

জেফ্রি আমার যতটুকু পরিচয় জানতো তাই বলল। কুশল বিনিময় হল আমাদের মধ্যে। আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় এবাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায়নি। আমাকে কাছে পেয়ে সকলেরই তাই খুশী খুশী ভাব। জেফ্রি আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। বেতের গড়ান চেয়ারে আরাম করেই বসলাম।

মাঝারি সাইজের ঘর। দারিদ্রের ছাপ ছড়িয়ে থাকলেও, পরিবেশ বেশ ছিমছাম। গরমকাল হওয়ার দরুন ফায়ার প্লেসে আগুন নেই। উপরকার ম্যান্টিল পিসও বেশ বড় আকারের। তার কিছুটা উপর দিকে তিনটি কাচ দিয়ে বাঁধান ছবি টাঙ্গানো। এব্রাহাম লিঙ্কন, জন কেনেডি আর এক বৃদ্ধ নিগ্রোর ছবি। বৃদ্ধটির গায়ে অন্ততঃ এক শতাব্দীর আগের পোষাক।

বারো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে বয়স এমন চারটি ছেলে এই সময় এসে পড়ল। এরা সকলেই জেফ্রির ছেলে। আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। সকলেই ভারত সম্পর্কে নানা কথা জেনে নিতে চাইছে। অভাবের সংসার তবু প্রাণরসের অভাব নেই এখানে।

একসময় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে জেফ্রি বলল, তোমরা এবার যাও। এবার আমরা একটু কথাবার্তা বলি।

সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, বৃদ্ধের ছবির দিকে আঙ্গুল তুলে প্রশ্ন করলাম, ওই ছবিটা কার? তোমার বাবা নাকি?

—আজ্ঞে না স্যার। আমার ঠাকুর্দাদার ঠাকুর্দাদা। উনি প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের ব্যক্তিগত অনুচর ছিলেন। বলতে পারেন, আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

—কি নাম ছিল ওঁর?

—সকলে তাঁকে উইলি বলে ডাকতো। আর ইনি হলেন আমার ঠাকুর্দাদা। আমাদের বংশের ধনী পুরুষ। মাছের ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন। ভাল লেখা পড়া জানতেন।

জেফ্রি ঘরের অপর প্রান্তের একটি ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষন করল।

সৌম্য দর্শন মধ্য বয়স্ক এক ব্যক্তির ছবি। আমি সেই দিকে তাকিয়েই বললাম, তোমাদের ব্যবসা এখনও আছে নাকি?

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে জেফ্রি বলল, তাহলে কি আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আমায় খাটতে হয় স্যার। এক পুরুষেই সমস্ত শেষ হয়ে গেল। বাবা ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। ঘোর প্যাঁচ বুঝতেন না। ব্যবসা সাদা চামড়ার হাতে চলে গেল। অর্থাৎ চক্রান্ত করে ওরা নিয়ে নিল।

—বড় দুঃখের কথা। অবশ্য ওই রক্ত তোমার ছেলের শরীরেও রয়েছে। কাল ওরা নিজেদের ব্যবসা আবার আরম্ভ করতে পারে।

ঈশ্বর সহায় হলে সবই সম্ভব।

যুবতী মেয়েটি ট্রে হাতে ঘরে এল। ট্রের উপর দুকাপ ধুমায়িত চা এবং কিছু স্যাণ্ডউইচ ছিল। আমাকে অনুরোধ করল, সামান্য জলযোগটুকু যেন আমি সেরে নিই। আমি বিনা বাক্যবায়ে পেয়ালা তুলে নিলাম। জেফ্রিও চা-এ চুমুক দিল।

কথা বার্তা চলতে থাকল।

সত্যি কথা বলতে কি এই নিরভরান পরিবেশ আমার মনে বিচিত্র সুর সৃষ্টি করেছিল। চা পর্ব শেষ হবার পর জেফ্রি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁসে রাখা সেকেলে ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডেস্কের উপর মোটা মোটা খান কয়েক বই রাখা ছিল। তারই মধ্যে থেকে একখানা তুলে নিয়ে ফিরে এল আবার।

—এই সামান্য উপহার—আপনাকে নিতে হবে স্যার।

—নিশ্চয় নেবো। কি বই ওখানা?

"—কেন নিগ্রোরা এখানে এসেছিল।" আমার ঠাকুর্দার লেখা।

বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, শুধু ব্যবসাদার নন, তোমার ঠাকুর্দা সাহিত্যিকও ছিলেন?

—সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় তিনি ঠিক তা ছিলেন না। ইতিহাসের উপর তাঁর ঝোঁক ছিল। বিশেষে নিগ্রোদের আমেরিকায় পদার্পণ সম্পর্কে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। শেষ বয়সে কি খেয়াল হল এই বইটা লিখে ফেললেন।

—নিশ্চয় ভদ্রলোককে প্রচুর খাটতে হয়েছিল?

—বাবার মুখে শুনেছি, প্রামাণিক তথ্যের জন্য তিনি প্রায় প্রাণপাত করে ছিলেন। আমাদের কয়েকজন পূর্ব্ব-পুরুষ রোজ নামচা রাখতেন। সেই খাতাগুলোও তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। এই বইতেই পাবেন আমাদের বংশের এমন একজন মানুষকে যিনি আমেরিকার মাটিতে প্রথম পা দিয়েছিলেন।

—ইতিহাসের উপর আমারও প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। ধন্যবাদ জেফ্রি। তুমি এই বইখানা দিয়ে আমার বিশেষ উপকার করলে।

জেফ্রি সসংকোচে বলল, মি. রেমার্ক সেদিন আপনার নামটা আমায় বলেছিলেন বটে। ভারতীয় উচ্চারণ সড়গড় না থাকায় মনে রাখতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না স্যার, নামটা আরেকবার বলুন। বই-এ লিখে দিই।

—নিশ্চয় বলব।

নাম বললাম।

জেফ্রি মলাটের পরের পাতায় আমার নাম লিখল গোটা গোটা অক্ষরে। তার নীচে লিখল, একজন সংবেদনশীল ভারতীয়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে—জেফ্রি লেমার।

কথা প্রসঙ্গে আরো জানতে পারলাম, লেখা শেষ হয়ে যাবার পর জেফ্রিকে ঠাকুর্দার পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিউইয়র্কের প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন? কেউ ছাপতে চায়নি। শেষে নিজের পয়সাতেই তিনি বই প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী জ্ঞানী গুনীদের বই পাঠিয়েছেন। বই পড়ে তাঁরা প্রশংসা সূচক চিঠি লিখেছেন—ওই পর্যন্ত। এক কপিও বিক্রী হয়নি। বিক্রীর কোন মাধ্যম ছিল না। পরে অনেক বই পোকায় কেটেছে। এখনও আছে এক গাদা।

আরো কিছুক্ষণ ওখানে থাকার পর আমি উঠলাম। জেফ্রি আমায় টিউব স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। ওর ইচ্ছে ছিল আমাকে এপার্টমেণ্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেবার। রাজী হলাম না। ওকে আশ্বস্ত করেই বিদায় দিয়েছি। চিনে যেতে আর কোন অসুবিধা হবে না।

এপার্টমেণ্টে ফিরলাম কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময়। রেমার্ক এখন'ও ফেরেননি। ফিরে এলেও অসুবিধা হত না। তাঁর কাছেও দরজার চাবি ছিল। আমি আর সময় নষ্ট না করে জেফ্রির ঠাকুর্দার লেখা বইখানা পড়তে বসে গেলাম। তীব্র আগ্রহ আমায় পেয়ে বসেছে।

ঘড়ির কাঁটা সরে চলেছে। আমিও পাতার পর পাতা উল্টে চলেছি।

রেমার্ক ফিরলেন সাড়ে নটার সময়।

এসেই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, আমি দারুন লজ্জিত। আপনাকে সারা সন্ধ্যা বসিয়ে রেখেছি—খিদেতে নিশ্চয় কষ্ট

পেয়েছেন। এমন একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে—সত্যি এই ভাবে—

—আপনার সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই। আমি চমৎকার আছি। তাছাড়া বৈকালিক চা খাওয়াও আমার হয়ে গেছে।

—নিজেই তৈরী করে খেলেন নাকি?

—না। জেফ্রির সঙ্গে আমি তার হার্লেসের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ওখানেই—

বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়লেন রেমার্ক, বলেন কি আপনি হার্লেসে গিয়েছিলেন! ছিলেন কতক্ষণ ওখানে?

—তা কয়েক ঘণ্টা তো বটেই। এখানে পা দেবার পর থেকেই আমেরিকার চোখ ঝলসান রূপ দেখছি। শুনেছিলাম, এর একটা অন্যদিকও আছে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম প্রদীপের নীচে কতটা অন্ধকার।

—আমি অস্বীকার করি না, নিগ্রোরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। তবে ক্রমেই তাদের অবস্থা ভালর দিকে। প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি সিভিল রাইটস বিল কংগ্রেসে আনার আগেই মারা গেলেন। সেই বিল জনসন পাস করিয়েছেন। এখন তো ওরা সব ব্যাপারে সমান অধিকার পাবে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, বিল তো আজ কয়েক বছরই হল পাস হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নিগ্রোরা কি সমান অধিকার পাচ্ছে? সামান্য একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। এই দেশে এমন অজস্র রেষ্টুরেণ্ট আছে যেখানে ওরা আপনাদের পাশে বসে খাবার অধিকার পায় না।

একটু দ্বিধা করে রেমার্ক বললেন, আমার মনে হয় এ অবস্থা বেশীদিন থাকবে না।

—যদি কিছু না মনে করেন তাহলে বলব, এই ব্যবধান ঘুচতে বেশ সময় লাগবে।

আপনাদের ইতিহাসের কিছুটা আমার পড়া আছে। দাস-ব্যবসা আইন করে রদ করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও তা কার্যকরী হচ্ছে না লক্ষ্য করে—এই কুখ্যাত প্রথাকে মার্কিন জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্য এব্রাহাম লিঙ্কনকে গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। এখন এত সাহস কে দেখাবে বলুন?

—আপনার কথায় যে যুক্তি আছে তা আমি অস্বীকার করি না মিঃ ব্যানার্জী। এবারের নির্বাচনে হয়তো রবার্ট কেনেডি জয়লাভ করবেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি শক্ত পায়েই এগুবেন মনে হয়।

—যাক ও কথা। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলুন?

—তিনটে পর্যন্ত অফিসেই ছিলাম। তারপর এক মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে কিংসে যেতে হয়েছিল। ওখানেই দেরী হয়ে গেল।

—মর্মান্তিক সংবাদ!

—বেদনাদায়ক দুর্ঘটনাও বলতে পারেন। লিজাকে দেখেছেন তো—ও সাঁতারের পুকুরে ডাইভ প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে বেকায়দায় ডুবে মারা গেছে।

—সেকি!

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। গতকাল সন্ধ্যায় যৌবনে ভরপুর যে বেপরোয়া রূপসীকে এই ঘরে দেখেছি, কথা বলেছি, সে মারা গেছে! তাও আবার রোগে ভোগে নয়, দুর্ঘটনায়! কার ডাক যে কখন কি ভাবে আসে বুঝে ওঠা সত্যি দুষ্কর।

—খবর দিয়েছিল আমার এক বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলাম ওখানে। পুলিশ এসে পড়েছিল ততক্ষণে। আপনি বোধ হয় জানেন, পুলিশ হ্যাঙ্গামা কি রকম বিরক্তিকর। বডি মর্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দেবার পর তবে আসছি।

—ভদ্রমহিলার কথা এখনও কানে বাজছে। তিনি যে মারা গেছেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

—এই রকমই হয়। কি জানেন, লিজা এই ভাবে মরে গিয়ে

আমার আগামী জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। হান্নাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সহজ হত না। অনেক গোলমাল, অনেক ঝামেলা বাধাতো। তবু সে নেই একথা ভাবতে এখন আমার ভাল লাগছে না।

বিমর্ষ ভাবে রেমার্ক চুপ করলেন।

স্বাভাবিক কারণেই পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হল না। মিনিট পনেরো কেটে গেল বোধ হয়। শেষে ঘরের নীরবতা ভঙ্গ হল টেলিফোনের ঝনঝনানিতে।

রেমার্ক উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন।

কথা সেরে ফিরে এসে বললেন, চলুন, খেয়ে নেওয়া যাক। রাত বাড়ছে।

খাবার সঙ্গে এনেছিলেন—রেমার্ক কুকিং রেঞ্জে সেগুলির কিছু ফ্রাই আর কিছু গরম করে নেবার পর আমরা খেতে বসলাম। দক্ষিণ হাতের কাজ নীরবেই শেষ হল এক সময়। আমি জেফ্রির দেওয়া বইটা নিয়ে পড়তে বসলাম। রেমার্ক শুয়ে পড়লেন।

কয়েক পাতা পড়ার পর অনুভব করলাম, চুম্বুকের মত টেনে রাখার শক্তি আছে বইটির। আমি কোথায় আছি, কি ভাবে আছি সমস্ত ভুলে গিয়ে তলিয়ে গেলাম অতীতের ঘটনা প্রবাহে। সপ্তদশ শতাব্দীর সেই দুর্ব্বার, বল্গাহীন পৃথিবীর কাহিনী। পর্তুগীজরা তখন আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলায় বেশ গুছিয়ে বসেছে। বিরামহীন অত্যাচারে ওখানকার নদ-নদী মানুষের রক্তে লাল করে তুলছে। আমার বেদনা বিদ্ধ মন পাতার পর পাতার উপর দিয়ে বিসর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে। যেন আমার উপায় নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নগর নিউইয়র্ক আমার কাছে আবছা হয়ে আসছে। এই বিংশ-শতাব্দীর আমি যেন কেউ নই! অতীত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। চোখের উপর পরিষ্কার ভাবে এখন যেন সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি! সেদিন—

॥ ক ॥

ঘন ঘাসের মধ্যে বসে আছে লোয়াঙ্গা।

গুঁড়ি মেরে মেরে অনেক রক্ত চক্ষুকে ভাগ্যক্রমে এড়িয়ে সূর্য্যের শেষ আভা থাকতে থাকতেই এই ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে সে ঢুকতে পেরেছিল। তারপর অনেক সময় কেটে গেছে। সন্ধ্যা এসেছে, তারপর উতরে গেছে। এখন বেশ রাত। একই ভাবে লোয়াঙ্গা বসে আছে।

সে জানে এখান থেকে পর্তুগীজরা তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। পাঁচ থেকে পনেরো ফুট পর্যন্ত লম্বা ঘাসের নিবিড় জঙ্গল অ্যাঙ্গোলার এক বৈশিষ্ট। স্থানীয় মানুষ ছাড়া বিদেশীরা এর মধ্যে ঢুকতে কখনই সাহসী হয় না। তাই এক দিক থেকে লোয়াঙ্গা কিছুটা নিশ্চিন্ত।

অদূরের গ্রাম সে ঘাসের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। অবশ্য গ্রামের কুঁড়েগুলি ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। সবই আবছা আবছা। এখানে ওখানে আলোর শিখা—তাতেই যা কিছু অনুমান করে নেওয়া যায়। দেশের অসংখ্য নগণ্য গ্রামের মধ্যে টিরিয়াক একটি।

কিছুটা ঘাস ছিঁড়ে, বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে লোয়াঙ্গার। চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে সমস্ত শরীরে ব্যাথা। অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে। তা মাইল ষোল তো বটেই। দুটো পায়ের শিরাতেই টান ধরেছে। কিন্তু এখন বিশ্রাম করা যায় না। এখন যে অনেক কাজ বাকী।

গ্রামের দিকে লোয়াঙ্গার নিবদ্ধ দৃষ্টি ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। ওখানকার সবচেয়ে বড় কুঠীরের অধিকারী হল লোম্বানা। গ্রামের সর্দ্দার। লোম্বানার সঙ্গে বোঝা পড়া এখনও বাকী আছে। বাকী

আছে বলেই লোয়াঙ্গা এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে এসেছে। নইলে দূর দূরান্তে মিলিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় যত্নবান হত।

এই টিরিয়াক গ্রামেই বছর পঁচিশেক আগে লোয়াঙ্গা ছুনিয়ার প্রথম আলো দেখেছিল। জন্ম মুহূর্তেই মাকে হারিয়েছিল সে। বাবা ছিলেন অতি সরল মনের মানুষ। সর্দ্দারের জমিতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খেটে সামান্য উপায় করতেন। তাতেই কোন রকমে চলে যেত ছুজনের।

কিন্তু এই ভাবেও বেশী দিন গড়াল না।

জল তুলতে গিয়ে আচমকা গভীর ইঁদারার মধ্যে পড়ে মারা গেলেন বাবা। লোয়াঙ্গার বয়স তখন মাত্র সাত। তার যে কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে সে বিপদের গুরুত্ব বোঝার সময় তখন হয়নি। আত্মীয় স্বজন ছু-একজন যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তারা কেউই এগিয়ে এলোনা শিশুটিকে কাছে টেনে নিতে।

কেঁদে কেঁদে গ্রামের বারোয়ারী উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোয়াঙ্গা। কেউ তাকে দেখেও দেখছে না। এমন কি গ্রামের কর্তা ব্যক্তিরাও উদাসীন। একটি শিশু-প্রাণের মূল্য যে এক কপর্দ্দকও নয় তাই বোধ হয় সকলে প্রমাণ করতে চাইছিল। সন্ধ্যা হয়ে এল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ছোট্ট লোয়াঙ্গা ঝিমিয়ে পড়ে রইল একধারে।

আর স্থির থাকতে পারল না লোয়াবা। তার স্ত্রীও অনেকক্ষণ থেকে ছটপট করছিল। তাদেরও খুব অভাবের সংসার। একখণ্ড জমি আছে বটে—অজন্মার দরুন কয়েক বছর সেখানে একদানাও ফসল হয়নি। তবুও বাচ্চাটা শুকিয়ে মরে যাক, মন যেন চাইছিল না। স্বামীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে, স্ত্রীও তার পিছু নিল।

লোয়াবা গিয়ে লোয়াঙ্গাকে কোলে তুলে নিল। ঘরে নিয়ে এল তারপর। তার শরীর তখন সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়েছে। কাপড়ে আগুনের তাপ নিয়ে তাই সেঁক দেওয়া হতে লাগল শরীরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে লোয়াঙ্গা চনমনে হয়ে উঠল। এবার তাকে এনফুস্তি খেতে দেওয়া হল। আটা দিয়ে তৈরী একধরনের খাবার। গ্রাম অ্যাঙ্গোলার প্রধান খাবার বলা যেতে পারে।

সেদিন থেকে লোয়াঙ্গা ওই পরিবারের একজন হয়ে গেল।

দিন গড়িয়ে চলল এরপর।

মাস—বছর—বেশ কয়েক বছর।

লোয়াঙ্গার যতই বয়স বেড়েছে ততই তার শরীর হয়ে উঠছে সুগঠিত। ক্রমে পূর্ণ যুবায় পরিণত হয়েছে সে। তখন তার শরীর দেখার মত। কালো পাথর কেটে কেউ এই অনিন্দ দেহ যেন সৃষ্টি করেছে। গ্রামের কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা—সমস্ত যুবতীর দৃষ্টি তার উপর। লোয়াঙ্গা নিজের মূল্য বোঝে। কাউকে কিন্তু ধার ঘেঁসতে দেয় না। কারণ—

ইতিমধ্যে লোয়াবা পরিবারের অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন আর কাউকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় না। বরং বলা চলে সমৃদ্ধি কিছুটা উপচেই পড়েছে যেন। গ্রামের ওপারে জাদু-মন্ত্রে যে এই বিপুল পরিবর্তন এসেছে তা কিন্তু নয়। এই পরিবর্তনের জন্য সর্ব্বাংশে দায়ী লোয়াঙ্গা।

লোয়াবার যে ছোট্ট একখণ্ড জমি ছিল—লোয়াঙ্গা প্রাণ ঢেলে সেই জমির পরিচর্যায় মন দিয়েছিল। অজন্মার দিন তখন কেটে গেছে। ফসল ফলল ভাল। পরের বছর আরো ভাল। তৃতীয় বছর বেশ কিছুটা তামাকের জমি সংগ্রহ করতে পারল ওরা। অনেকের ঈর্ষাকাতর মনকে মাড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলল। সচ্ছলতা করায়ত্ব হতে আর সময় নেয়নি।

তামাক ক্ষেতের পাশেই যে ঘাসের জঙ্গল, তার মধ্যে একটা কুঁড়ে লোয়াঙ্গা তৈরী করে নিয়েছিল। এই নিভৃত বিশ্রাম স্থলটির কথা একজন ছাড়া সকলেরই অজানা। প্রতিদিন কোন এক সময় ওই কুঁড়ে ঘরের ঘাসে ছাওয়া বিছানার উপর গা এলিয়ে দিত

লোয়াঙ্গা। শুয়ে শুয়ে বার বার তাকাত অপরিসর প্রবেশ পথের দিকে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষায় সময় কাটাতে হত না। লিয়া এসে ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেই একমাত্র এই কুঁড়ের সন্ধান জানে। নিজের দুই সুডৌল বাহু দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে লোয়াঙ্গাকে আদরে ভাসিয়ে দিত। বহুবার মনে হয়েছে লোয়াঙ্গার তার চেয়ে সুখী মানুষ বুঝি আর কেউ নেই।

—লিয়া লোয়াবার মেয়ে। স্বাস্থ্যবতী, প্রাণোচ্ছল যুবতী। দুজনে একই সঙ্গে হেসে খেলে বড় হয়েছে। লিয়ার যখন মাত্র এগারো বছর বয়স, লোয়াঙ্গার পনেরো—তখন থেকেই প্রেম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। লোয়াবা বা তার-স্ত্রীর ব্যাপারটা যে অজানা আছে তা নয়। জানতে পারার পর তারা খুশীই হয়েছিল। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে হবে না, আবার গ্রামের সেরা ছেলে লোয়াঙ্গা—তাকে জামাই হিসাবে পাওয়া যাবে।

সেদিন—

কয়েক জন লোক নিয়ে লোয়াঙ্গা তামাকের চারা-গুলির পরিচর্যা করছিল। বৃষ্টি এসে গেল। সকাল থেকেই মেঘের আনাগোনা। দুপুরের দিকে মেঘ ঘন হয়ে এলেও দুচার ফোঁটাও ঝরেনি। লোয়াঙ্গা ভেবেছিল, এই ভাবেই সন্ধ্যা উতরে যাবে। বৃষ্টি হবে সেই রাত্রির দিকে। কিন্তু তার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করে প্রথমে টিপ-টিপ, তারপর মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

এই সময় এই ধরনের জল হাওয়া অভাবনীয়।

আজ আর কাজ করা যাবে না। বেলাও পড়ে এসেছে। লোকজনদের ছুটি দিয়ে লোয়াঙ্গা তার গুপ্ত আস্তানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। ভিজতে ভিজতেই পৌঁছাল ঘরে। কোমরে এক চিলতে কাপড় বাঁধা ছিল। সেটা খুলে ভিজে শরীর মুছে নিল। ঘামের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এই কাপড়ের টুকরো সব সময় সে কাছে রাখে।

এখন আর কিছু করার নেই। পুরু শুকনো ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়ে লোয়াঙ্গা নানা কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে অন্য-মনস্ক হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিসের শব্দ হওয়ায় চমকে প্রবেশ পথের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। এইরকম অঝোর বর্ষনের মধ্যে লিয়া এখানে আসবে ভাবতে পারেনি।

ভিজে নেয়ে গেছে লিয়া। বিক্ষিপ্ত চুল বেয়ে বুকে-পিঠে টপ টপ করে জল পড়ছে। কিন্তু কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। লোয়াঙ্গা উঠে বসল। কিছু বলার আগেই লিয়া হাঁটু-মুড়ে বসে তাকে সবলে জড়িয়ে ধরেছে। টাল সামলানি অবশ্য সম্ভব হয়নি। দুজনেই পড়েছে।

তারপর একই সঙ্গে হেসে উঠেছে দুজনে।

আদরে আদরে দুজনে দুজনকে ভরিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ।

তারপর—

—তুমি গ্রামে না ফিরে এখানে এসে শুয়েছিলে যে?

লোয়াঙ্গা একটু হেসে বলল, আমি জানতাম, কাজ বন্ধ হয়ে যাবার পরও বাড়ী ফিরছি না দেখে তুমি এখানেই চলে আসবে।

—এই বৃষ্টির মধ্যে আমি কখনই আসতাম না। একটা জরুরী কথা তোমাকে একান্তে বলতে চাই। তাই—

—কাল নয়? আজই বলতে হবে?

—হ্যাঁ। আজই।

তারপর একটু থেমে লিয়া বলল, আজই তুমি আমাকে বৌ করে নেবে।

মহাবিস্ময়ে লোয়াঙ্গা বলল, আজই! এই দুর্যোগের মধ্যে?

লিয়া ওর বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে অবরুদ্ধ গলায় বলল, আজই। দুর্যোগের মধ্যেই। তুমি তো জান মা বাবা অমত করবেন না।

—এত তাড়া হুড়ো করে কেন? তোমার মা আজই আমায় বলেছেন, তামাকের ফসল উঠলে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

তখন আমি তোমাকে বৌ করে নেব। তোমার বাবা সারা গ্রামের লোককে খাওয়াবেন। আজ তার সে সাধ্য তো আছে।

—আছে জানি। কিন্তু এতদিন যে অপেক্ষা করা চলবে না। তার আগেই আমাকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

লোয়াঞ্জা অবাক হয়ে গেল।

—কারা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে?

—সর্দ্দার আর তার অনুচররা।

—সেকি!

—সকালের দিকে ঘরে আমি একাই ছিলাম। বাপের বয়সী লোকটা এসে পরিষ্কার ভাবে মনের কথা বলল। তার অনেকগুলো বৌ আছে, তবুও সে আবার আমায় বৌ করতে চায়।

এরকম গুরুতর কথা শোনার পরও লোয়াঞ্জা সহজ গলায় বলল, লোম্বানা কিছুই করতে পারবে না। বরং আমিই ওর সর্দ্দারগিরি ঘুচিয়ে দেব। তখন ওর বৌ-গুলোকে লোকে লুটে নেবে।

—তুমি ওর সর্দ্দার গিরি ঘোচাবে কি ভাবে?

—তোমার বাবা এখন স্বচ্ছলতায়, প্রতিষ্ঠায় ও সম্মানে লোম্বানাকে পিছনে ফেলেছেন। আমি গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের ইচ্ছে তোমার বাবাই এবার সর্দ্দার হোন।

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল লিয়া।

—তুমি ভেতরে ভেতরে এত কিছু করেছো! কবে—কবে হবেন বাবা সর্দ্দার? তখন কিন্তু লোম্বানাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

—খুব বেশী দেরী নেই। দু একদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন।

বাইরে তখন সমান তোড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে দুটি মিলনৎসুক নরনারী ভবিষ্যতের কল্পনায় লীন হয়ে রইল।

সেই দিন রাত্রে—

রাত অবশ্য তখনও গভীর হয়নি। তবে গ্রামের সকলেই যে যার ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। লোয়াঙ্গা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে, কুঁড়েঘর-গুলির পিছন দিয়ে পশ্চিম দিকে চলল। বারোয়ারী উঠান ঘিরেই সমস্ত কুঁড়ে। তার উদ্দেশ্য এই পথ দিয়ে সকলের অগোচরে লোম্বানার আস্তানায় পৌঁছান।

ইতিমধ্যে লোয়াঙ্গা ভেবে দেখেছে, এখন আর সমস্ত কিছু চেপে রাখাব কোন মানে হয় না। লোম্বানাকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে আসবে, সে চিরকাল লিয়াকে নিজের করে রাখতে চায়। এর কোন নড়চড় হবে না। শত্রুকে সতর্ক করে দিয়ে তারপর তাকে বিদ্ধস্ত করতেই সে অভ্যস্ত।

বৃষ্টি এখন না হলেও চলতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। চারিধার ভরে গেছে কাদায়। আকাশে পাতলা মেঘের আস্তারণ। তারই আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে প্রতিপদের চাঁদ। তবুও হাল্কা আলোর আভা অন্ধকারকে তরল করে রেখেছে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর লোয়াঙ্গা থেমে গেল।

তাকে থামতে হল সচকিত ভাবেই।

কাছেই কোথাও ঘোড়া ডেকে উঠল।

গ্রামের কারুর ঘোড়া নেই। তার অজান্তে কেউ যদি আজ ঘোড়া এনেও থাকে তবে বাইরে নয়, জন্তুটিকে বেঁধে রাখবে বারোয়ারী উঠানে। বাইরে হিংস্র প্রাণীর উৎপাত আছে। লোয়াঙ্গা এবার সতর্কতার সঙ্গে এগুলো। কয়েক পা এগুবার পর, চোখ সইয়ে সে যা দেখল তাতে বিস্ময়ে ভেঙ্গেপড়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

একটা নয়, বেশ কিছু সংখ্যক ঘোড়া বিভিন্ন গাছের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। শুধু তাই নয়, ঘন ঝোপগুলির ওধারে বৃত্তাকারে আগুন জ্বলছে। আগুনের আসেপাশে অনেক লোক শুয়ে-বসে। এতদূর থেকে তাদের চেনা যাচ্ছে না বা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না কথাবার্তা।

ব্যাপার কি ?

ওরা কারা ?

বিস্মিত লোয়াঞ্জা আবার লোম্বানার ঘরের দিকে এগুলো। সর্দ্দারকে ঘুম থেকে তুলে নিজের বক্তব্য পেশ করার আগে এই ব্যাপারটার উল্লেখ করতে হবে। বিপদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার এত বয়স হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে এক পাল লোককে গ্রামের ধারে কাছে আসতে দেখেনি।

আরো বিস্ময় লোয়াঞ্জার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সন্তর্পণে সর্দ্দারের ঘরের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে আলো জ্বলছে। ভেসে আসছে চাপা কথাবার্তার আওয়াজ। অনেকগুলি লোকের মধ্যে কথাবার্তা চলছে বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে দেওয়ালের এক জায়গা থেকে মাটি ঝরাতে লাগলো লোয়াঞ্জা। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ছোট্ট ফাঁক সৃষ্টি হল, তাই দিয়ে ঘরের একাংশ সহজেই চোখে পড়ল।

ভালো পোষাক পরা তিনজন সাদা চামড়ার লোক বসে আছে। আদেশের ভঙ্গীতে কথা বলছে তারা। সাদা চামড়াদের পিছনে এক সারি লোক দাঁড়িয়ে আছে। পর্তুগীজ আর দেশীয় রক্ত মিশ্রীত বাদামী রং-এর এই সমস্ত বর্ণশঙ্কররা স্বভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। একবার লোয়াঞ্জা এণ্ডিকা বন্দরে গিয়েছিল—সমুদ্রগামী পোত কেমন হয় তাই দেখতেই গিয়েছিল। সেখানে বর্ণশঙ্করদের নিষ্ঠুরতা সচক্ষে দেখে এসেছে। পর্তুগীজদেরও এককাঠি উপরে যায় এরা।

সর্দ্দার দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনের দিকে বিনীত ভঙ্গীতে। টুকরো টুকরো কথাও কানে ভেসে আসছে। লোয়াঞ্জা কিন্তু ওই সমস্ত কথার অর্থ করতে পারল না। ওই ভাষা সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাত। তবে এটুকু বুঝতে তার অসুবিধা হল না, কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটতে চলেছে। আশঙ্কায় মন কাঁপতে আরম্ভ করল।

লোয়াঞ্জা তাড়াতাড়ি সরে এল ওখান থেকে। এখানে থাকা

আর নিরাপদ নয়। ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সে আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চলল। চিন্তার কীট তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুরে চলেছে। কোন অশুভ লগ্নকে ওই গোপন বৈঠক ত্বরান্বিত করছে? কখনও কোন সাদা চামড়া এই গ্রামে পদার্পণ করেনি। তারা নিজে এসেছে—না, সর্দ্দার তাদের ডেকে এনেছে?

লোয়াঙ্গা গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনেছে, পর্তুগীজরা এই দেশটা হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিয়েছে। এখানকার সম্পদ ধুয়ে মুছে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজেদের দেশে। স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন তখন শ'য়ে শ'য়ে আঙ্গোলাবাসীকে মেরে ফেলছে। পাশবিক বিলাস চরিতার্থ করার জন্য তাদের চাই স্বাস্থ্যবতী কালো যুবতী। প্রয়োজন মত যখন তখন তাদের সংগ্রহ করছে। তাই বর্ণশঙ্করের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে।

চিন্তার অতলান্তে তলিয়ে যেতে যেতে লোয়াঙ্গা পৌঁছাল নিজেদের কুঁড়েগুলির কাছে। এত সমস্ত দেখে শুনে এসে, চুপচাপ নিদ্রার কোলে নিজেকে সঁপে দেবার কোন মানে হয় না। পর্তুগীজরা গ্রামে এসেছে এবং সর্দ্দারের সঙ্গে মিলে মনে হয় কোন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে—একথা এখুনি বন্ধুবান্ধবদের জানাতে হবে। তারপর গ্রামের আর সকলকে।

লোয়াঙ্গা ঘুরে দাঁড়িয়ে এগুতে গিয়েই থামল। বাইরে কাউকে কিছু বলার আগে লোয়াবাকে বলা দরকার। তিনি সমস্ত শুনে কি বলেন দেখা যাক। সে দ্রুত ঘরের সামনেকার উঁচু জমিটার উপর উঠল। তার উপর পাতা দিয়ে ছাওয়া চাল। লোয়াবা ওখানেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

কয়েকবার ঠেলা খেয়ে উঠে বসল ও।

ঘুম জড়ান চোখে বলল, কি হয়েছে?

লোয়াঙ্গা যা দেখেছিল দ্রুত গলায় বলে গেল।

এবার নড়েচড়ে বসল লোয়াবা। তারপর শঙ্কিত গলায় বলল, আমাদের এখানেও তাহলে ওরা এসে পড়েছে। তুমতুরের সর্দ্দারকে লোম্বানার কাছে কাল আসতে দেখেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। লোকটা—

—তুমতুরের সর্দ্দার কি খুব খারাপ লোক ?

তুমতুর বেশ কয়েক ক্রোশ দূরের একটি গ্রাম।

—খুব খারাপ। সে সামান্য লাভের লোভে মানুষ যোগান দেয় সাদাদের। আবার সাদারা বিদেশে সেই সমস্ত মানুষ বেচে অনেক লাভ করে। ওধারের কয়েকটা গ্রাম প্রায় উজাড় হয়ে গেছে। জোয়ান মেয়ে-মদ্দ একটাও নেই। এমনকি আধবয়সীদের পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে।

লোয়াঙ্গার মনে পড়ল, এই ধরনের কথা আগেও সে শুনেছে কয়েকবার এর তার মুখ থেকে। এই চালান দেওয়ার ব্যাপারটাকে নাকি দাস ব্যবসা বলে। আনাজপাতির মত কেনা বেচা হয়। সাদারা নগদ দাম দিয়ে সাদাদের কাছ থেকেই কালোদের কিনে নেয়। তারপর তাদের আজীবন অমানুষিকভাবে খাটায়।

—তবে কি—

—আমার মনে হচ্ছে লোম্বানাও লোভে পড়েছে। এই গ্রামের মানুষদের সে বোধহয় ধরিয়ে দিতে চায়।

কথা শেষ করে লোয়াবা উঠে দাঁড়াল।

তারপর মহা উত্তেজিত ভাবে বলল, বোধহয় নয়, নিশ্চয়। আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। আর অপেক্ষা করা চলবে না। লিয়াকে নিয়ে এখুনি তুমি জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকোও। আমি যতজনকে পারি সতর্ক করছি গিয়ে।

—সকলে এক জোট হয়ে ওদের তাড়িয়ে দিতে পারি না ?

—না, পারি না। ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আর দাঁড়িয়ে থেকোনা। যাও, তাড়াতাড়ি কর—

লোয়াবা বিত্যুৎ বেগে অদৃশ্য হল।

ঠিক এই সময় গ্রামের অপর প্রান্ত থেকে কোলাহল ভেসে এল। অশ্রুত বিকট সমস্ত শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। চোখে পড়ল ঘন ঘন আগুনের ঝলকানি। লোয়াঙ্গা আর দাঁড়াল না। দ্রুত ঘরে ঢুকেই লিয়াকে তু-হাত দিয়ে বুকে তুলে নিল। তারপর বেরিয়ে এল।

বাইরে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। তারই মধ্যে লোম্বানার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সে সকলকে শান্ত হতে বলছে। রাজার জাতের লোকেরা ভাল কাজ দেবার জন্য নিয়ে যেতে এসেছে এই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছে। লিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে কিছু বুঝতে না পেরে ভীতভাবে লোয়াঙ্গার দিকে তাকাল।

লোয়াঙ্গা বলল, সাদারা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

—কেন ?

—সে অনেক কথা। আমরা জঙ্গলে পালাচ্ছি।

—আমায় নামিয়ে দাও। তু'জনে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।

লিয়াকে নামিয়ে দিল লোয়াঙ্গা। তারপর তুজনে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে লাগল। গ্রামের এক দিকটা তখন আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। কোথায় আগুন লেগেছে মনে হয়। যে যেদিকে পাচ্ছে ছুটে পালাচ্ছে। ওরা গহন অরণ্যে মিলিয়ে যাবার আগেই কিন্তু অঘটন ঘটে গেল। আচমকা কয়েকজন চেপে ধরল লোয়াঙ্গাকে। হাজার চেষ্টা করেও সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। লোহার চেন দিয়ে শক্ত করে পা তুটো বেঁধে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই মুখ ফিরিয়ে দেখল, মশাল জাতীয় আলো হাতে কয়েকজন বর্ণশঙ্কর এসে পড়েছে। তারই মত শৃঙ্খলিত হয়েছে আরো অনেকে।

আর—

প্রায় নগ্ন করে ফেলা হয়েছে লিয়াকে। বিদ্রোহিনী যুবতীকে তুজন জোয়ান ধরে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে। তার উলঙ্গ সৌন্দর্য্য

দুচোখ দিয়ে লেহন করছে দীর্ঘদেহী এক সাদা মানুষ। তার ঠোঁটের কষ বেয়ে লালা ঝরে পড়ছে যেন।

রাগে গিস গিসিয়ে উঠেছে লোয়াঙ্গা। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। তার মত শক্তিমান পুরুষও এখন কত অসহায়। সর্দ্দারের গলার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। কান্না আর আর্তনাদে সব একাকার হয়ে গেছে। দীর্ঘদেহীর ইঙ্গিত পেয়ে কয়েকজন প্রায় ঝুলিয়ে লিয়াকে অন্যত্র নিয়ে চলল। লোয়াঙ্গা এই সময় উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই মাথায় তীব্র আঘাত অনুভব করল।

চোখের উপর নেমে এল দ্রুত গভীর অন্ধকার।

আর কিছু মনে নেই!

সারিবদ্ধ ভাবে কালো মানুষের দল চলেছে। প্রায় হাজার খানেক হবে। দুটি গ্রাম থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। কোমরে বাঁধা চেনের সঙ্গে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত। ক্লান্ত ভঙ্গীতে সকলে এগুচ্ছে, আর একটানা হয়ে চলেছে ধাতব শব্দ।

আসে পাশেই রয়েছে চামড়ার চাবুক হাতে বর্ণশঙ্করর‍া। কারুর একটু বেচাল দেখলেই সপাৎ করে চাবুক গিয়ে পড়ছে তার পিঠে। এছাড়া পর্তুগীজরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। মনে হয় একপাল ছাগলকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে সতর্ক রাখালরা।

লোয়াঙ্গাও আছে এই দলে। তার মাথার যন্ত্রণা এখনও কমেনি। কমে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু বুকের মধ্যকার হাহাকার থামবে কি ভাবে? গ্রামের অনেক মেয়ে পুরুষ রয়েছে দলে। কিন্তু লিয়া নেই। সেও তো ধরা পড়েছিল। তবে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? লোয়াঙ্গা একরকম স্থির নিশ্চিত হয়েছে, এ জীবনে লিয়ার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ভোর হওয়ার মুখেই যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, এখন বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক। সূর্য্য উপরে উঠছে যত, রৌদ্রের তেজ তত অসহনীয় হয়ে উঠছে। আফ্রিকার উপর সূর্য্যের আক্রোশ যেন একটু বেশী। প্রত্যেকেই ঘামে নেয়ে উঠেছে। কিন্তু কারুর মুখে কথা নেই। সকলেই নিজের নিজের চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে।

সময় কেটে চলেছে।

কানে এসে বাজছে শুধু বিরামহীন শৃঙ্খল ঝঙ্কার।

বেলা পড়ে এল ক্রমে। ক্লান্ত দলটি তখন নদীর ধারে এসে পড়েছে। তেষ্টা সকলেই এতক্ষণ উপায়হীন অবস্থায় চেপে রেখেছিল। নদীর টলটলে জল দেখে কারুরই মন আর শান্ত থাকতে চাইছে না। সৌভাগ্যের বিষয় রক্ষকদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া রাত এসে পড়েছে। তখন পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয়।

পর্তুগীজ অধিনায়কের আদেশে যাত্রাভঙ্গ হল। সকলের প্রাণ ফিরে এল একটু বসতে পেয়ে। কড়া পাহারার মধ্যেই অবশ্য বন্দীদের রাখা হয়েছে। পাহারার কাজ ভাগাভাগি করে চলছিল। কারণ রক্ষকরা পানাহারে আর বিলম্ব করতে নারাজ। এই সমস্ত হতভাগ্যদের জন্য স্বার্থত্যাগ করে করে তারা নাকি নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

নদীর পাড়ে সকলে এসে বসার পরও কত সময় কেটে গেছে। ভাগ্যের কি করুণ পরিহাস, মাত্র কয়েক হাত দূরে জল থৈ থৈ করছে, কিন্তু এক ফোঁটা কেউ এখনও পর্যন্ত মুখে দিতে পারে নি। খিদে আর তেষ্টা পাগল করে তুলছে সকলকে। হট্টগোল আরম্ভ হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে টনক নড়ল প্রভুদের। গাধার বাচ্চাদের এবার কিছু খেতে দেওয়া দরকার। খেতে দিতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। বিক্রি হওয়ার আগে পর্যন্ত এদের তাজা রাখতে না পারলে ভাল দাম পাওয়া যাবে না। চালানদাররা একেই বড় খুঁত খুঁতে।

সকলকে তাড়িয়ে একেবারে নদীর ধারে এবার নিয়ে যাওয়া হল। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল জল খাবার জন্য। অনেকে আবার প্রাকৃতিক কাজ সেরে নিল এই সময়—নারী-পুরুষ পাশাপাশি, লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়ে। উপায় নেই, সকলেই যে সকলের সঙ্গে যুক্ত চেনের বাঁধনে।

আবার ফিরিয়ে আনা হল সকলকে আগের জায়গায়। সন্ধ্যা তখন উতরে গেছে। আগুন জালান হয়েছে এখানে ওখানে। আগুনের টকটকে আভা আর অন্ধকার মিলেমিশে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। খাবার দেওয়া হল এবার। আহামরি কিছু নয়। আধপোড়া মাখা আটার দলা। তাই সকলে গো-গ্রাসে খেতে লাগল। পেটের জ্বালা যে কোন উপায়ে ঠাণ্ডা হোক তাই সকলে আপ্রাণভাবে চাইছিল।

রাত বাড়তে লাগল।

লোয়াঞ্জা তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। আজন্মের আবাস, লিয়া আর অন্ধকার ভবিষ্যত—এই তিনটি বিষয় এখনও তার মনে পাকসাট খেয়ে চলেছে। লোম্বানার মত কত সর্দ্দার যে অসংখ্য গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে তার হিসাব কেউ রাখে নি। তারা নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য অত্যাচারী বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগীতা চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন ধরে।

—তিনটে মেয়েকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল।

চমকে মুখ ফেরাল লোয়াঞ্জা। পাশেই ছিল আধশোয়া অবস্থায় তাদেরই গ্রামের সিবারু। উত্তর যৌবন এই মানুষটির সঙ্গে লোয়াঞ্জার তেমন সদ্ভাভ ছিল না। তবে এখনকার কথা স্বতন্ত্র।

—কি বললে ?

—চেন খুলে তিনটে মেয়েকে ওধারে নিয়ে গেল দেখলাম।

গাছপালা ছাওয়া একটা জায়গার দিকে আঙুল নির্দেশ করল সিবারু। পর্তুগীজরা ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। লোয়াঞ্জার

বুঝতে অসুবিধা হল না কেন মেয়ে তিনটিকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে সেই দিকেই তাকিয়ে রইল।

সিবারু আবার বলল, আমি জানি কেন ওদের নিয়ে গেছে।

—কি জান ?

—সাদারা রাতটা আনন্দে কাটাতে চায়। তারা—

—মেয়ে তিনটেকে ওরা নষ্ট করে দেবে। পশুর মত অত্যাচার করবে ওদের উপর। শেষ পর্যন্ত মরেও যেতে পারে।

সিবারু কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই একজন বর্ণশঙ্কর প্রহরী এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কি বলাবলি করছিলে তোমরা ?

দুজনে কিছু বলতে পারল না।

—কুকুরের বাচ্চাদের মুখে যে কথা নেই! কি করে কথা বার করতে হয় তাও আমার জানা আছে।

অতি দ্রুত কয়েকবার চাবুক নেমে এল দুজনের উপর। পিঠের উপর যেন আগুন ধরে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ল দুজনে। এবার পা চালাল প্রহরী। গোটাকয়েক লাথি মেরে উপুর অবস্থা থেকে ওদের সোজা করে দিল।

—পালাবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল।

লোয়াঙ্গা এবার বলল কোন রকমে, আমরা অন্য কথা বলছিলাম।

—সেই কথাই শুনতে চাই ?

সিবারু বলল, তিনটে মেয়েকে ওধারে নিয়ে গেল। তাই আমরা বলাবলি করছিলাম—

—কোথায় নিয়ে গেল ? সব দিকে নজর আছে দেখছি !

—আমরা···মানে···

—চুপ বেয়াদপ।

যত

নাক

আরেকজন প্রহরী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। নিজের বাদামী মু

কদর্য্য হাসিতে ভরিয়ে সে এগিয়ে এসে বলল, এই নিগ্রোগুলো বনের পেটে জন্মায় নাকি? বেজন্মারা বুঝতে পাচ্ছিস না কেন, সারা রাত ছুঁড়ি তিনটে রাজার জাতের জন্য বার বার শরীর পেতে দেবে। এতো তাদের ভাগ্য।

আরেক প্রস্ত চাবুক বর্ষণ করে তারা সরে গেল।

মার খেয়ে দুই হতভাগ্য কুঁকড়ে পড়ে রইল। চারিধারে এত লোক রয়েছে, কেউ টুঁ-শব্দ করতে পারল না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদিকে রাত বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির ডাক ছাড়া অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে চারিধারে। বর্ণশঙ্কর প্রহরীরাও নিঃশব্দে চলা ফেরা করছে। তাদের কারুর কারুর হাতে মশাল জাতীয় আলো।

আরো বেশ কিছুক্ষণ পরে—

বন্দীদের মধ্যে কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না। না থাকারই কথা। সমস্তদিন ধরে দীর্ঘ পথ চলায় সকলে ক্লান্ত। ঘুম সহজেই চোখের পাতায় নেমে এসেছে। লোয়াঞ্জা কিন্তু জেগেই আছে। চাবুক শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে বলে ঘুম আসেনি তা নয়। এতক্ষণ মনে মনে একটা পরিকল্পনা ভাঁজছিল।

সিবারুকে এবার অল্প একটু ধাক্কা দিল।

চাপা গলায় বলল, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?

—না। ঘুমতে পারলাম না।

—আমিও জেগে রয়েছি। তোমার একটা সাহায্য চাইছিলাম।

—কি রকম সাহায্য?

—তোমারও তাতে লাভ হবে। আমি পালাতে চাই, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

অসীম বলে উত্তেজনা দমন করে সিবারু বলল, তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে? শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছি আমরা। পালাব কি ভাবে?

—সফল হব কি না জানি না। তবে একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।

—আমায় কি করতে হবে বল?

—বিশেষ কিছু নয়। আমার কোমর বেড় দেওয়া বালাটা চেপে ধরে থাকতে হবে। আমি চেষ্টা করে দেখব, জোড়ের মুখে লাগান তালাটা মুচড়ে ভাঙ্গতে পারি কি না।

—তুমি ভাঙ্গতে পারবে না।

—সকলেই তো বলতো আমার গায়ে ভীষণ জোর। দেখি একবার চেষ্টা করে। তুমি শক্ত করে বালাটা চেপে ধরে রাখবে। আওয়াজ-টাওয়াজ করো না।

প্রত্যেক বন্দীরই কোমরে একটি করে লোহার বালা পরানো আছে। গলিয়ে পরানো হয় নি। খিলেন দেওয়া বালা। কোমরে পরিয়ে তালা আটকে দেওয়া হয়েছে। আবার সেই বালার সঙ্গে তিন হাত করে মোটা শেকল যুক্ত। এই ভাবে কয়েক শ' মানুষ একই সারিতে যুক্ত হয়ে রয়েছে।

সিবারু নির্দ্দেশ মত কাজ করার পর লোয়াঞ্জা নিজের দুহাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তালা ভাঙ্গার কাজে নিজেকে ব্যপৃত করল! সমস্ত কিছুই করতে হচ্ছিল অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। সহজে কিন্তু সাফল্য এল না। রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল লোয়াঞ্জার হাতের তালু।

শেষে—

গলদঘর্ম্ম অবস্থায়, শক্তির সঙ্গে মরিয়া ভাব মিশিয়ে তালা ভেঙ্গে ফেলতে সফল হল লোয়াঞ্জা। এই তালা দিয়ে বন্দী করা অবস্থায় কত হতভাগ্যকে এর আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার হিসাব কে রেখেছে? স্বাভাবিক কারণেই বহু ব্যবহৃত তালার প্রাণশক্তি কমে এসেছিল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে লোয়াঞ্জা সিবারুকেও মুক্ত করল। যত সতর্কতার সঙ্গেই এই কাজ করা হোক না কেন, আশপাশের লোক

ঠিকই বুঝতে পেরেছিল কি ঘটছে ওখানে। কেউ কিন্তু একটু শব্দ করেনি, নিজেরাও মুক্ত হবার জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে নি। মনে হয়, তারা ভেবেছিল, সকলের মুক্ত-হবার সম্ভাবনা নেই—সে চেষ্টা করতে গেলে এই দুঃসাহসিক প্রয়াস বানচাল হয়ে যাবে। বরং যে দুজন হতভাগ্য নিজেদের মুক্ত করেছে, তারা পালিয়ে বাঁচুক।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দরুন প্রহরীরা কিছুটা নিশ্চিন্ত। তারা বহুবারই দলে দলে কালো কুত্তাদের এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে বন্দরে নিয়ে গেছে। লোহার কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার ঘটনা বড় একটা ঘটেনি। তারা বন্দীদের প্রদক্ষিণ করেছে বটে, তবে এখানে ওখানে জড় হয়ে অশ্লীল ইয়ার্কির হররাও তুলছে অনেক সময় ধরে।

লোয়াঙ্গা এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল। হাত পঞ্চাশেক দূরে তিনজন প্রহরী কি সমস্ত বলাবলি করছে আর জোরে জোরে হাসছে। এখুনি এদিকে আসবে বলে মনে হয়। এরাই কাছাকাছি। বাকীরা আছে নানা ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ভাগ্যক্রমে লোয়াঙ্গা আর সিবারু রয়েছে নদীর ধারের দিকেই। তাদের কাছ থেকে তীরের দূরত্ব হাত ত্রিশেকের বেশী হবে না। এখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে। দুজনে উঠে দাঁড়াল। তারপর তীব্র বেগে ছুটতে লাগল নদীর দিকে।

শব্দ একটু হয়েছিল নিশ্চয়? কিম্বা শেষ পর্যন্ত সহবন্দীদের উত্তেজনা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল—তাই লক্ষ্য করে ফেলেছিল কোন প্রহরী। কারণ যাই হোক না কেন, ঝটিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তারা লক্ষ্য করল দুজন লোক পালাচ্ছে। মহা সোরগোল তুলে তারা তিনজন তো বটেই, তাদের আওয়াজ শুনে আরো অনেকে ছুটে আসতে লাগল দুজনের দিকে।

যারা প্রাণ হাতে করে ছুটছে তাদের ধরা বোধহয় সহজ হয় না। তাছাড়া নদীর তীর এদেরই কাছাকাছি ছিল। বর্ণশঙ্কর প্রহরীরা যখন পাড়ে এসে পৌছাল তখন লোয়াঙ্গা আর সিবারু ডুব সাঁতার

দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অশ্রাব্য গালাগালির সঙ্গে, আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দ ভেসে এল কয়েকবার। জলে নামার সাহস অবশ্য কারুর হল না। একে গভীর রাত, তার উপর নদী কুমির শঙ্কুল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

লোয়াঙ্গা আর সিবারু স্রোতের মুখে নিজেদের ছেড়ে দিল। কুমিরের ভয় তাদের মনেও যে নেই তা নয়। কিন্তু মুক্তির জন্য নদীকে অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অবশ্য আঙ্গোলার সব নদীতেই যে কুমির আছে তা নয়। হিংস্র জলজন্তু মুক্ত এই নদী হলে অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। যে ধার দিয়ে তাদের তাড়িয়ে আনা হয়েছে, স্রোতের গতি সেই দিকে। পথ চলার কষ্ট আর সময় দুই বেঁচে যাবে।

অনেকক্ষণ পরে লোয়াঙ্গা অনুভব করল সিবারু আর তার পাশে নেই। কোন কারণে পিছিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। কিম্বা স্রোতের ধাক্কায় সে অন্যত্র কোথাও ছিটকে গেছে। সিবারুর অবস্থান নিয়ে চিন্তা করার সময় অবশ্য এখন নয়। নিজেকে সামলে ভাসিয়ে রাখার কাজেই এখন একাগ্র থাকতে হবে।

ক্রমে ভোর হয়ে এল।

এবার আর জলে থাকা নয়। স্রোতের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করে লোয়াঙ্গা কোন রকমে নিজেকে পাড়ে এনে ফেলল। তারপর প্রায় নিস্তেজ শরীরকে টেনে নিয়ে গেল অদূরের ঝোপের পাশে। ওখানেই শুয়ে রইল রৌদ্র না ওঠা পর্যন্ত।

উঠে যখন বসল তখন মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। কিন্তু কিছু করার নেই। সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করেই গ্রামের পথ ধরতে হবে। পথে ফলটল পাওয়া যেতে পারে। তখন পেট ঠাণ্ডা করা যাবে। লোয়াঙ্গা উঠে দাঁড়িয়ে চারিধার দেখে নিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। এখান থেকে গ্রামের দূরত্ব কতটা বোঝা ভার।

টলতে টলতে চলতে আরম্ভ করল লোয়াঙ্গা।

·········লোম্বানার ঘরের দিকে তাকিয়ে ঘাস বনের মধ্যে একই ভাবে তাকিয়ে লোয়াঙ্গা বসে আছে। ইতিমধ্যে প্রতিপদের চাঁদ অনেকটা আকাশ পার হয়ে এসেছে। সারা দুপুর হেঁটে গ্রামের প্রান্তসীমায় এসে সে পৌঁছেছিল। পথে অযত্নে বর্দ্ধিত কলাগাছের অভাব ছিল না। কলা খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করেছিল।

লোয়াঙ্গার দুচোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। লিয়া আর বেঁচে নেই সে বুঝতে পেরেছে। ফিরে এসেছে শুধু গ্রামের দুর্দশার জন্য দায়ী লোম্বানাকে শাস্তি দিতে। তারপরই সে চিরজীবনের জন্য এ অঞ্চল ত্যাগ করবে।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। লোয়াঙ্গা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। লোম্বানার ঘরের পিছন দিকে এখন সে পৌঁছাতে চায়। ঘাস সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর সে থেমে গেল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কয়েক হাত দূরের একটি কুঠীর দেখা যাচ্ছে। এ সেই জায়গা যেখানে লিয়াকে নিয়ে তার কত সোনালী সময় কেটেছে। সেই দিনগুলি আর ফিরে পাওয়া যাবে না। লোয়াঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

॥ খ ॥

অসংখ্য নিরালা অবসর লিয়াকে নিয়ে যেখানে কেটেছে, সেই কুঠীরের পাশ দিয়ে যাবার সময় লোয়াঙ্গা থামল। মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেদনার সুর ঝঙ্কার তুলছে। ফেলে আসা মধুর দিনগুলি সারিবদ্ধভাবে চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে যেন।

লোয়াঙ্গা শেষবারের মত কুঠীরের ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়াল। হয়তো এখনও লিয়ার মিষ্টি হাসি দেওয়ালে ঘা খেয়ে খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। প্রবেশ করেই টাউরি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে। পায়ে কিছু একটা বেধে যাওয়ায় এই বিপর্যয়ের উপক্রম।

লোয়াঙ্গা ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করল বস্তুটা কি। অন্ধকার চোখে সয়ে আসতেই মনে হল কি যেন নড়ছে। হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেই অনুভব করল, কারুর কাঁধে হাত রেখেছে। লোয়াঙ্গা চমকে উঠল। এই অসময়ে এখানে কি করছে লোকটা?

তারই মত কোন পলাতক নয়তো?

—কে তুমি?

কোন উত্তর এল না।

—উত্তর দিচ্ছনা কেন?

মৃদু কাতরুক্তি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

হাত কাঁধ থেকে একটু নীচের দিকে নেমে আসতেই দ্বিতীয়বার চমকাবার পালা তার। পুরুষ নয়, নারী! বুকের উদ্ধত ভঙ্গী আরো বুঝিয়ে দিয়েছে, শুধু নারী নয়—যুবতী! এই গভীর নিশিথে, এই বিজন অঞ্চলে, একা যুবতী এখানে কি করতে এসেছে? নিশ্চয় লাঞ্ছনা এড়াবার জন্য এখানে এসে লুকিয়ে আছে।

—তুমি আমাদের গ্রামের কেউ বলে মনে হচ্ছে। আলো নেই বলে চিনতে পাচ্ছি না। আমি লোয়াঙ্গা পালিয়ে এসেছি কোন রকমে।

শীর্ণ গলায় যুবতী বলে উঠল এবার, তুমি—তুমি ফিরে এসেছো—

একি! এও কি সম্ভব?

—লিয়া—

—লোয়াঙ্গা—

—তুমি বেঁচে আছো? আমি যে ভেবেছিলাম—

—আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল।

—একথা বলছো কেন? আমি তো ফিরে এসেছি। সত্যি, এত ভাল লাগার দিন আমার জীবনে আর আসেনি।

লিয়া কোন উত্তর দিল না।

—লিয়া—

একেবারেই নিশ্চুপ সে।

লোয়াঙ্গা আর দ্বিরুক্তি না করে, দুহাত চালিয়ে অনুভব করে নিল লিয়ার দেহের অবস্থান। তারপর তাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে এসে, সামনে যে কয়েক হাত পরিষ্কার জায়গা ছিল—সেখানে শুইয়ে দিল। এখানে অন্ধকার কিছুটা তরল হলেও, পরিষ্কারভাবে কিছু দেখা যায় না। তবে এটুকু ঠাহর করা গেল, লিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানে নেই। যেন নেতিয়ে পড়ে রয়েছে।

লোয়াঙ্গা আবার ঘরে এসে প্রবেশ করল। মাঝে মধ্যে রাতে বেরাতে এখানে এসে কাটিয়ে গেছে। আলোর প্রয়োজন হয়েছে তখন। ঠুকে আগুন বার করার দুটো পাথর এখানে এনে রেখেছিল। ঘরের কোন হাতড়ে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত পাথর দুটো পেলো লোয়াঙ্গা।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর জড় করা শুকনো ঘাসে অগুন ধরানো

সম্ভব হল। আলোয় লিয়াকে দেখে লোয়াঙ্গা স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে সে। গালে ও বুকের নরম স্থানে সমস্ত আঁচড়ান কামড়ানোর দাগ। এমন কি·········বুঝতে বাকী থাকে না লিয়া নিদারুণভাবে অত্যাচারিতা।

রাগে শরীর তেতে উঠল লোয়াঙ্গার। এখুনি ছুটে গিয়ে এই নির্ব্বিচার ধর্ষণে যে সহযোগীতা করেছে, সেই বিবেকহীন লোম্বানার মাথা ছিঁড়ে আনতে মন চাইছে। অসীম বলে নিজেকে সংযত করে লোয়াঙ্গা লিয়াকে সুস্থ করে তোলার কাজে ব্যাপৃত হল। সামান্য কিছু দূরে ছোট একটা বিল আছে। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। তিয়াজ পাতার ঠোঙ্গা বানাতে সময় আর কতক্ষণ লাগবে।

ঠোঙ্গায় জল ভরে, ফিরে এসেই ছিটে দিতে লাগল লিয়ার মুখে। অল্পক্ষণ পরেই চোখ মেলে তাকাল সে। গভীর ক্লান্তিকে ছাপিয়ে দুচোখের তারায় প্রশান্তি যেন বিস্তারিত হচ্ছে। একটু চেয়ে থাকার পরই কোন রকমে উঠে বসল লিয়া। তারপর দুহাত দিয়ে লোয়াঙ্গাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে।

লোয়াঙ্গা বাধা দিল না। কেঁদে হাল্কা হয়ে নিক।

শেষে—

—তুমি এখানে কিভাবে এলে?

লিয়া সরে গিয়ে পা মুড়ে বসেছে।

—মনে হল আর বাঁচব না। কোন রকমে এখানে নিজেকে টেনে নিয়ে এসেছিলাম। ওই ঘরে কত আনন্দে আমাদের দিন কেটেছে। তোমার সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তাই ইচ্ছে ছিল, ওখানেই মরে থাকব।

—আর ভয় নেই। আমি ফিরে এসেছি। আমরা আবারও একই সঙ্গে থাকব।

— তা হয় না লোয়াঙ্গা। আমি এখন বোঝা ছাড়া আর কিছু নই। ওরা আমাকে সব দিক দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে।

—তুমি ও সমস্ত কথা ভুলে যাও।

—ভোলা যায় না—আমি ভুলতে পারব না।

—আমি ভুলে যাবো। শুধু মনে রেখো, তুমি আমার কখনই বোঝা হবে না।

নতমুখী লিয়ার চোখ দিয়ে আবার টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। শেষে ভাবাবেগ কোন রকমে দমন করে বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে সত্যি কোনদিন যাবে না?

—আজ রাত শেষ হবার আগেই এই জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। তবে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। থাকবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এবার বলতো, আমাকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাবার পর গ্রামে কি হয়েছিল?

উত্তরে লিয়া যা বলল, তার সারমর্ম হচ্ছে, লোয়াঙ্গা মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে যাবার পর, বর্ণশঙ্কর প্রহরীরা তাকে হিঁচড়ে লোম্বানার ঘরে নিয়ে গেল। অর্দ্ধ শায়িত একজন সাদা চামড়ার সামনে তখন হাঁটু মুড়ে বসে ছিল সর্দ্দার। ঘরে আরো তিনজন সাদা চামড়া ছিল। এই সময় আরো কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে আসা হয়। তারপর সর্দ্দারকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার করে দিয়ে তারা মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েদের উপর।

রাত ভোর চলতে থাকে উপর্যপরি উন্মত্তবিলাস। সকাল হবার পর সর্দ্দারের সঙ্গে কি সমস্ত নিয়ে পরামর্শ হয় কিছুক্ষণ। আবার সারাটা দিন ব্যাভিচারে মত্ত থাকে সাদারা। চারজন যুবতী ত্রিশজন মানুষের প্রমত্ত আহার যোগাতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে চলে, তারপর তাদের রেহাই দেওয়া হয়। রেহাই না দিয়ে উপায় কি, লিয়া বা আর তিনজনের জীবনীশক্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

বারোয়ারি উঠানের একধারে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল লিয়া। গ্রাম তখন খাঁ খাঁ করছে। নারী পুরুষ কেউ কোথাও আছে বলে মনে হল না। উঠানের এখানে ওখানে কয়েকটি মৃতদেহ। কারা মরে পড়ে আছে অন্ধকারের দরুণ বুঝতে পারা যায় না। শেষ রাত্রের দিকে কোন রকমে টলতে টলতে উঠান পেরিয়ে খাস জঙ্গলের দিকে লিয়া চলতে থাকে। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল আর বাঁচবে না—লোয়াঙ্গার কথা তার তখন বড় বেশী করে মনে পড়তে থাকে। বহু স্মৃতি জড়িত এই কুঠারে তাই সে মরতে এসেছিল।

রাগ লোয়াঙ্গার আগে থেকেই ছিল। লিয়ার মুখ থেকে সমস্ত কিছু শুনে তার পরিমাণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেল। লোম্বানার আর কোন মতেই বেঁচে থাকা চলতে পারে না। তার মত অসংখ্য সুবিধাবাদী দেশময় ছড়িয়ে আছে সন্দেহ নেই। সেই সুবিধাবাদীদের মধ্যে একজনকেও যদি পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে পারে, তাও কম সান্ত্বনার বিষয় হবে না।

—তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।

ভীত ভাবে লিয়া বলল, কোথায় যাবে ?

—লোম্বানার সঙ্গে একবার দেখা করব।

—না, তুমি যাবে না। তার সঙ্গে তোমার কি দরকার ?

—ওরকম একটা লোকের বেঁচে থাকা চলতে পারে না। আমি ওকে—

—না—না, না লোয়াঙ্গা তুমি যাবে না। নিজের সর্বনাশ এই ভাবে ডেকে এনে কি লাভ ?

—তা হয় না লিয়া। যেতে আমাকে হবেই। অসংখ্য অত্যাচারিত আর মৃত মানুষের প্রতিভূ হয়ে প্রতিশোধ আমাকেই নিতে হবে। তাই বোধহয় পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

লিয়া এবার কি বলবে ভেবে পেল না। তবে এটুকু বুঝতে

পেরেছে, চিরকালের একরোখা লোয়াঙ্গাকে ওই কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। এদিকে কথা শেষ করেই লোয়াঙ্গা, শুকনো ঘাস সংগ্রহ করে আগুনের পাশে জড় করতে আরম্ভ করেছে। আগুন যাতে লিয়া জ্বালিয়ে রাখতে পারে।

কাজ শেষ করে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর থামল।

ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তবে সফল আমি নাও হতে পারি।

—তুমি যদি—

—তোমার আশঙ্কা সত্যি হলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। লোম্বানা আর তার দলবল আমাকেই মেরে ফেলতে পারে। তখন—

—তাই বলছিলাম তুমি যেওনা।

—তোমাকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে রেখে যেতে আমারও ভাল লাগছে না। কিন্তু কর্তব্য সবার উপরে। ফিরে আসতে পারবো এই আশা নিয়েই চললাম।

লোয়াঙ্গা দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই এসে পৌঁছাল গ্রামের সীমানায়। প্রেত-পুরীর মত থমথম করছে চারিধার। সর্দ্দারের আস্তানা এখান থেকে দেখা যায় না। ওখানে আলো আছে—আছে নানা নেশার মত্ততা। একটু দম নিয়ে লোয়াঙ্গা, অন্ধকারে গা মিশিয়ে মার্জ্জার গতিতে পৌঁছাল নিজেদের ঘরের কাছে।

খালি হাতে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া যায় না। হাতিয়ার সংগ্রহ করতে এখানে তাকে আসতে হল। ঘরে প্রবেশ করার পর নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে অসুবিধা হল না। ধারাল দীর্ঘাকৃত অস্ত্রটি এক সময় খুঁজে পেল। অস্ত্র হাতে পেয়েই বেরিয়ে আসছিল, একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল কোন পরিধেয়।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। নিজের কোমরে সেই পরিধেয় গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লিয়াকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখা যায় না।

কাজ শেষ করে যদি ফিরতে পারে তবে এটি তাকে পরানো যাবে। লোয়াঙ্গা এবার অসীম সাহসীকতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হল।

অধিকাংশ পর্তুগীজ বন্দীদের নিয়ে চলে গেলেও, কয়েকজন এখনও রয়ে গেছে। আর আছে ভারী সংখ্যায় বর্ণশঙ্কর প্রহরী। বোধহয় কাছাকাছি থেকে আরো ভাবী দাস সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে, তাই এই অবস্থান। লোয়াঙ্গা খোলা জায়গা এড়িয়ে, ওখানকার কাছ বরাবর পৌঁছে দেখল, কয়েকজন বর্ণশঙ্কর প্রহরী কয়েকটি যুবতীকে নিয়ে পড়ে আছে। প্রভুরা যথেচ্ছা ব্যবহার করার পর এদের দান করেছেন বোধহয় নফর দেব। বাকীরা এখানে নিদ্রিত। গ্রাম উজাড় করে দেবার পর বেশ নিশ্চিন্ত সকলে।

ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে। এখানে ওখানে আগুন জ্বলতে থাকায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সমস্ত কিছু। লোয়াঙ্গা সন্তর্পণে সর্দ্দারের ঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁক দিয়ে লোম্বানার অনেকগুলো বৌ-এর মধ্যে এক জোড়াকে ভেতরেই দেখতে পেল।

তারা এলিয়ে পড়া দুইজন প্রায় উলঙ্গ সাদার সেবায় ব্যস্ত।

নিগ্রোদের মানুষ বলেই মনে করে না পর্তুগীজরা। রাজ্যের ঘৃণা তাদের মনে সঞ্চিত আছে ওদের জন্য। অথচ নিগ্রোদের বিশ্বের নানা হাটে বেচে মুনাফা লুটতে বাধে না। বাধে না অবসর সময়ে কালো যুবতীদের নিটোল দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। ঈশ্বর জানেন তখন কোথায় থাকে চড়া সুরে বাঁধা, বহু ঢক্কনিনাদিত ইউরোপীয় সভ্যতা।

লোম্বানাও ঘরে রয়েছে। মুখ দেখে মনে হয় না সে কোন বিকারে ভুগছে। বরং বেশ বিগলিত ভাব। হাত কচলাতে কচলাতে কি সমস্ত বলছে যেন। একজন তুরিয় পর্তুগীজ তাকে হাত নেড়ে বিদায় করল। লোম্বানা বাইরে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াল। পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমের আরাধনা করবে কি না তাই বোধহয় ভাবছে।

লোয়াঙ্গা আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে দেওয়াল ঘেঁসেই দাওয়ার দিকে এগিয়ে এল। এবার দেখতে পেল লোম্বানা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সামনে গিয়ে আক্রমণ করার কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। জন কয়েক বর্ণশঙ্কর প্রহরী ঘোরা ফেরা করছে মাত্র কয়েক হাত দূরে। তারা নিশ্চয় পাহারার কাজে নিযুক্ত আছে।

লোয়াঙ্গা এবার বিশেষ এক পদ্ধতি অবলম্বন করল। ইচ্ছে করেই অল্প একটু শব্দ করল সে। লোম্বানা শব্দ শুনেই সচকিত হল। সন্দিগ্ধ ভাবে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতেই মুখোমুখি হল লোয়াঙ্গার আগন্তুককে চিনতে পেরে ভয়ে হীম হয়ে গেল সর্দ্দার। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ চীৎকারে ভরিয়ে তুলল চতুর্দ্দিক। প্রহরীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিছু একটা ঘটেছে বুঝতে পেরে তারা ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল।

দ্বিতীয়বার চীৎকার করার অবসর অবশ্য পেল না লোম্বানা। বিদ্যুৎগতিতে ধারাল অস্ত্র নেমে এসে তার কণ্ঠকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে দিল। সর্দ্দার মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার পর লোয়াঙ্গা আরো কিছু করার জন্য তৎপর হল। এখন পালাতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। ওদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি অন্য দিকে সরাবার জন্য সে ইতঃস্তত পড়ে থাকা কয়েকটি বড় সাইজের পাথর তুলে নিয়ে পরপর ছুঁড়ে দিল ঘোঁড়াগুলোর দিকে। জন্তুদের ভড়কানি ও অবিরাম ডাকা-ডাকিতে স্বাভাবিক কারণেই সকলের দৃষ্টি সেইদিকে পড়ল। প্রহরীরা তো বটেই—কয়েকজন পর্তুগীজও মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটল সেই দিকে। ওখানে নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে।

এই রকমই পরিস্থিতির আকাঙ্ক্ষা ছিল লোয়াঙ্গার। ঝটিতে সে রক্তে মাখামাখি অস্ত্র দিয়ে দেওয়ালের অনেকখানি চিরে ফেলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতরে। চারজন বেসামাল নারী পুরুষ এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। হকচকিয়ে গেলেও পর্তুগীজ দুজন দ্রুত সামলে নিল নিজেদের। কিন্তু কিছু করে ওঠার আগেই

লোয়াঙ্গার বেপরোয়া অস্ত্র চালনায় তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হল আঘাতের পর আঘাতে।

লোয়াঙ্গার দুই বৌও রেহাই পেল না। তারা ছিন্নমূল লতার মত এক পাশে লুটিয়ে পড়ল। এবার শেষ কাজ করে অর্থাৎ আলোর পাত্রটি শুকনো পাতা আর ঘাস দিয়ে তৈরী শয্যার উপর ছুড়ে মেরে, দেওয়ালের কাটা অংশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

তখন প্রচণ্ড হৈ হৈ চলেছে। প্রকৃত কি ঘটছে তখনও ওরা বুঝতে পারেনি। বেশ কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর লোয়াঙ্গা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, পশ্চিম দিকের কিছুটা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। আগুন ভাল ভাবেই ধরেছে সর্দ্দারের ঘরে। এখন বেশ হাল্কা বোধ করছে লোয়াঙ্গা। এত নিপুণ ভাবে সাফল্য লাভ করবে ভাবতেই পারেনি। আবার সে চলতে আরম্ভ করল। লিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এই অঞ্চল আজই ত্যাগ করতে হবে।

দুটি রাত আর দুটি দিন কেটে গেছে।

নিজেদের গ্রাম থেকে অনেকদূর চলে এসেছে দুজনে। যতদূর সম্ভব লোকালয় এড়িয়ে নদীর ধার ঘেঁসেই তারা এগুচ্ছে। লক্ষ্য হল, কঙ্গো আর আঙ্গোলার সীমান্তবর্তী গভীর অরণ্য অঞ্চল। গত দুদিন লোয়াঙ্গাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। কারণ প্রথম দিকে লিয়া চলতেই পারেনি। তাকে কাঁধে তুলে এগুনো ছাড়া উপায় ছিল না। অবশ্য ক্রমেই সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

বেলা তখন পড়ে এসেছে।

নদীর বাঁকের কাছাকাছিই আজকের মত চলার শেষ করেছে

দুজনে। রাত এখানেই কাটিয়ে কাল আবার চলতে আরম্ভ করবে। ক্রোশ দুয়েক পিছনে একটি গ্রামকে তারা পাশ কাটিয়ে এসেছে। বহুদিন আগে লোয়াঙ্গা এধারে এসেছিল বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেড়াতে। তাই সে জানে ক্রোশ খানেকের মধ্যে আরো একটি বড় গ্রাম আছে।

লিয়া আড় হয়ে শুয়ে লোয়াঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, কি খুঁজে বেড়াচ্ছো ওখানে ?

—দুটো পাথর খুঁজছিলাম। পেয়েছি।

—পাথর দিয়ে কি করবে ?

—দেখছো না কি রকম হাওয়া বইছে। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়বে। আগুন জ্বালবার জন্য পাথর খুঁজছিলাম।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর লোয়াঙ্গা শুকনো ঘাসে আগুন ধরাতে পারল। কয়েকবারে প্রচুর ঘাস এনে জমা করে রাখল আগুনের ধারে। তারপর এসে বসল লিয়ার কাছে। পেটের চিন্তা এখন বড় চিন্তা নয়। পথে ফলমূল প্রচুর পাওয়া গেছে। সঙ্গে সংগ্রহ করাও আছে কিছু। এখন প্রধান চিন্তা হল চলার পথ শেষ হবার পর সুষ্ঠু জীবন কি ভাবে আরম্ভ হবে।

কথাবার্তা না বলে দুজনে অদূরের নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এক সময় লিয়া বলল, তোমাকে আমি খুব ভাবিয়ে তুলেছি।

—না তা নয়। আমি ভাবছিলাম, কোথাও একটা আস্তানা না হয় নিলাম, তারপর আমাদের চলবে কিভাবে ?

—গাছের ফল আর নদীর জল খেয়ে।

—পশুপাখি মেরে মাংসও সংগ্রহ করা যাবে।

—তবে আর ভাবছো কেন ?

—ভাবছি, অন্য মানুষের সঙ্গ ছাড়া চিরকাল আমরা কিভাবে কাটাব। লিয়া একটু হেসে বলল, আমাদের ছেলে মেয়ে হবে যে।

হুজন থেকে আমরা বাড়তে বাড়তে অনেকজন হয়ে যাব না। তখন তো আমাদের পরিবারেই অনেক মানুষ হয়ে যাবে।

লোয়াঞ্জা লিয়াকে জড়িয়ে ধরল।

—ঠিক বলেছো। তুমি, আমি আর আমাদের ছেলেমেয়েরা—শেষ পর্যন্ত আমরাই একটা গ্রাম তৈরী করে ফেলতে পারব।

অনেকক্ষণ ধরে ভবিষ্যত নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলল হুজনের। সন্ধ্যা ততক্ষণে উত্তরে গিয়েছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে আগুনের ধারে ঘন হয়ে শুয়ে পড়ল লিয়া আর লোয়াঞ্জা। এধারে হিংস্র জন্তু না থাকায় জেগে রাত কাটাবার দরকার পড়ে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, ক্রমে ধিকধিক করে জ্বলতে লাগল।

সময় ক্ষয়ে চলেছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল লোয়াঞ্জার। স্বপ্নেই দেখলো বোধহয় কে তাকে খোঁচা মেরেছে। আগুনের দিকে চোখ পড়ল। সমস্ত ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, শুধু মোটা গাছের ডালটা লালচে অবস্থায় গনগন করছে। লিয়া একই ভাবে ঘুমচ্ছে। তাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজতে যাবে—খোঁচা খেল কাঁধে।

চমকে উঠল লোয়াঞ্জা। এতো স্বপ্ন নয়! সম্পূর্ণ বাস্তব। কাঁধে কিছু একটা লেগেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে গিয়েই ভয়ে নীল হয়ে গেল। মাত্র কয়েক হাতের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা ও বাদামী রংএর কয়েকজন মানুষ। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে পাশে রাখা অস্ত্র চেপে ধরে উঠে বসতে যাবার আগেই হুজন বলশালী লোয়াঞ্জাকে চেপে ধরল।

ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হল।

বাকীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কে একজন আবার শিস দিয়ে উঠল। যেন শিকারকে খেলিয়ে খাঁচায় পোরা হবে।

ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেছে লিয়ার। উঠে বসেই সে দেখতে পেয়েছে নিজেদের অন্ধকার ভবিষ্যত। আরেকদল দাস ব্যবসায়ীর হাতে পড়েছে। এবার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

দুজনের পক্ষে লোয়াঙ্গাকে সামাল দেওয়া সম্ভব হল না। আরো কয়েকজন এগিয়ে এসে শৃঙ্খলিত করল তাকে। এবারকার বৈশিষ্ট হল, কোমরে নয়, গলায় আঁটসাঁট লোহার বালা পরানো হয়েছে। তাতে ভারী চেন লাগান। দুহাতও বেড়ি দিয়ে আটকান হল।

দুজনকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল নদীর ধারে। খান পাঁচেক বড় বড় নৌকা ভাসছিল জলে। দিশী নৌকা নয়, পর্তুগীজ কায়দায় তৈরী। দুজনকে চড়ান হল একটিতে। খোলে গিজ গিজ করছে কালো মানুষ। সকলেরই হাতে বেড়ি আর গলায় চেন আটকান। লিয়া আর লোয়াঙ্গার গলার চেনের একাংশ নৌকার হুকের সঙ্গে আটকে দেওয়া হল। এমন ব্যবস্থা যে কোন মতেই পালান সম্ভব হবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাগুলি ছেড়ে গেল।

উজানে ভেসে চলল বিশাল নৌকাগুলি। এই দাস ব্যবসায়ীরা অনেক বেশী বুদ্ধিমান। এই পন্থায় অল্প সময়ের মধ্যে, অনেক ঝামেলা এড়িয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান সম্ভব হবে। মনে মনে ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে লোয়াঙ্গা লক্ষ্য করল, একজন বৃদ্ধ নিগ্রো কয়েকজন পর্তুগীজের সঙ্গে ভাবী দাসদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ নিগ্রোর সাজ-পোষাক দেখে মনে হয় সে কোন গ্রামের সর্দ্দার।

এক সময় সকলে লিয়া আর লোয়াঙ্গার কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়াল। পর্তুগীজদের মধ্যে একজনই কথা বলছিল নিগ্রো সর্দ্দারের সঙ্গে। বিশালদেহী এই ব্যক্তির মুখ ঘন সোনালী দাড়িতে ভরা। বিস্ময়ের বিষয়, কথা হচ্ছিল, দিশি ভাষায়।

বিশালদেহী লোয়াঙ্গার দিকে আঙুল তুলে বলল, এরকম চেহারার লোক পেলে দাম ভাল পাওয়া যায়।

—পথে আরো কয়েকজনকে পেয়ে যেতে পারেন। এরা ধরা পড়ার জন্যই যেন নদীর ধারে ঘুরঘুর করে।

—ক্যাপ্টেন রিকাডো একে দেখে খুশী হবে। শক্তিমান লোকই সে বেশী মাত্রায় চালান দিতে চায়।

সবিনয়ে সর্দ্দার বলল, আমিতো আপনাকে সব সময় শক্ত সমর্থ মানুষই দিয়ে এসেছি।

—এমন একজনকেও দিতে পারনি। এ আমার আবিষ্কার।

কথা শেষ করেই পর্তুগীজদের অধিনায়ক পিছন ফিরে অন্যত্র যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিলেন। সর্দ্দার দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

—সামনেই ওস্বেসি গ্রাম। ওখানে আমি নেমে যেতে চাই।

—বেশ তো। তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে।

— আমার পাওনাটা—

—পাওনা!

—আপনি কয়েক মাসের মধ্যে তো আর এদিকে আসছেন না। আমার পাওনাটা মিটিয়ে দিলে ভাল হয়।

অধিনায়ক উচ্চ হাস্যে সকলকে সচকিত করে তুললেন। তারপর একজন অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কার্ভালো, এর পাওনা মিটিয়ে দাও।

কার্ভালো যেন তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। তীক্ষ্ণ চীৎকার তুলে ঘুরে পড়ে গেল সর্দ্দার। আর কোনদিন একটি শব্দও তার মুখ থেকে বেরুবে বলে মনে হল না। গাঢ় আদিম রক্ত গড়িয়ে চলল পাটাতন বেয়ে। সেদিকে না তাকিয়েই অধিনায়ক স্থান ত্যাগ করলেন।

বাকীরা ধরাধরি করে সর্দ্দারের দেহ জলে ফেলে দিল। শৃঙ্খলিত যে সমস্ত ভাবী দাস আসেপাশে ছিল তারা এই রক্তাক্ত ঘটনায় হতবাক। লোয়াঙ্গা কিন্তু খুশীই হল। জাতির সঙ্গে যারা

বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের এই রকম কষ্টদায়ক পুরস্কার পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একটি কথাও কেউ বলতে পারল না।

লোয়াঙ্গাও নয়। লিয়াকে নিয়ে সে পড়ে রইল একইভাবে।

ক্যাপ্টেন রিকার্ডোর চেহারা হাজারের মধ্যে হারিয়ে যাবার মত নয়। যেমন দীর্ঘ, প্রস্থেও তেমনি বিশাল। মাংসের পাহাড় বললেই ভাল হয়। ঢেউ খেলান ঘন বাদামী চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। টকটকে লাল ভারী মুখের দিকে তাকালে সবচেয়ে আগে দৃষ্টি পড়বে বাঁচোখের উপর।

চোখটি নেই। অতীতের কোন ঘন ঘোর যুদ্ধের স্মৃতি বহন করছে। এখন ফিতে দিয়ে বাঁধা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত সোনার পাত ঝুবলে যাওয়া বাঁচোখ ঢেকে রেখেছে। বয়স অনুমান করা শক্ত। চল্লিশ হতে পারে, আবার, পঞ্চান্ন হতেও বাধা নেই। ব্রাজিলে দাস চালান দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর মত খ্যাতি আর কোন পর্তুগীজ নৌ-নায়ক অর্জ্জন করতে পারেননি।

অ্যান্টিকা বন্দরের একধারে গুদামের মত যে বড় বড় ঘর আছে, তারই সামনেকার চত্বরে দাঁড়িয়ে, ব্যবসায়ীক দৃষ্টিতে কালো মানুষদের নিজের একটি মাত্র চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ক্যাপ্টেন রিকার্ডো। ধরে আনা নিগ্রোদের ওই সমস্ত গুদামে ঠেসে রাখা হয়েছিল দিন দুয়েক। খেতে দেওয়া হয়েছিল নাম মাত্র।

আজ রিকার্ডো জাহাজ থেকে নেমেছেন মাল বুঝে নিতে। সকলকে কয়েক সারিতে দাঁড় করান হয়েছে। এখন চলেছে ঝাড়াই-বাছাই-এর কাজ। অর্থাৎ যারা রুগ্ন, বৃদ্ধ বা অতিমাত্রায় শীর্ণ তাদের নেওয়া হবে না। কারণ ব্রাজিলের খেত খামারের মালিকরা তাদের

মোটেই কিনতে চায় না। ফাউ হিসাবে নিতেও আপত্তি। তখন এই সমস্ত বাজে মাল নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝাড়াই-বাছাই-এর কাজ দেখছেন ক্যাপ্টেন রিকাডো। গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। তাঁর অনুচরেরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ গুছিয়ে চলেছে; বাছাই-এর পর সারিবদ্ধ শৃঙ্খলিত মানুষকে জাহাজে তোলা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সকলকে তুলে নেবার পর যোগানদারদের সঙ্গে হিসাবে বসবেন ক্যাপ্টেন। ব্রাজিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন আগামীকাল।

রিকাডোর কানে হঠাৎ উচ্চ গ্রামের কথাবার্তা এসে ধাক্কা খেল। একটি সারির শেষের দিক থেকেই যেন তর্জ্জন গর্জ্জন ভেসে আসছে। কোমরে গোজা চাবুক হাতের মুঠায় নিলেন ক্যাপ্টেন, তারপর এগুলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছাবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন, বিশালকায় এক নিগ্রো মিনতিমাখান মুখে কি যেন বলছে—আর তাঁর একজন অনুচর তম্বি করে চলেছে তার উপর।

রিকাডো গিয়ে পৌঁছালেন।

—কি ব্যপার বেরিনো?

বেরিনো বলল, এই লোকটা ঝামেলা করছে।

—জাহাজে উঠতে চাইছে না নাকি?

—না।

—তবে?

—ওই অসুস্থ ছুড়িটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার আব্দার ধরেছে ক্যাপ্টেন। যতবার লাইন থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করছি ততবারই ছুঁড়িটাকে আগলে রাখবার চেষ্টা করছে। কয়েকবার চাবুক পিঠে না পড়লে টিট হবে বলে মনে হচ্ছে না।

—দাঁড়াও।

রিকাডো কালো নিরেট দেহটির দিকে তাকালেন। এই দলে

এমন চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী আর একজনও নেই। বলতে গেলে, এমন একজনের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না। রিকাডো ভালই জানেন, এই ধরনের মালের বাজারদর কি রকম আকাশ-ছোঁয়া। পাঁচজনকে বিক্রী করলে যা পাওয়া যাবে, এ একাই তারচেয়ে বেশী অর্থ পাইয়ে দেবে।

রিকাডো আরো দেখলেন, একটি অসুস্থ দর্শন যুবতীকে সে কোন রকমে আড়াল করবার চেষ্টা করছে। তার মুখে রাগ নেই, হিংস্রতা নেই—আছে নিবিড় কাকুতি। ক্যাপ্টেন তার আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দিশী ভাষা তিনি ভালই জানেন। দাস ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে গেলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

—কি নাম তোমার?

—লোয়াঙ্গা।

—মেয়েটি কে?

—আমার—আমার বৌ।

—অসুস্থ মানুষ আমাদের কাজে লাগে না। ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

লোয়াঙ্গা মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ল।

—দয়া করুন বোয়ানা। আমি কাছে না থাকলে ও বাঁচবে না। যা আমায় খেতে দেবেন তাতেই আমাদের দুজনের চলে যাবে। আমাদের দয়া করুন—দয়া করুন বোয়ানা।

রিকাডো একটু ভাবলেন। তারপর ইঙ্গিত করলেন দুজনকে এগিয়ে যেতে।

একটু ইতঃস্তত করে সহকারীদের মধ্যে একজন বলল, কিন্তু ক্যাপ্টেন—

—তুমি কি বলতে চাইছো আমি জানি। লোকটাকে মনের দিক থেকে সবল রাখতে হবে আমাদের। দেখছো তো কি বিশাল চেহারা—ভাবনায় চিন্তায় যদি ওই চেহারা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে

মোটা লাভ হাতছাড়া হয়ে যাবে। বিক্রী হয়ে যাবার পরও যদি এই রকম জেদ ধরে, নতুন মালিক লাথি মেরে ছুঁড়িটাকে শেষ করে দেবে। আমাদের তাতে আর কি ক্ষতি বৃদ্ধি?

কথা শেষ করে রিকাডো চোখ টিপে হাসলেন।

ইঙ্গিত পেয়ে কৃতজ্ঞ লোয়াঞ্জা লিয়াকে নিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল। সে মোটেই জানেনা চিরদিনের মত মাতৃভূমি থেকে এইভাবে বিদায় নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার উত্তর পুরুষরাও আর কোনদিন এখানে পা রাখতে পারবে না।

## ॥ গ ॥

সন্ধ্যা হতে তখনও কিছুটা বাকি আছে।

পূবের আকাশে গাঢ় লালিমা। উত্তাল সমুদ্রের কালো জলের উপর লাল আভা এসে পড়ায় বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। জাহাজের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বিল ম্যাকগ্রে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। মনে হয় কিছুটা অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল বুঝিবা। তার দুরন্ত জীবনে এরকম অবকাশ কালে-ভদ্রেই আসে।

অন্যমনস্ক থাকলেও ম্যাকগ্রের মুখে পরতে পরতে বিরক্তি। কয়েকদিন ধরে দলবল নিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা রয়েছে সে। ইংলণ্ডের নৌবহরের ভূতপূর্ব জাহাজ কংকুয়েষ্ট শুধু ভেসে চলেছে। একটিও শিকারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাকগ্রের লক্ষ্য অবশ্য ফরাসীরা নয়, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দেশে যাতায়াতকারী স্পেনীয় বা পর্তুগীজ জাহাজ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের কেবিনে ম্যাকগ্রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল। শুয়ে বসে সময় কাটাতে অবশ্য তার ভাল লাগে না, কিন্তু উপায় কি? অবশ্য সে জানে, জলদস্যুদের জীবনে এরকম মন্দা সময় সময় আসে। তবে এও নাকি সুলক্ষণ। এরপর শিকার যখন আসতে আরম্ভ করে তখন ধরে কুল পাওয়া যায় না। ম্যাকগ্রে নিজের অভিজ্ঞতাতেও দেখেছে কথাটা মিথ্যা নয়।

তবুও বিরক্ত লাগে। কিছুটা অতিষ্ঠ হয়েই কেবিন থেকে বেরিয়ে সে ডেকের রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কখনও খালি চোখে, কখনও দুরবিন লাগিয়ে, দৃষ্টি অনেক দূরে প্রসারিত করেছে— যদি কোন জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্যই সেই জাহাজ ফরাসী বা ইংরাজদের হবে না।

বৃথা চেষ্টা।

একসময় ক্লান্ত হয়েই ম্যাকগ্রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মৃদু স্পর্শে চমক ভাঙ্গল তার। মুখ ফিরিয়ে দেখল মেরী খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী বলতে যা বোঝায় মেরী কিন্তু তা নয়। তবে সারা মুখে এমন মোহময় ভাব ছেয়ে রয়েছে যা মনকে মোহিত করে তোলে। এছাড়া নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী সে।

ম্যাকগ্রে একদৃষ্টে মেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি দেখছো?

—তোমাকে।

—আমাকে এত দেখতে তোমার ভাল লাগে?

—ভাল লাগে মেরী। এক এক সময় মনে হয়, এসমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে তোমাকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাই। তারপর বাকী জীবন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দিই গ্রামের বাড়ীতে।

শঙ্কিত গলায় মেরী বলল, ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেই রাজার সৈন্য তোমাকে ধরে ফেলবে। তখন—

—তখন তাদের কোনই অসুবিধা হবে না আমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে। আমি যে এন্তার মানুষ মেরে চলেছি সে কথা কার এখন অজানা বল? এ জীবনে বোধহয় আর দেশে ফেরা হবে না।

—আমরা তো আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করতে পারি।

—আমেরিকায়!

—তোমার তো এখন অর্থের অভাব নেই।

—তা নেই।

—এভাবে দিনের পর দিন ভেসে বেড়াতে আর ভাল লাগে না।

—আমারও লাগেনা মেরী। তুমি বলছো, আমেরিকার কোন আঘাটায় জাহাজ ভিড়িয়ে আমরা আর দশজনের সঙ্গে মিশে যাব? ওখানে কারুর পক্ষে আমাদের চিনে ওঠা সম্ভব নয় তোমার কি তা বিশ্বাস?

—আমি তাই মনে করি ম্যাক।

এতক্ষণ যেন অন্যলোকে বিচরণ করছিল ম্যাকগ্রে। এবার নিজেকে ঝাড়া দিয়ে বর্তমানে ফিরে এল। তার সুন্দর মুখের উপর ফুটে উঠল করুণ হাসি। মেরীর কাঁধে হাত রাখল ম্যাকগ্রে। তারপর আলতো ভাবে একটু চাপ দিল।

—আর তা হয় না। নিবিড় সুখের জন্য মন যতই লালায়িত হয়ে উঠুক না কেন, আমি জানি, যতদিন রক্তের তেজ আছে ততদিন এই ভাবেই আমাকে চলতে হবে। তারপর—

—তারপর আমরা—

—না। তারপরও নয়। অধিকাংশ জলদস্যুর ভাগ্যে যা ঘটেছে, মন বলছে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। ধরা পড়ে যাব একদিন। বন্দী করে আমাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। কিম্বা সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেউ মেরে ফেলবে আমাকে।

—সহকর্ম্মীরা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে!

—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই মেরী। নজীরের অভাব নেই। অর্থ আর ক্ষমতা লাভের লোভ বড় ভয়ানক জিনিস।

মেরী কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই—

—টাইগার—

তীক্ষ্ণ আহ্বান শুনে ফিরে দাঁড়াতেই ম্যাকগ্রে দেখল, উত্তেজিত ভঙ্গীতে কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে লেগ্র্যাণ্ড। এই জাহাজের ফার্স্ট মেট বলে নয়, চৌখস নাবিক হিসাবে তার সুনাম আছে।

—কি হয়েছে?

—জাহাজ—

ঝটিতে রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ল ম্যাকগ্রে। অনেকদূরে থাকায় আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। দূরবিন কাছেই ছিল। চোখের সামনে মেলে ধরতেই জাহাজটি পরিষ্কারভাবে দেখা গেল বটে, তবে

কোনদেশীয় বুঝে ওঠা সম্ভব হল না। আরো কাছে আসা দরকার। অবশ্য তার আগে করনীয় যা কিছু তা সেরে রাখতে হবে।

চোখ থেকে দুরবিন নামিয়ে মেরীকে বলল, কেবিনে চলে যাও।

তারপর ডেকের মাঝামাঝি জায়গায় এগিয়ে এল। তখন সেখানে বেশ কয়েকজন এসে জড় হয়েছে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশের প্রতীক্ষায় রয়েছে তারা।

ম্যাকগ্রে বলল, এক্ষুনি আমাদের পতাকা নামিয়ে বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে দাও। সকলে প্রস্তুত থাক গিয়ে। স্পেন বা পর্তুগালের জাহাজ হলে কোন মতেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

মুহূর্তের মধ্যে জাহাজে ব্যস্ততার ঝড় বইতে আরম্ভ করল। মাস্তুলের মাথায় কালো জমির উপর কঙ্কালের সাদা ছাপ দেওয়া যে পতাকা উড়ছিল তা নামিয়ে নেওয়া হল। তার জায়গায় উড়তে লাগল ইংল্যাণ্ডের চিহ্ন। ইতিমধ্যে আবার চোখের উপর দুরবিন তুলে নিয়েছে ম্যাকগ্রে।

দূরের জাহাজটি কংকুয়েষ্টের কাছে আসতে কিছু সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে অতীতকে আমাদের মন্থন করতে বাধা নেই। কুখ্যাত জলদস্যু বিল ম্যাকগ্রে বা সহকর্ম্মীদের কাছে খ্যাত টাইগার ম্যাকের ফেলে আসা দিনগুলির কথা এই বেলা জেনে না নিলে পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

.........ডাঃ আর্থার নিজের তরুন সহকারীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। সেই সুশ্রী মুখের এখন দৃঢ়তার চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নেই। এই সহকারীকে বছর দুয়েক আগে কাছে পেয়েছিলেন ডাঃ আর্থার। তারপর তাকে অতি যত্নে কাজ শিখিয়েছেন।

—তোমার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বিল। আর কিছুদিন পরেই তুমি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করতে পার। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে এই ভাবে নষ্ট করতে চাইছো কেন?

বিল ম্যাকগ্রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন স্যার। সে সমস্ত কথা আমি কোনদিন ভুলব না। তবে—

—থামলে কেন ?

—ডাক্তারী ব্যবসা আমি কখনই চালিয়ে যেতে পারব না। কিছু মনে করবেন না স্যার, এই অলস কাজ আমার জন্য নয়। মন পড়ে আছে সমুদ্রের দিকে। আমার ঠাকুর্দা সারাটা জীবন অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ভেসে বেড়িয়েছেন। আমিও আমার জীবন সেই পথে চালিত করতে চাই।

—তবে তুমি ডাক্তারের শিক্ষানবিশী করতে এসেছিলে কেন ?

—আমি আসতে চাইনি স্যার। বাবা আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিলেন। আর থাকতে পাচ্ছি না। এবার আমায় যেতেই হবে।

—বাড়ী ফিরে যাবে না নিশ্চয় ?

—এ জীবনে বোধহয় আমার আর বাড়ী ফেরা হবে না। আমি আজই লণ্ডন ছাড়ব। সোজা চলে যাব ফলমাউথ বন্দরে। খবর পেয়েছি ওখানে গেলে আমেরিকাগামী জাহাজে চাকরী পাওয়া সহজ। লণ্ডনে আবার যদি কোনদিন আসি আপনার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করব।

কথা শেষ করেই স্যাসেক্সের তরুন বিল ম্যাকগ্রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় পা দেবার পর তার মনে হল, এতদিন পরে সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ঠাকুর্দাকে সে কোনদিন দেখেনি, তবে তাঁর জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনেছে ঠাকুমার মুখে। সমুদ্র তখন থেকেই তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলেছে।

অথচ বাড়ীর সকলের ইচ্ছে বিল ডাক্তার হবে। সেই ইচ্ছেকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য বাপ ছেলেকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে পারিবারিক বন্ধু ডাক্তার আর্থারের তত্ত্বাবধানে রেখে এলেন। প্রবল অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেদিন বিল চুপ করে ছিল। দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাও এর একটা কারণ।

তারপর লণ্ডন তাকে অনেক শিখিয়েছে। চতুর করেছে—করে তুলেছে সাহসী। তারপর থেকে সে স্থযোগ খুঁজছে কি ভাবে এই একঘেয়ে জীবন থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মাত্র কয়েকদিন আগে, পোড় খাওয়া চেহারার একজন নাবিক এসেছিল হাতের ক্ষত নিরাময়ের জন্য। ডাঃ আর্থার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর, তাকে বললেন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে। তারপর অন্য রুগী দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কথা হচ্ছিল দুজনের। জানা গেল, অতি সম্প্রতি নাবিকটি অ্যাটলান্টিকে টহল দিয়ে ফিরেছে। লণ্ডনে এসেছিল এক আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করতে। আত্মীয়র বাড়ীতেই হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাতের খানিকটা জায়গা থেঁতলে গেছে। কথা প্রসঙ্গে ম্যাকগ্রে নিজের মনবাসনা জানাল। জানতে চাইল, কোথায় স্থযোগ পাওয়া যাবে ?

—লণ্ডনে বসে থাকলে স্থযোগ স্থবিধা পাওয়া যায় না।

—কোথায় যাব ?

—বন্দরে বন্দরে ঘোরাঘুরি করতে হয়। এখন যদি যেতে চাও, তবে ফলমাউথ চলে যাও। কাজ পেয়ে যাবে।

—আমি তো কাউকে চিনি না। কাকে—

—চেনাচিনির দরকার নেই। কিলিগ্রু পরিবারের কারুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই হল। ওরা তোমার মত তরুনদের খুঁজছে।

কিলিগ্রু পরিবারের বিশেষ স্থনাম আছে ইংল্যাণ্ডে। রাজ অনুগ্রহে সব সময়ই এঁরা ধন্য—এ সমস্ত ম্যাকগ্রের জানা ছিল। শুধু জানা ছিল না তাঁরা জাহাজ ভাসিয়ে দেশ বিদেশে ব্যবসা করেন। দিন কয়েক ধরে চিন্তা করল বিষয়টি নিয়ে, তারপর স্থির করে ফেলল, ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ফলমাউথই যাবে।

কিলিগ্রু পরিবারের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এঁদের ঐতিহ্য গাথায় পরিণত হয়েছে বলা চলে। তবে ইদানিং অর্থাৎ কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা যে কাজে লিপ্ত আছেন তা সাধারণ মানুষ কেন, সরকার পর্যন্ত জানে না। জানলে হতবাক হয়ে যেতেন। বর্তমান কিলিগ্রুদের গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করা হত।

এঁরা অসম্ভব গোপনীয়তার সঙ্গে জলদস্যুর পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন। অনেকগুলি জাহাজ আছে এঁদের। দেশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য চলে এই ধারণাই সকলের। আসল ব্যাপার হল, ওই সমস্ত জাহাজের প্রতিটি নাবিকই জলদস্যু। অ্যাটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর চযে তারা ধনরত্ন সংগ্রহ করে। তারপর ফিরে আসে ফলমাউথে। তখন সমস্ত কিছু ভাগাভাগি হয়। স্থানীয় মানুষরাই যখন বুঝতে পারে না তখন ম্যাকগ্রের মত বাইরের একজনের পক্ষে কিলিগ্রুদের সম্পর্কে কিছু আঁচ করা সম্ভব ছিল না।

ফলমাউথে পৌঁছেই সে বন্দর অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল। বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। মাল ওঠানামা করছে। চতুর্দিকে ব্যস্ততা আর চেঁচামেচির ঝড় বইছে যেন।

ম্যাকগ্রে প্রথমে স্থির করতে পারল না, কোথায় গিয়ে কার কাছে কাজের কথা পাড়বে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে সে একটা পানশালা দেখতে পেল, সেখানে মাতালেরা হৈ হৈ করছে। কিছু লোক আবার টেবিলের উপর গুটি সাজিয়ে কি সমস্ত খেলছে। ম্যাকগ্রে পানশালার মধ্যে ঢুকে পড়ল। মদ খেতে নয়, এই সমস্ত নাবিকদের কাছ থেকে কাজে লাগে এমন কিছু জানতে পারে যদি এই আশায়। ভিতরে প্রবেশ করবার বেশ কিছুক্ষণ পরেও তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না অনুভব করে সে এগিয়ে গিয়ে, অল্প কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে ধাক্কা মারল।

ধাক্কা খেয়ে লোটি পড়তে পড়তে নিজেকে কোন রকমে সামলে

নিল। তারপর মহা বিরক্ত হয়ে বলল, আমার গায়ের উপর যে হুমড়ি খেয়ে পড়লে ? চোখের মাথা খেয়েছো নাকি ?

বিনীত ভঙ্গীতে ম্যাকগ্রে বলল, ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। দুদিন খাইনি—তাই টাল সামলাতে না পেরে—

—দুদিন খাওনি তো এখানে কেন ? এখানে কি দানছত্র খোলা হয়েছে বাপু ? কেটে পড় দেখি—

—আজ্ঞে একটা চাকরী—

—চাকরী ! তুমি তো অবাক করলে ? ওহে তোমরা শোন—শোন—এই ছোকরা ব্রেভো জ্যাকের মদ্যশালায় চাকরী খুঁজতে এসেছে।

আট দশজন হৈ হৈ করে ছুটে এল। বিচিত্র এক দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখতে লাগল ম্যাকগ্রেকে। যেন এমন জীব আগে কখনও দেখেনি। ভীড় ঠেলে পানশালার মালিক বিপুল বপু ব্রেভো জ্যাক‌ও এগিয়ে এল।

—ছোঁড়াটার চেহারা কিন্তু খাসা ; কি বলো জ্যাক ?

—তাই তো দেখছি।

ব্রেভো জ্যাকের বিশাল থাবা ম্যাকগ্রের কাঁধে আছড়ে পড়ল, কি মতলবে এখানে ঢুকেছো এবার বলবে কি ?

ম্যাকগ্রে এবার বেশ ভয় পেয়ে গেছে। এরা যে সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। এখানে ঢুকে পড়ে যে ভাল কাজ করেনি, এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে বাধা নেই।

কাঁপা গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমি চাকরীর সন্ধান করছি।

—এখানে এসে ঢুকেছো কেন ?

—ভাবলাম আপনাদের কাছ থেকে কোন সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই—

—হুঁ। কি ধরনের চাকরী চাও ?

—নাবিক হতে চাই।

সকলে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল। এমন হাসির কথা যেন সচরাচর শোনা যায় না। ব্রেভো জ্যাক হুঙ্কার দিয়ে উঠতেই সকলে চুপ মেরে গেল।

—দূরের জাহাজ কি ভাবে লক্ষ্য করতে হয় জান?

—না।

—হাল ধরেছো কোনদিন?

—না।

—কামান দাগতে পার?

—না।

—কোনদিন মাস্তুলের উপরে উঠেছো?

—না।

দাঁত কড়মড়িয়ে উঠল ব্রেভো জ্যাকের। তারপর গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, তবে কি করতে এসেছো চাঁদ বদন? হুভার, ছোঁড়াটাকে লাথি মেরে এখান থেকে বার করে দাও।

হুভার বোধহয় তৈরীই ছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকগ্রের কাঁধ চেপে ধরল। কিন্তু পরমুহূর্তে ছিটকে পড়ল মাটিতে। এরকম যে একটা ব্যাপার ঘটতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। একজন নবাগত আড্ডার মধ্যে ঢুকে হুভারের মত জোয়ানকে এক লহমার মধ্যে প্লাট করে দেবে একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা।

হুভার ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়ল। কিন্তু সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবার আগেই সেখানে এলেন অভিজাত-দর্শন একজন পুরুষ। তাঁর সাজ পোশাকের পারিপাট্য যে শুধু লক্ষ্যণীয় তাই নয়, সেগুলি মূল্যবানও। ভোজবাজীর মত সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবেশ এমন নিরীহ হয়ে পড়ল যে বলার নয়। সকলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এধার ওধার। ব্রেভো জ্যাকের মুখে বিনীত হাসি।

—কি সৌভাগ্য। আপনি স্বয়ং আসবেন স্যার একথা ভাবতে

পারিনি। ফরাসীদেশের অতি উপাদেয় মদ আছে। একটু চেখে দেখবেন নাকি ?

অভিজাত-দর্শন ভদ্রলোক বললেন, এখন আমি অন্য প্রয়োজনে এসেছি। একজন ডাক্তারের সন্ধান দিতে পার ?

বিস্মিত গলায় ব্রেভো জ্যাক বলল, আপনার জাহাজে তো ডাক্তার রয়েছে স্যার।

—বিড়ম্বনার কথা আর বল কেন ? জাহাজের ডাক্তার গত সপ্তাহে মারা গেছেন। তাঁকে ক্যালেতে মাটি দেওয়া হয়েছে। এদিকে আমাদের ফার্স্ট মেট যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কি আর করি; আমাকেই বেরিয়ে পড়তে হল ডাক্তারের সন্ধানে।

—আমি আপনার কাজে লাগতে পারি।

অভিজাত-দর্শন ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষেই একজন রাজপুরুষ। রাজকীয় নৌবহরের অন্যতম জাহাজ "স্যালিসব্যারি"—তারই সুখ্যাত ক্যাপ্টেন হলেন জন গিলবার্ট। ম্যাকগ্রের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন গিলবার্ট। এই আধ ময়লা জামাকাপড় পরা তরুনটিকে চিকিৎসক মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছিল না।

তবু তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ফলমাউথেই প্র্যাকটিস করেন ?

—না। লণ্ডনে আমি ডাঃ আর্থারের সহকাবী ছিলাম।

—আপনাকে হয়তো অপারেশন করতে হতে পারে।

—মনে হয় সে কাজ আমি ভাল ভাবেই করতে পারব।

—বেশ। চলুন।

চিকিৎসকের সন্ধানে আর কত ঘোরাঘুরি করবেন। ছেলেটির আত্মপ্রত্যয় লক্ষণীয়। মনে হয় একে দিয়ে কাজ হবে। ক্যাপ্টেন গিলবার্ট ম্যাকগ্রেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ব্রেভো জ্যাক আর তার সঙ্গীরা হতবাক। নবাগত ছোকরা রীতিমত ভেল্কি দেখিয়ে গেল।

বড় বলতে যা বোঝায় "স্যালিসব্যারি" জাহাজখানি তাই। চারি ধার ঝকঝকে তকতকে। অনেক কিছু অদেখা দেখতে দেখতে ম্যাকগ্রে ফার্স্ট মেটের কেবিনে গিয়ে পৌঁছাল। উপুড় হয়ে শুয়ে মাঝবয়সী মেট যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। এখানে আসার পথেই ম্যাকগ্রে ক্যাপ্টেনের মুখে শুনেছে, পিঠে প্রকাণ্ড একটা ফোড়া হওয়ায় তাঁর এই কাহিল অবস্থা।

সময় নষ্ট না করে ফোড়াটা পরীক্ষা করল ম্যাকগ্রে। ছিলছিলে চামড়ার মধ্যে পুঁজ জমাট বেঁধে রয়েছে। বলতে গেলে পিঠের অর্দ্ধাংশই লাল হয়ে রয়েছে টাটিয়ে। অস্ত্রপ্রচার করতে যা কিছু লাগে তা সমস্তই ছিল জাহাজে। আনিয়ে নেওয়া হল এখানে। ক্যাপ্টেন কিন্তু বাইরে গেলেন না। একজায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখতে লাগলেন।

অপারেশন শেষ করতে ম্যাকগ্রের খুব বেশী সময় লাগল না। প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করল। যন্ত্রণা উপশম হবার পর ফার্স্ট মেট ঘুমিয়ে পড়লেন। কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে এসে যখন দাঁড়াল তখন তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিল ডাঃ আর্থারকে। আজ এই প্রথমবার তার মনে হল তাঁর শিক্ষার গুণে সে ধন্য।

ক্যাপ্টেন গিলবার্ট পিছু পিছুই এসেছিলেন।

বললেন মৃদু গলায়, তুমি যে এত ভালভাবে অপারেশন করতে পারবে ভাবতেই পারিনি। চমৎকার হাত।

—ধন্যবাদ স্যার।

—কি পারিশ্রমিক নেবে বল ?

ম্যাকগ্রে চুপ করে রইল।

—লজ্জার কিছু নেই। তুমি মন খুলেই বল ?

—জাহাজে আমাকে একটা চাকরী দিন স্যার। সমুদ্রে ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের।

ভ্রু কুঁচকে গিলবার্ট বললেন, তোমার নৈপুণ্য দেখার পর তোমাকে তো আর কোন সাধারণ কাজ দিতে পারিনা। যদিও ডাক্তারের অভাব রয়েছে জাহাজে। তবে—

—আমি কিছু মনে করব না স্যার। সাধারণ নাবিকের কাজ হলেও চলবে।

—না। তা হয়না। কি নাম তোমার?

—বিল ম্যাকগ্রে।

—দেখ বিল আমাকে একটু ভাবতে দাও। আপাতত তুমি এখানেই থাক।

ক্যাপ্টেনের এমন অভিভূত অবস্থা যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে সে খেয়াল নেই।

আমি কেবিনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। লেগ্র্যাণ্ড—

লেগ্র্যাণ্ড কোন জুনিয়ার অফিসার হবে। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়েছিল, ক্যাপ্টেনের আহ্বানে দ্রুত এগিয়ে এল।

—ডাক্তারের কেবিন তো খালি রয়েছে। বিলকে তুমি ওখানে নিয়ে যাও।

কথা শেষ করে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

আগামীকাল "স্যালিসব্যারি" ফলমাউথ ছেড়ে যাবে। ডাক্তারের মৃত্যু সংবাদ সদরে পাঠানো হয়েছে। কালকের মধ্যে যে নতুন ডাক্তার এসে পড়বে তার সম্ভাবনা অল্প। অথচ আর অপেক্ষা করার সময় নেই। ভূমধ্যসাগরে যখন তখন বৃটিশ বাণিজ্য তরীগুলি আক্রান্ত হচ্ছে—বলা বাহুল্য আক্রমণকারী অন্যদেশীয় জলদস্যুরা। "স্যালিসব্যারি"র মত আরো অনেকগুলি জাহাজের কাজ হল, বাণিজ্য-পোতগুলিকে রক্ষা করা আর জলদস্যুদের দাপট স্তিমিত করে দেওয়া।

নিজের কেবিনে পৌঁছাবার পরই ক্যাপ্টেন গিলবার্ট স্থির করে ফেললেন, কালকের মধ্যে সদর থেকে ডাক্তার এসে না পড়লে

বিলকেই অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করবেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ছেলেটির জ্ঞান ভালই মনে হয়।

ক্যাপ্টেন গিলবার্ট মদের বোতল খুলে বসলেন।

ডেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল ম্যাকগ্রে। আনন্দে তার মন ভরপুর! শেষ পর্যন্ত তার জীবনে শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শতাধিকবার বোধ হয় ডাঃ আর্থারকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছে। তিনি আন্তরিক যত্নে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলেই আজ তা কাজে লাগল।

জল কেটে পূর্ণ বেগে ভেসে চলেছে "স্যালিসব্যারি"। এই জাহাজের এই সময় ফলমাউথে উপস্থিতির দরুণই প্রথম চোটে ম্যাকগ্রে জলদস্যু হতে পারল না। আসল ব্যাপার হল, রাজকীয় নৌবহরের একটি জাহাজ ফলমাউথে আসছে সংবাদ পেয়েই কিলিগ্রুরা সতর্ক হয়ে যান। তাঁদের দলীয় যে সমস্ত জাহাজ লুঠের মাল নিয়ে আসছিল তাদের দূর সমুদ্রে থাকতে বলা হয়।

বলা বাহুল্য ব্রেভো জ্যাকের পানশালা ফলমাউথে জলদস্যুদের প্রধান আড্ডাখানা। সতর্ক থাকার নির্দেশ ওখানেও দেওয়া হয়েছিল। শুনতে পাওয়া যায়, আগে বিকারহীন মুখে ব্রেভো জ্যাক নাকি অজস্র মানুষ মেরেছে। বয়স বাড়ার দরুণ জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে ফেঁদে বসেছে পানশালা। তার আরেকটা কাজ হল, দলের লোক সংগ্রহ করা। ম্যাকগ্রেকে অবশ্য একটু ভাল করে বাজিয়ে দেখছিল। সময় ভাল নয়। সরকারি গুপ্তচর কিনা আগে জেনে নেওয়া দরকার।

সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফেরাতেই দেখল, লেগ্র্যাণ্ড এসে দাঁড়িয়েছে। তার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু বড় হবে। বেশ প্রাণখোলা মানুষ। ওকে ভাল লেগে গেছে তার।

—আমরা এখন কোথায় চলেছি ?

—জেনোয়া বন্দরে।

—জেনোয়া কোথায় বলুন তো ?

মৃদু হেসে লেগ্র্যাণ্ড বলল, ভূগোলের জ্ঞান আপনার খুব কম দেখছি ?

ম্যাকগ্রেও একটু হেসে বলল, স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে। জেনোয়া কোথায় আমি কিন্তু এখনও জানতে পারলাম না ?

—ইটালীতে।

—ওখানে আমরা যাচ্ছি কেন ?

—জেনোয়া বন্দরে গোটাতিনেক বৃটিশ বাণিজ্যপোত অপেক্ষা করছে, সেগুলি মিশরে যাবে। "স্যালিসব্যারি" পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

—ইদানিং জলদস্যুদের দৌরাত্ম খুব বেড়ে গেছে নাকি ?

—লাভের ব্যবসা। সকলেই করতে চাইছে আর কি।

একটু থেমে লেগ্র্যাণ্ড বলল, ক্যাপ্টেনকে আপনার কেমন লাগল ?

—চমৎকার মানুষ।

—মদ একটু বেশী খান।

—তাতে কিছু যায় আসে না। অনেকেই খায়।

—মেয়েদের প্রতি অসম্ভব দুর্বলতা আছে। সুযোগ পেলেই—

—তাই নাকি। কিন্তু এখন আর তিনি মেয়ে পাচ্ছেন কোথায়। জাহাজে তো কোন মহিলা নেই।

—আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে বটে। তবে—দেখুন মিঃ ম্যাকগ্রে, কিছু দিন থেকে আমি একটা সন্দেহের দোলায় দুলছি। আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন। পরে আপনাকে সমস্ত কথা বলব।

—আমি দারুণ আগ্রহ বোধ করছি মিঃ লেগ্র্যাণ্ড। এখনই আপনার ওই বিশেষ কথাটা বললে হয় না।

—বললাম তো আরো অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। পরে নিশ্চয় বলব।

তখন আপনার সহযোগীতা আমার দরকার হবে।

কথা শেষ করেই লেগ্র্যাণ্ড অন্যত্র চলে গেল।

সচকিত মন নিয়ে ম্যাকগ্রে দাঁড়িয়ে রইল। জুনিয়ার অফিসারটি কি বলতে চাইছিলেন, তার কিছুই আঁচ করতে পারে নি। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সমুদ্র বড় একঘেয়ে মনে হতে লাগল। বিছানায় গা এলিয়ে দেবার জন্য ম্যাকগ্রে এগুলো।

নিজের কেবিনের সামনে ক্যাপ্টেন গিলবার্ট দাঁড়িয়েছিলেন। এই অসময়েই স্খলিতভাব তাঁর—দু'চোখ লাল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণ ধরে সুরার সেবা করেছেন।

—এই যে বিল—কোথায় চললে ?

—কেবিনে যাচ্ছি স্যার।

—বিশেষ কোন কাজ নেই তো ? এস, গল্প করা যাক।

দুজনে ভেতরে গেল।

—দেখ বিল, ভাবছি আজ থেকে তোমাকে ডাক্তার বলে ডাকব।

—আমার আপত্তি নেই স্যার।

—এই জাহাজের একটা সম্মানজনক পদে তুমি রয়েছো। তোমাকে কিছুটা সম্মান দেওয়া যুক্তিহীন নয়।

ম্যাকগ্রে কি বলবে ভেবে পেল না।

—একি ! দাঁড়িয়ে কেন ? বস—বস—। মোরে—

কেবিন সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠ থেকে মোরে বেরিয়ে এল। পনেরো ষোল বছরের অতি সুশ্রী তরুন। ক্যাপ্টেনের ফাই ফরমাস খাটার কাজে নিযুক্ত আছে মনে হচ্ছে।

—একটা গেলাস দিয়ে যাও।

মোরে টেবিলের উপর একটা গেলাস এনে রাখল।

ক্যাপ্টেন গিলবার্ট সোনালী রং-এর পানীয় তাতে ঢালতে ঢালতে বললেন, চমৎকার জিনিস। খেয়ে দেখো—

—আমি তো স্যার—

—মদ খাও না!

একটু জোরেই হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নিজের গেলাস পূর্ণ করে নিয়ে বললেন, আমার মত মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে কাউকে বলি না। তবে একটু আধটু খাওয়া অন্যায় নয়।

ম্যাকগ্রেকে অগত্যা গেলাস তুলে নিতে হল।

—মোরে, আর কোন কাজ নেই। তুমি যেতে পার।

মোরে বোধ হয় বেশী কথা বলে না। মাথা হেলিয়ে চলে গেল।

—ছেলেটি ভাল। খুব বাধ্য। তারপর বল, কেমন লাগছে?

—চমৎকার। আপনি আমার যে উপকার করেছেন, জীবনে ভুলবো না।

—তেমন কিছু নয়। তোমাকে না পেলে জেনেওয়ার দিকে ভেসে পড়তে আমার অসুবিধা হত। ভাল কথা, তুমি তরোয়াল চালাতে জান তো?

বিস্মিত ম্যাকগ্রে বলল, আমি আপনার প্রশ্ন ঠিক ধরতে পারলাম না।

—জান কিনা বল?

—জানি স্যার। আমার বাবা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তলোয়ার চালাতে শিখিয়েছিলেন।

—তোমার বাবা আছেন তো? কি করেন তিনি?

—আগে রাজকীয় পদাতিক বাহিনীতে ছিলেন। এখন—

—বেশ—বেশ। তোমাকে প্রয়োজনের সময় অন্য কাজেও লাগানো যাবে দেখছি।

নিজের গেলাস শেষ করে ক্যাপ্টেন বললেন, আসল ব্যাপারটা কি জান, এই জাহাজে অন্ততঃ দেড়শ জন অস্ত্রচালক থাকা দরকার। আছে মাত্র আশি জন। এবারকার অভিযান শেষ করে দেশে ফেরার পর বাকী লোক পাব এই রকম নির্দেশ পেয়েছি। আমি তোমার

মত দু'একজনকে মাঝে মধ্যে 'কাজে নিযুক্ত করি। নবনিযুক্তরা আমার সহায়ক হবে কিনা তা জেনে রাখাটা অন্যায় নয়।

—আপনি এত যোদ্ধা নিয়ে করবেন কি?

—তুমি তো মহা ছেলেমানুষ দেখছি। আমাদের কাজ হল জলদস্যুদের পিছু ধাওয়া করা। সম্ভব হলে তাদের বন্দী করা বা জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া। শক্তির প্রয়োজন হবে না?

—এই দরিয়ায় কি আপনি প্রচুর জলদস্যু আশা করছেন?

—ওরা সর্বত্রই আছে। ঘাপটি মেরে থাকে শিকারের সন্ধানে। তবে ওরা যুদ্ধ জাহাজগুলোকে এড়িয়ে চলে। জানে, মূল্যবান কিছু পাবে না—পেরে ওঠাও সম্ভব নয়।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ম্যাকগ্রে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বিদায় নিল। তখন তার শরীরে কিঞ্চিৎ রঙ্গীন মত্ততা।

কয়েকদিন কেটে গেছে।

"স্যালিসব্যারি" নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে নিজের পথ ধরে।

খুব বেশী কাজের চাপ নেই—এ'কদিনে মাত্র জনকয়েককে ম্যাকগ্রে ওষুধপত্র দিয়েছে। সামান্য সমস্ত ব্যাপার। ক্যাপ্টেন গিলবার্টের কেবিনে গিয়েও বসেছে কয়েকবার। প্রতিবারই মোরে গেলাস এনে রেখেছে টেবিলে—বাধ্য হয়েই সুরার সেবা করতে হয়েছে।

কি সমস্ত কথা বলতে গিয়ে সেই যে সেদিন থেমে গিয়েছিল লেগ্র্যাণ্ড, আর বলেনি। ম্যাকগ্রে কয়েকবার খুঁচিয়ে জানবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ও প্রসঙ্গে সে আর মুখ খুলতে চায়নি। অন্যমনস্ক-ভাবে চুপ করে থেকেছে।

নিজের কেবিনে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল ম্যাকগ্রে। যদি তার এই চাকরী স্থায়ী না হয়? না হবার সম্ভাবনাই বেশী।

ক্যাপ্টেনের এই অনুগ্রহকে কর্তৃপক্ষ দীর্ঘস্থায়ী নাও করতে পারেন। সরকারী অনুমোদিত চিকিৎসক হিসাবে কোন অনুমতি পত্রের অধিকারী তো সে নয়।

এই কাজ গেলে অথৈ জলে পড়ে যাবে ম্যাকগ্রে। তার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ হল। মুখ ফেরাতেই দেখল, দরজার কাছে সঙ্কুচিতভাবে মোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অকারণে এখানে আসার ছেলে সে নয়। নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনীয় কারণে ক্যাপ্টেন তাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

—কি ব্যাপার ?

মোরে নম্র গলায় বলল, ক্যাপ্টেন আপনাকে ডেকেছেন।

—এখুনি ?

—হ্যাঁ, তিনি অসুস্থ।

—গত সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে। তখন তো তিনি চমৎকার ছিলেন।

—খুব ভোর থেকে অসুস্থতা বোধ করছেন।

ম্যাকগ্রে তাড়াতাড়ি কিছু ওষুধপত্র গুছিয়ে নিয়ে মোরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেনের কেবিনে গিয়ে দেখল, তিনি বিছানায় লম্বমান রয়েছেন। অসুস্থ যে তাতে সন্দেহ নেই। মুখে কাতরতার চিহ্ন। ম্যাকগ্রেকে দেখে অল্প একটু হাসলেন।

—কি হয়েছে ?

—শরীরে খুব ব্যথা। বিছানা থেকে উঠতে পাচ্ছি না। ঘুম পাচ্ছে মাঝে মাঝে কিন্তু ঘুমতে ভয় করছে।

—ভয় করছে কেন ?

—যদি ঘুম না ভাঙ্গে।

ম্যাকগ্রে হেসে ফেলল।

—আজ আপনি কিন্তু ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন ক্যাপ্টেন। গুরুতর কিছু হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। যাহোক, আমি পরীক্ষা করে দেখছি।

পরীক্ষা শেষ করে বলল, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মারাত্মক কিছু নয়। ঠাণ্ডা লাগার দরুনই হয়েছে। ওষুধ দিচ্ছি। সন্ধ্যার মুখে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারবেন আশা করি।

—মোরে একটা গেলাস দিয়ে যাও।

মোরের সাড়া পাওয়া গেল না।

ক্যাপ্টেন বললেন, ছোকরা গেল কোথায়?

—আমি দেখছি।

ম্যাকগ্রে সংলগ্ন ঘরের দিকে এগুলো। দরজার কাছ থেকে মোরেকে দেখতে পাওয়া গেল না। ভেতরে ঢুকে লক্ষ্য করল, যে বিরাট একটি কাঠের সিন্দুকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সুশ্রী মুখের উপর রহস্যময় হাসির প্রলেপ। চোখের উপর চোখ পড়তেই সে কাছে আসার ইঙ্গিত করল।

বিস্মিত ম্যাকগ্রে এগিয়ে গেল তার কাছে।

কাঠের সিন্দুকের তালা খোলা ছিল। মোরে ডালা তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারী হওয়ার দরুন তার পক্ষে সম্ভব হল না। বিশেষ কোন বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে চাইছে সন্দেহ নেই। ম্যাকগ্রে সিন্দুকের ডালা তুলে ধরতেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান পাথরখচিত গহনা থরে থরে সাজান রয়েছে ভেতরে। এত সম্পদ এক সঙ্গে সে আগে কখনও দেখেনি। সিন্দুকের ডালা আবার নামিয়ে দিল ম্যাকগ্রে। কিছু বলার উপক্রম করতেই লক্ষ্য করল, নিজের ঠোঁটের সামনে আঙুল রেখে তাকে নীরব থাকতে বলছে মোরে।

এলোমেলো চিন্তা ম্যাকগ্রের মনের মধ্যে পাকসাট খেতে লাগল। অবশ্য মুখে কিছু বলল না। ততক্ষণে মোরে একটা গেলাস এগিয়ে ধরেছে। গেলাস নিয়ে ফিরে এল ক্যাপ্টেনের কাছে। তিনি তখন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। পায়ের শব্দ কাছাকাছি হতেই চোখ মেললেন।

—ওষুধ খেয়ে নিন।

—খাবার কি ব্যবস্থা? খালি পেটে থাকতে হবে নাতো?

—হাল্কা কিছু খেতে পারেন।

—আর—

—না। আজ নেশা না করাই ভাল।

নেশা করতে পারবেন না জেনে ক্যাপ্টেন মুসড়ে পড়লেন। তাঁকে ওষুধ খাইয়ে ম্যাকগ্রে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। চিন্তিত ভাবে ধীর পদক্ষেপে কিছুদূর এগুবার পরই মুখোমুখি হয়ে গেল লেগ্র্যাণ্ডের। তার হাবভাব দেখে মনে হল সে যেন ম্যাকগ্রের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—মোরে আপনার কাছে গিয়েছিল শুনলাম?

—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন অসুস্থ সেই সংবাদ দিতে গিয়েছিল।

—কেমন দেখলেন?

—খারাপ কিছু নয়। ওষুধ দিয়েছি। আজকে পূর্ণ বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবেন।

—আমি ক্যাপ্টেনের কথা বলছিনা।

—তবে?

—লেগ্র্যাণ্ডের মুখে রহস্যময় হাসি।

—মোরের কথা বলছিলাম।

অবাক হয়ে ম্যাকগ্রে বলল, মোরের সঙ্গে তো আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ নয়।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে আগেও কয়েকবার দেখেছি।

—একান্তে সাক্ষাৎ তো এই প্রথম।

—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করে বলবেন কি?

—পরিষ্কার করে আর কি বলব? আপনি ক্রমে নিজেই বুঝতে পারবেন। যা হোক, ক্যাপ্টেন তাহলে কালকের মধ্যেই

ভাল হয়ে উঠছেন? কথা শেষ করেই কয়েক পা এগিয়ে এল লেগ্র্যাণ্ড।

—শুনুন—

আহ্বানে ঘুরে দাঁড়াল।

—ফলমাউথ বন্দরে আসবার আগে "স্যালিসব্যারি" জলদস্যুদের কোন জাহাজকে কি ঘায়েল করেছিল?

এই ধরনের প্রশ্ন নিশ্চয় লেগ্র্যাণ্ড আশা করেনি।

ম্যাকগ্রের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, প্রণালীতেই আমাদেব সঙ্গে পর্তুগীজ জলদস্যুদের দেখা হয়েছিল। তাদের জাহাজটা ঘায়েল করতে আমরা দ্বিধা করিনি।

—নিশ্চয় অনেক দামী জিনিষ পাওয়া গিয়েছিল?

—প্রচুর।

—ওই সমস্তই তো আমাদের সরকারের সম্পত্তি হয়ে গেল। সরকাবী তহবিলে জমা করে দেওয়া হয়েছে বোধহয়?

একটু চুপ করে থেকে লেগ্র্যাণ্ড বলল, আপনি অনেক কিছুই জানতে পেরেছেন দেখছি! না, জমা দেওয়া হয়নি। গোলমাল ওখানেই। এখানে দাঁড়িয়ে এই গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। আসুন আমরা নিরিবিলিতে যাই।

দুজনে ম্যাকগ্রের কেবিনে গিয়ে বসল।

—জন কলিন্সকে চেনেন তো?

—যাঁর চিকিৎসা করার জন্য আমি এই জাহাজে এসেছিলাম?

—হ্যাঁ। ফার্স্ট মেট জন কলিন্স প্রথম শ্রেণীর বজ্জাত। লোকটা আবার ক্যাপ্টেনের ডান হাত। দুজনে মিলে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

— কিসের ষড়যন্ত্র?

—জলদস্যুদের জাহাজ লুটকরা সম্পদ আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্র। ক্যাপ্টেন গিলবার্টের মত লোভা সচরাচর চোখে পড়েনা। জন কলিন্সের মত দোসর আবার সঙ্গে রয়েছে।

কিছুটা উত্তেজিত ভাবে ম্যাকগ্রে বলল, ফলমাউথে যখন জাহাজ নোঙর করেছিল তখন আপনি কোন সরকারী কর্মচারীকে এই সংবাদ জানিয়ে দেননি কেন? তাহলে তো ক্যাপ্টেন আর কলিন্সকে ভাল ভাবেই জব্দ করা যেত।

—তা হয়তো যেত। কিন্তু আমার একটা অন্য পরিকল্পনা আছে। আপনি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্যন্ত আমার পরিকল্পনার রূপরেখা আপনার সামনে তুলে ধরা যায় না। তবে জানবেন, এই জাহাজের অর্দ্ধেকের বেশী লোক ক্যাপ্টেনের কার্য্যকলাপে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত।

কি বলবে ম্যাকগ্রে প্রথমে স্থির করতে পারল না। বিচিত্র একজায়গায় এসে পড়েছে। লোভী ক্যাপ্টেন—ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত সহচরবর্গ—! তবে এটা ঠিক, এখানকার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তার দুঃসাহসিক মনে অনাস্বাদিত এক পুলক লাগতে আরম্ভ করেছে।

—কি ভাবে আপনার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনার কাছ থেকে শোনা কোন কথা প্রকাশ করে দেব না।

লেগ্র্যাণ্ড একটু চুপ করে বলল, আপনার মত লোককে আমরা নিজেদের দলে পেতে চাই। বেশ, শুনুন—

সে ম্যাকগ্রের আরো কাছে ঘেসে এল।

ক্যাপ্টেন গিলবার্ট ফার্স্ট মেট কলিন্সের সঙ্গে কথা বলছিলেন। দিন দুয়েক ধরে বেশ সুস্থই আছেন। তবে ম্যাকগ্রের পরামর্শ অনুসারে কমিয়ে দিয়েছেন মদ খাওয়া। কথাবার্তা হচ্ছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই।

দুজনেই কিছুটা গম্ভীর।

ঠিক এই সময় ভেসে এল, ভারী ও গম্ভীর শব্দ কয়েকবার। দুজনে সচকিত হলেন। একই সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত। আবার শব্দ। সন্দেহের আর তিল মাত্র অবকাশ নেই, কাছাকাছি কামান-দাগা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন গিলবার্ট কিছু না বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে। বিমূঢ় কলিন্সও তাঁর পিছু নিলেন।

ডেকের উপর তখন কিছুটা বিশৃঙ্খলা।

অনেকেই জড় হয়েছে ডেকের এক ধারের রেলিংএর পাশে। ক্যাপ্টেন হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে পৌঁছে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তখন বেশ রাত হয়েছে—গাঢ় অন্ধকার থাকায় কামানের ঝলকানি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। গিলবার্ট নিশ্চিত হলেন, জলদস্যুরা কোন ব্যবসায়ী জাহাজ আক্রমণ করেছে। কাছাকাছি যে ইংরাজ নৌবহরের একটি জাহাজ রয়েছে তা বোধহয় জানা নেই ওদের।

—তোমরা যে যার জায়গায় যাও। বোম্বেটে জাহাজ কাছেই আছে। কামান প্রস্তুত রাখ গিয়ে। কলিন্স, তুমিও দাঁড়িয়ে থেকোনা, দ্রুত দক্ষিণ মুখে জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর গিয়ে।

এতক্ষণ পরে ব্যবসায়ীক জাহাজটিকে দেখা গেল। গোলার ঘায়ে আগুন ধরে গেল একপাশে। লাল আভায় ভয়ার্ত হুড়োহুড়ি চোখে পড়ল। ওই সঙ্গে দেখা গেল জলদস্যুদের জলযানটিকেও। জাহাজ দুটি ক্রমে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে পড়ল। "স্যালিসব্যারি" থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব আধ মাইলের কম।

দস্যুরা দলে দলে ব্যবসায়ীক জাহাজে লাফিয়ে পড়ছে। ওখানে রক্তারক্তি কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। ম্যাকগ্রেও ততক্ষণে ছুটে এসেছে ডেকে। গোলার শব্দেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। অবস্থা দেখে তো সে হতভম্ব। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

—গোলোন্দাজরা প্রস্তুত হয়ে থাক।

তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মীদের দিকে একবার তাকিয়ে

নিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন আবার, তবে এমন ভাবে কামান দাগবে যাতে ওদের দারুণ ক্ষতি না হয়। আমি জাহাজ সমেত বোম্বেটেদের ধরতে চাই।

ক্রমে "স্যালিসব্যারি" ঘটনাস্থলের খুব কাছে গিয়ে পৌঁছাল। ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। কোন দেশের ব্যবসায়ীর জাহাজ ছিল ঈশ্বর জানেন—এখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তলিয়ে যেতেও আর খুব সময় লাগবে না। হতভাগ্য লোকলস্কররা সকলেই মারা গেছে, না কেউ কেউ এখনও সমুদ্রের জলে হাঁকপাঁক করছে বুঝে ওঠার উপায় নেই।

এখন পরিষ্কার সমস্ত দেখা যাচ্ছে। জলদস্যুরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে নিজেদের বিপদ। ক্যাপ্টেনের আদেশে গম্ভীর নিনাদে গর্জে উঠল কামান। প্রথম গোলাটি গিয়ে পড়ল বোম্বেটে জাহাজের একধারে। প্রত্যুত্তর আসতে বিলম্ব হল না—থরথরিয়ে কেঁপে উঠল "স্যালিসব্যারি"। ম্যাকগ্রে পড়তে পড়তে কোন রকমে টাল সামলে নিল।

যুদ্ধ জমে উঠলেও জলদস্যুরা বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। ক্যাপ্টেনের অপূর্ব পরিচালনা তো ছিলই, তাছাড়া রাজকীয় রণতরীর সঙ্গে ছোট একটি জলযানের পেরে ওঠা সম্ভবও নয়। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে একসময় "স্যালিসব্যারি" পাশ ঘেঁসে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলদস্যুদের জাহাজে। ম্যাকগ্রেও একটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

এবার সম্মুখ সমর।

বাণিজ্যপোতটি তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। আলোয় আলো চারিধার। অস্ত্রের ঝনঝনানির সঙ্গে দুর্ব্বার বেগে রক্ত দেওয়া নেওয়া চলেছে। লেগ্র্যাণ্ড ও আরো কয়েকজন হঠাৎ লক্ষ্য করল, অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ম্যাকগ্রের রুধির লিপ্ত অসি ঝলসে ঝলসে উঠছে।

জলদস্যুরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, তারপর মরিয়া হয়ে লড়েছিল, শেষে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পেরে না উঠে কোণঠাসা অবস্থায় যখন রণে ভঙ্গ দিল তখন তাদের অনেকেই জীবনের পরপারে।

আহতের সংখ্যাও অল্প নয়।

জয়ীপক্ষেরও কয়েকজন মারা পড়েছে। আহতদের "স্যালিস-ব্যারি"তে বয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। এতক্ষণে বুঝতে পারা গেছে জলদস্যুরা স্পেন দেশীয়। তাদের লুঠের মাল তখনও ডেকের উপরই ছড়িয়েছিল। সেগুলিও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। ম্যাকগ্রেও তাড়াতাড়ি "স্যালিসব্যারি"তে ফিরে এল। সে সামান্য আহত হলেও নিজের জন্য চিন্তিত নয়। এখন তাকে অন্যান্য আহতদের চিকিৎসায় ব্যস্ত হতে হবে।

ম্যাকগ্রেকে দেখে তার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন ক্যাপ্টেন। পাশে দণ্ডায়মান সহকর্ম্মীদের বললেন, এমন শৌর্য্যশালী চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পাওয়া সচরাচর সম্ভব হয় না। তারপর তিনি যারা লুটের মাল বয়ে আনছে তাদের কাজ তদারকে মনোযোগী হলেন।

ম্যাকগ্রে রোমাঞ্চিত মনে এগিয়ে চলল কিছু ওষুধপত্র নিয়ে আবার ডেকে ফিরে আসার জন্য। ক্যাপ্টেনের কেবিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় কিন্তু তাকে থামতে হল। থেমে পড়ারই কথা, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ধারা দরজার কাছে এসে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ আহত অবস্থায় কেউ ভেতরে গেছে। কার যাওয়া সম্ভব? ক্যাপ্টেন তো এখন ওখানে। নিশ্চয়ই মোরে।

একটু ইতঃস্তত করে ম্যাকগ্রে ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে গেল। কেউ কোথাও নেই। তবে রক্তের ধারা ছোট ঘরটির দিকে চলে গেছে। পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখল তার সন্দেহ অমূলক নয়। আহত মোরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়।

সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মোরের পাশে। সামান্য

রক্ত তখনও গড়িয়ে চলেছে। ওকে সোজা করে নিয়ে পাঁজাকোলায় তুলল। তারপর বিছানায় শুইয়ে দিল গিয়ে। ক্ষতস্থান ধুয়ে, ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া আশু প্রয়োজন। তবে তারও আগে ক্ষত মারাত্মক কি সাধারণ তা দেখে নেওয়া দরকার।

ম্যাকগ্রে জানেনা কি নিদারুণ বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছে। মোরের গায়ে যে ঝলঝলে কোট ছিল তার বোতাম একে একে খুলে ফেলল সে। তারপর কোটের একপাশ সরাতেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল—একি !!! মোরে কিশোর নয় ; কিশোরের ছদ্মবেশে একজন পূর্ণ যুবতী। একি রহস্য ? ক্যাপ্টেন একটি যুবতীকে কিশোর সাজিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন কেন ?

তবে কি—

লেগ্র্যাণ্ড এই সম্পর্কেই কি ইঙ্গিত দিতে চাইছিল প্রথম দিন। ম্যাকগ্রে এখন কি করবে প্রথমে স্থির করতে পারল না। তারপরই মনে হল, এখান থেকে চুপিচুপি চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিছানার কাছ থেকে সরে আসার আগে চোখ পড়ে গেল যুবতীর অনিন্দ্য মুখখানির উপর। এমন কাউকে আগে দেখেছে কি ? বিস্ময়ের বিষয় মোরেকে এতদিন দেখেও দেখেনি—কিছুই মনে হয়নি তার সম্পর্কে। অথচ এখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পাচ্ছে না।

কিন্তু আর এখানে অপেক্ষা করা যায় না। ক্যাপ্টেন এসে পড়লে কি ভাবে এই পরিস্থিতিকে গ্রহণ করবেন অনুমান করা দুষ্কর। সরে আসার পূর্বমুহূর্তে লক্ষ্য করল, যুবতীর চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলছে। ঈষৎ নীলাভ দুই তারায় বিস্ময় কি বেদনা, কিসের ছোঁয়া বুঝতে পারা গেল না।

ম্যাকগ্রের সরে আসা হল না। নিজের অক্ষত হাত বাড়িয়ে তার মণিবন্ধ চেপে ধরে ব্যাগ্রগলায় যুবতী বলল, আমায় তুমি বাঁচাও বিল।

কি বলবে সে ভেবে পেল না।

—ক্যাপ্টেনের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।

—আমার সমস্ত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তুমি ছেলের ছদ্মবেশে কেন ছিলে আমায় বল ?

—ছিলাম না, থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল।

—কেন ?

—সে অনেক কথা। তোমাকে সমস্ত কথাই বলব। তার আগে বল, এই বন্দীদশা থেকে আমায় উদ্ধার করবে ?

ম্যাকগ্রে চুপ করে রইল।

—চুপ করে থেকো না। বল—বল—

—আমি তোমার জন্যে সমস্ত কিছুই করব। তুমি—

—আমি মেরী।

—সবচেয়ে আগে তোমার ক্ষতের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। একটু অপেক্ষা কর, আমি ওষুধ নিয়ে আসি। কিন্তু কি ভাবে তুমি আহত হলে বুঝতে পারছি না ?

ঠিক এইসময় এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

কিছু বলার পরিবর্তে মেরীর দুচোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। ঘুরে দেখবার আগেই ম্যাকগ্রের কাঁধের উপর প্রচণ্ড এক থাবা এসে পড়ল। তারপরই প্রবল ধাক্কায় সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। মাথায় আঘাত করল সিন্দুকের একাংশ। ঝনঝনিয়ে উঠল সমস্ত শরীর। অন্ধকার নেমে আসতে লাগল চোখের উপর।

কিন্তু অসীম বলে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল ম্যাকগ্রে। সত্রাসে দেখল উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপ্টেন গিলবার্ট। সারা মুখ রক্তবর্ণ। মনে হচ্ছে দুচোখ যেন ধকধক করে জ্বলছে। ক্যাপ্টেনের পিছনে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট মেট জন কলিন্স।

—বেশী আগ্রহ সময় সময় মানুষকে বিপদে ফেলে দেয় তা-কি তোমার একেবারেই জানা ছিল না ?

ম্যাকগ্রে নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে।

—ইনি আহত হয়েছিলেন। তাই—

খেঁকিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, দরদ যে উথলে উঠছে! তুমি যা জানতে পেরেছো তার মূল্য তোমাকে দিতে হবে।

—বাঘের গুহায় ঢুকলে রেহাই পাওয়া যায় না। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন কলিন্স, একে এখন এখানেই বন্ধ করে রাখা হোক ক্যাপ্টেন। রাত্রে হাত-পা বেঁধে সকলের অগোচরে জলে ফেলে দিলেই হবে।

—মন্দ ব্যবস্থা নয়।

মেরী অনেক আগেই বিছানায় উঠে বসেছিল। এবার তীব্র গলায় বলল, নিজেদের পাপ ঢাকবার জন্য আপনারা এত নীচে নামবেন?

—যদি নামিই তাতে তোমার কি?

—ভেবেছেন যা ইচ্ছে তাই করবেন, আর রেহাই পেয়ে যাবেন বার বার?

বিদ্রুপের হাসি হেসে কলিন্স বললেন, অনেক ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে দেখছি। ক্যাপ্টেন, আপনার পাখিকে তো ছোকরা নিজের দাঁড়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে দেখছি।

গম্ভীর গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, তলায় তলায় মেরী যে এত কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে আমি বুঝতেই পারিনি। আশ্চর্য। যাক, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তুমি বিলকে বেঁধে এখন এখানেই রাখ। তোমার কথামত রাত্রে বিলি ব্যবস্থা করলেই হবে।

ম্যাকগ্রে বুঝল তার ভাগ্য এরা নির্দ্ধারিত করে ফেলেছে। এই সঙ্গে এও বুঝতে অসুবিধা হল না, এই মুহূর্তে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করলে ভবিষ্যতে সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে না। কলিন্স তখন কয়েক পা এগিয়ে এসেছেন, তাঁর এক হাতে তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র আর অন্য হাতে লোহার চেন—বিদ্যুত বেগে একপাশে সরে গেল ম্যাকগ্রে, তারপর প্রচণ্ড ধাক্কা মারল কলিন্সকে। এই ধরণের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। সপাটে গিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেনের উপর।

বলা বাহুল্য টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে গেল চক্ষের নিমেষে।

ম্যাকগ্রে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

ওদিকে—

"স্যালিসব্যারি"র আরেক প্রান্তে তখন উপস্থিত সকলে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে। জাহাজের প্রত্যেকে অবশ্য ওখানে নেই। আছে জনা পঞ্চাশ। এরা অনেকদিন থেকে ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ। ইদানিং ক্রোধের সঙ্গে লোভও সকলকে সাপটে ধরেছে। ব্যাপার কিছুই নয়, অর্থই অনর্থ ঘটাতে চলেছে।

জাহাজের ক্রুদ্ধ কর্মচারীরা ক্যাপ্টেনের প্রতিটি কাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে জাহাজ নোঙর করার পরও যখন জলদস্যুদের কাছ থেকে কেড়ে আনা সোনাদানা রাজকীয় ভাণ্ডারে জমা দেবার কোন ব্যবস্থা করা হল না, তখন সকলেই বুঝতে পারল সমস্ত কিছু ক্যাপ্টেন আর কলিন্সের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে ভাগাভাগি হবে।

ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠল।

লোভে জ্বলতে লাগল সকলের চোখ। মাত্র দুজন লোক এত সম্পদের অধিকারী হবে কেন? তাদেরও চাই। কি ভাবে আদায় করা যায় তা এতদিনে স্থির করা যায়নি। শুধুমাত্র একজন যোগ্য নেতার অভাবেই। নেতা অবশ্য অনেকেই হতে চায়। কিন্তু সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন কেউ তাদের মধ্যে নেই।

এতদিন ধৈর্য ধরে কোন রকমে থাকা গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বারের পর আর কারুর ধৈর্য থাকেনি। দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে জলদস্যুদের যে জাহাজ শিকার করা হয়েছে তার সম্পদও যে একই জায়গায় যাবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আর নয়—সকলেই সিদ্ধান্তে এসে গেছে, এবার সমস্ত কেড়েকুড়ে নিতে হবে।

এবং আজ রাত্রেই।

আলাপ আলোচনার সমাপ্তির মুখেই ছুটতে ছুটতে ম্যাকগ্রে সেখানে এসে উপস্থিত হল। ভীষণ ভাবে হাঁপাচ্ছে সে। তার ভাবভঙ্গী দেখেই সকলে বুঝতে পারল, বিশেষ কিছু ঘটেছে। লেগ্র্যাণ্ড এগিয়ে গেল।

—কি হয়েছে ?

—ক্যাপ্টেন আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

—সেকি !

—আমি আহত মোরেকে শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলাম, এই আমার অপরাধ। কোন রকমে দুজনকে ঘায়েল করে চলে এসেছি।

—দুজনকে—

একজন বলে উঠল, আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, ক্যাপ্টেনের দোসর কলিন্সও সেখানে ছিল !

জোহান্স বলল, আর বরদাস্ত করা যায় না ওদের। দুজনে হয়তো এখুনি এখানে এসে পড়তে পারে। তারপর—

—সে সম্ভাবনাই বেশী। ওঁরা আমাকে নিশ্চিত ভাবে শাস্তি দিতে চাইবেন। এই যে সঙ্কট এগিয়ে আসছে, আমার মনে হয় তা কারুর পক্ষেই শুভ হবে না। ক্যাপ্টেনের বুঝতে বিলম্ব হবে না, আপনারা লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নিতে চাইছেন। এখন হয়তো তিনি বেকায়দায় পড়ে নীরব থাকবেন। কিন্তু তারপর—

ইতিপূর্ব্বেই ম্যাকগ্রে লেগ্র্যাণ্ডের মুখে তাদের মনের কথা জেনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে যে নতুন পরিকল্পনা এসে গিয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য এখন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতই যদি লুণ্ঠিত সম্পদ গ্রহণ করতে হয়. তবে সেই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ম্যাকগ্রের কথা শুনে বিস্মিত লেগ্র্যাণ্ড বলল, তারপর তিনি কি করতে পারেন আমাদের বিরুদ্ধে ? সম্পদের কিছু অংশ তো তাঁরও প্রাপ্য হবে।

—বাস্তব দিকটা আপনারা সকলেই উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। এখন চুপচাপ থাকলেও দেশের কোন বন্দরে জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন দানব হয়ে উঠবেন। আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হবে। আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস হয়ে যাবে। এমন কি মৃত্যুদণ্ডও পেতে পারি।

এবার পরিস্থিতির গুরুত্ব সকলের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হল না। এই দিকটি আগে মোটেই ভেবে দেখা হয়নি। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। এই সমস্যার সমাধান চাই। এবং এখুনি।

বারবার বলল, আপনি এই সমস্যার কোন সমাধান ভেবেছেন কি ?

—ভেবেছি। জানি না আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা।

—আমাদের লাভের ব্যাপারটা বজায় থাকলে যে কোন সমাধানে সকলে রাজী হয়ে যাবে বলে মনে করি।

ম্যাকগ্রে একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি যা বলতে চলেছি তা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ! তবে সবদিক রক্ষা করতে গেলে এছাড়া আর উপায় নেই। আমি এই জাহাজটা অধিকার করে নিতে বলছি।

সকলে সচকিত হল।

জোহান্স বলল, আপনি বলতে চাইছেন···

—অধিকাংশের সমর্থন যখন পাওয়া যাচ্ছে কাজটা তখন কঠিন হবে না। তারপর অবশ্য পরিচিত ডাঙ্গায় ওঠা শক্ত হয়ে পড়বে। ভেসে বেড়াতে হবে নীল দরিয়ায়। এক কথায় আমাদের জলদস্যু হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

দুঃসাহসিকতা যাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই প্রস্তাব তাদের মনে ধরল। দুর্ব্বারলোভ এই সঙ্গে ইন্ধন জুগিয়েছে। আজকের দিনে কার অজানা জলদস্যুতা করে প্রচুর অর্থশালী হওয়া যায় ? তারপর নারী আর সুরা—বৈভবের মধ্যে দিয়ে বাকী জীবন চমৎকার ভাবে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

অল্প কিছু আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

সকলের মনে তখন প্রবল উত্তেজনা।

শেষে বারবার বলল, এই কাজের জন্য এবার অধিনায়ক নির্ব্বাচন করতে হবে। নেতার অভাবেই এতদিন আমরা অনেক কাজ করতে পারিনি। অতীতের বিবাদ ভুলে এখন এ ব্যাপারে সর্ব্বসম্মত ভাবে একজনকে বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

জোহান্স বলল, আমি বারবারের সঙ্গে একমত। আমার প্রস্তাব হল, বিল ম্যাকগ্রেকেই অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হোক! তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছে এমন চমৎকার পরিকল্পনা, তাছাড়া অন্যান্য দিক বিচার করলেও তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে আর কোন দ্বিমত থাকে না।

ম্যাকগ্রে অভিভূত হয়ে গেল। এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল জোহান্সের প্রস্তাব সকলে মেনে নিল।

এতে কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রকৃত ব্যাপার হল, অনেকেই এই বিদ্রোহী দলটির অধিনায়ক হতে চায়। অনেকেই চায় বলে—সকলকেই বাধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। কঠিন হয়ে পড়বে নির্ব্বাচিত হওয়া। সেক্ষেত্রে ম্যাকগ্রের মত নবাগতর হওয়া ভাল। কাজ উদ্ধার করার আগে গোলমাল দেখা দেবে না। এই সঙ্গে অধিনায়ক পদলোভীরা ভাবছে, এই নবাগত ভাল-মানুষটিকে পরে সরিয়ে দিয়ে তার পদ অধিকার করা এমন কিছু কঠিন হবে না।

"স্যালিসব্যারি"র একপ্রান্তে যখন এই রকম গম্ভীর ব্যাপার চলেছে, ক্যাপ্টেনের কেবিনের ভিতরের দৃশ্য তখন অন্যরকম। কলিন্স বুকে হাত বেঁধে গম্ভীর মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। দ্রুত পদচারণা করছেন ক্যাপ্টেন গিলবার্ট। কপালে তাঁর অসংখ্য কুঞ্চন। রাগে সমস্ত মুখ থমথম করছে। তাঁরা দুজন যে শুধু রয়েছেন তা নয়, একজন জাহাজের কর্ম্মচারীও একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একসময় পায়চারী থামিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, তুমি ঠিক দেখেছো, কয়েকদিন ধরে তারা গোপনে কি সমস্ত আলোচনা চালাচ্ছে?

লোকটি বলল, হ্যাঁ স্যার।

—সংখ্যায় ক'জন ?

—গুণে দেখিনি। তবে অনেকজন।

—আমাদের নতুন ডাক্তার—

—তিনিও ওদের সঙ্গে আছেন স্যার। আমি এই মাত্র দেখে আসছি।

—হুঁ। ব্যাপার কি বলতো কলিন্স ?

—ব্যাপার সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না ক্যাপ্টেন। নাটকীয় ভাবে ছোকরা এখান থেকে পালিয়ে যাবার পর আমাদের চুপ করে থাকা ঠিক হয়নি। লোকজন লাগিয়ে তাকে আটক করা উচিত ছিল। এতক্ষণে সে আমাদের বিরুদ্ধে কতকি বলে বসে আছে ঈশ্বর জানেন।

—চালে একটু ভুল হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। তবে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। চল দেখা যাক, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কি রকম ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

লোকটিকে বিদায় করে দিয়ে কেবিনের দরজায় তালালাগান হল। মেরীকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া যায় না। ক্যাপ্টেন গিলবার্ট কলিন্সকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেন। ওদিকে, ষড়যন্ত্রকারীরা তখন কাজ বেশ গুছিয়ে এনেছে। ওঁরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন, তখন ম্যাকগ্রে, লেগ্র্যাণ্ড ও জোহান্স ছাড়া আর মাত্র জনাচারেক সেখানে উপস্থিত রয়েছে।

গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন, কি করছো তোমরা এখানে ?

নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিল জোহান্স, কিছুই না।

—এই ডাক্তার অত্যন্ত বিপদজনক লোক। আমার কেবিনে ঢুকে সে অনেক আপত্তিকর কাজ করে এসেছে। ওকে এখুনি আটক করা দরকার। কলিন্স, তুমি স্বচ্ছন্দে এদের সাহায্যে ওকে বন্দী করতে পার।

কলিন্স এগিয়ে এলেন।

মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে ম্যাকগ্রে বলল, সময় পাল্টে গেছে ক্যাপ্টেন। এতদিন ধরে অনেক আদেশ করেছেন—এবার অন্যের আদেশ আপনাকে শুনতে হবে। আপনাকে আর আপনার এই সাকরেদ কলিন্স, দুজনকে আমরাই বন্দী করব।

চিৎকার করে উঠলেন গিলবার্ট, বেয়াদপ, কি বলছো তুমি—

—বুঝতে পাচ্ছেন না!

অত্যন্ত শোচনীয় পথ বেয়ে তাঁদের ভাগ্য যে এগিয়ে চলেছে এবার ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হল। লেগ্র্যাণ্ড আর জোহান্স দুজনের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাকীরা ঘিরে ধরেছে তাঁদের। শুধু কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ম্যাকগ্রে অদ্ভুত হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলেছে।

প্রভুত্ব করতে অভ্যস্ত ক্যাপ্টেন গিলবার্ট নিজের কর্ম্মবহুল জীবনে অনেক কিছু দেখার বা অনেক বেতালা পরিস্থিতির মহড়া নেবার সুযোগ পেয়েছেন—তবে এমন সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কখনও কল্পনাও করেন নি। তিনি অবশ্য দ্রুত চিন্তা করছিলেন, কতটা শক্তি এরা সংহত করতে পেরেছে। জাহাজের অধিকাংশ লোকই কি বিদ্রোহী?

কলিন্স বললেন, এই স্পর্দ্ধিত কাণ্ডের জন্য পরে কিন্তু অনুতাপ করতে হবে।

—তা মনে হয় না। ইতিমধ্যেই আমার লোকেরা জাহাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অধিকার করে নিয়েছে। বন্দীও হয়েছে অনেকে।

ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বললেন, তুমিই তাহলে এদের সর্দ্দার। চমৎকার! না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। আমি তোমার অন্নের সংস্থান করে দারুণ ভুল করেছি দেখছি! নিমকহারাম—বেঈমান—

—আমার উপকার করেছেন অস্বীকার করি না। কিন্তু বেঈমানিতে আপনি কি আমাকে টেক্কা দেননি। লুণ্ঠিত সম্পদ

সরকারী তহবিলে জমা না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন কেন জানতে পারি কি ? দেশের রাজার সঙ্গে বেঈমানি করার একি দুরন্ত চেষ্টা নয় ? আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জোহান্স, এঁদের নিরস্ত্র করে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রাখ গিয়ে।

ম্যাকগ্রের প্রকৃত স্বভাব যেন এতদিন ছাইচাপা ছিল। একটু উস্কানিতেই গমগনে আকার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ক্যাপ্টেন আর কলিন্সকে নিরস্ত্র করে বেঁধে ফেলা হল। তাঁরা হাস্যকর ভাবে কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্রোহীদের কয়েকজন সেখানে এসে উপস্থিত হল। জাহাজের বাকী কর্ম্মচারীদের বন্দী করে নিয়ে এসেছে তারা। বিদ্রোহীদের কিছু অংশ অবশ্য ইতিমধ্যে জাহাজের বিভিন্ন কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছে।

ম্যাকগ্রে ধীর পায়ে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা নিশ্চয় চাইবেন, যারা কোন কাজে লাগবে না তাদের এই জাহাজ থেকে সরিয়ে দিতে ?

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, নিশ্চয়—নিশ্চয়—

—আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত।

লেগ্র্যাণ্ড বলল, আমার প্রস্তাব হল, ক্যাপ্টেন এবং তাঁর সঙ্গীদের জলে ফেলে দেওয়া হোক। হাঙ্গররা খেয়ে বাঁচুক।

ম্যাকগ্রে বলল, এতটা নীচে না নামাই ভাল। আমি অন্য কিছু ভেবেছি। একটা নৌকায় এদের ভাসিয়ে দেওয়া হোক। যদি আয়ুর জোর থাকে কোনদিন ডাঙ্গায় গিয়ে উঠতে পারবে।

এই মতই গৃহীত হল।

ক্যাপ্টেন নিষ্ফল আস্ফালন করতে থাকলেন। চিৎকার করে অভিশাপ দিতে থাকলেন কলিন্সের সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তেইশ হাত লম্বা একটি নৌকায় ক্যাপ্টেন গিলবার্ট ও

আরো বাইশ জনকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হল। অবশ্য কিছু খাদ্যদ্রব্যও দিয়ে দেওয়া হল সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হতভাগ্যদের নিয়ে উত্তাল ঢেউ-এর ধাক্কায় নাচতে নাচতে নৌকাটি মিলিয়ে গেল।

ম্যাকগ্রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, প্রাথমিক কাজ ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। এবার জাহাজের মুখ অ্যাটলান্টিকের দিকে ঘোরান হোক। রাজার পতাকাও নামিয়ে ফেলা দরকার। এই সঙ্গে "স্যালিসব্যারি"র নামও আমি পাল্টে ফেলতে চাই।

জোহান্স বলল, কি নাম রাখতে চান ?

—তোমরা বল ?

আলাপ আলোচনার পর স্থির হল, "স্যালিসব্যারি"র নতুন নাম হবে "কঙ্কুয়েষ্ট"।

ম্যাকগ্রের মন পড়েছিল মেরীর দিকে। ক্ষত নিরাময়ের কোন ব্যবস্থাই করা যায়নি। এখনও নিশ্চয় সে যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। ওষুধ পত্র নিয়ে সে প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে অগ্রসর হল। বর্তমানে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ছিল না। গত শেষ রাত্রে যে স্পানিয়াড জাহাজ শিকার করা হয়েছিল তা আর জলে ভাসছে না। জীবিত এবং মৃত লোক সমেত সেটিকে ক্যাপ্টেন গিলবার্ট ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং ঝামেলা আগেই মিটে গেছে।

তালা ভেঙ্গে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকলো ম্যাকগ্রে। মেরী একই ভাবে পড়ে আছে বিছানায়। পাশে গিয়ে বসল সে। দুজনে দুজনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর একটু ঝুকে সবলে জড়িয়ে ধরল অপূর্ব নারীটিকে ম্যাকগ্রে। এতক্ষণে মেরীর চোখে অশ্রুর বন্যা নামল। কিছু একটা ঘটেছে সে অনুমান করতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছে অনুমান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে এই মানুষটির সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ফেলতে পারলে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবার সম্ভাবনা।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল মেরী।

কি ভাবে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না ম্যাকগ্রে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দুজনে ভাবাবেগ কাটিয়ে উঠতে পারল। এবার ম্যাকগ্রে ভাল ভাবে পরীক্ষা করল মেরীর ক্ষতস্থান। গুরুতর কিছু নয়, ছেঁচড়ে গেছে মাত্র। জানা গেল, জলদস্যুদের সঙ্গে কি ভাবে যুদ্ধ হচ্ছে দেখবার জন্য মেরী ডেকে গিয়েছিল। সেই সময় গোলার একটি টুকরো হাতে এসে লাগে। ক্ষতস্থান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উঠে দাঁড়াল ম্যাকগ্রে।

বলল, তুমি যে এত দ্রুত আমার কাছে এসে পড়বে ভাবতে পারিনি।

চোখের কোলে জল কিন্তু মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে মেরী বলল, তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল। বলতে গেলে তখনই আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম আমি ছেলে নই মেয়ে। ক্যাপ্টেনের প্রকৃত স্বরূপের আঁচ দেবার জন্য সিন্দুকের ডালা খুলে তোমাকে লুণ্ঠিত মাল দেখিয়েছিলাম।

—কিন্তু তোমাকে ছেলে সাজিয়ে রেখে ক্যাপ্টেনের কি লাভ ?

—বুঝতে পাচ্ছ না ?

—কই, না—

—আশ্চর্য ! এই সাধারণ কথাটা তুমি বুঝতে পাচ্ছ না !

—না···মানে···

মেরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি—আমি তাঁর রক্ষিতা ছিলাম। বিশ্বাস কর, একাজ আমি স্বেচ্ছায় করতে আসিনি। আমার অভাবী বাবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিয়ে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে জাহাজে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

—কিন্তু তুমি ছেলের পোষাক পরেছিলে কেন ?

—এই জাহাজে মেয়েদের থাকা নাকি নিয়ম নেই। ক্যাপ্টেন

তাই আমাকে ছেলেদের পোষাক পরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। প্রচার করেছিলেন, আমি তাঁর ফাই-ফরমাস খাটার ছোকরা।

ম্যাকগ্রে আর কোন প্রশ্ন করতে পারল না।

তার মনের মধ্যে নানা কথা ওঠানামা করতে লাগল। ক্যাপ্টেনকে দেখে কিন্তু মনে হয়নি নিজের দেহের খোরাক তিনি এত ঘৃণ্য পদ্ধতিতে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সঙ্গে মেরীর বিচিত্র ভাগ্যের কথা ভাবলে মনে করুণার উদ্রেক হয়। নিজের সখ আহ্লাদ সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে দিনের পর দিন ধরে একটি ক্লেদাক্ত মানুষের ইসারায় উঠেছে বসেছে।

তুজনেই চুপচাপ রইল অনেকক্ষণ।

শেষে মেরীই নীরবতা ভঙ্গ করল—

—কি ভাবছো?

—ভাবছি তোমার কথা।

—ভাবছো আর ঘৃণায় সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠছে বোধহয়? এখন মনে হচ্ছে আমার ভুল হয়েছিল।

—কিসের ভুল?

—তোমায় ভালবাসি একথা প্রকাশ করা উচিত হয়নি। তোমার নিষ্কলঙ্ক জীবনকে নষ্ট করে দেবার স্পর্দ্ধা আমার কেন হবে?

—এতো স্পর্দ্ধার কথা নয় মেরী।

—হ্যাঁ। স্পর্দ্ধারই কথা। একটা অনুরোধ করব, রাখবে? এই আমার শেষ অনুরোধ।

—বল?

—কোন লোকালয়ে আমায় নামিয়ে দাও।

—সেকি! কেন?

—লোকালয়েই বারবনিতা পল্লী থাকে। বাকী জীবন তো আমায় ওই পেশাতেই যুক্ত থাকতে হবে।

ম্যাকগ্রে নরম গলায় বলল, তা হয়না মেরী। বাকী জীবন আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার সম্ভাবনা নেই। তুমি নিজেকে যত ছোট

করেই ভাবনা কেন—আমি কিন্তু স্থির করে ফেলেছি, তোমাকে পত্নীর মর্যাদা দেব।

মহা বিস্ময়ে মেরী বলল, পত্নীর মর্যাদা—

—হ্যাঁ। প্রথম সুযোগেই বিয়ে হবে আমাদের।

—আমি ভাবতেও পাচ্ছি না। তুমি—

মেরীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ম্যাকগ্রে বলল, এই রকমই হয়। অনেক অভাবনীয় ব্যাপার হঠাৎ বাস্তব হয়ে ওঠে জীবনে। বিশ্বাস কর, তুমি আমার পাশে থাকলে আমি অনেক প্রাণবন্ত, অনেক সাহসী হয়ে উঠতে পারব।

এরপরই মেরী যাতে নিজের কিন্তু কিন্তু ভাব কাটিয়ে উঠতে পারে, তাই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল ম্যাকগ্রে, এতক্ষণ হয়ে গেল অথচ ক্যাপ্টেন কেবিনে এলেন না, কেন বলতো ?

মেরী মৃদু হেসে বলল, আসবেন না জানি। তাইতো এত সহজ হতে পেরেছি।

—জান তুমি !

—আমি যে জানলা দিয়ে দেখলাম, ক্যাপ্টেন ও আরো কয়েকজনকে তোমরা একটা নৌকায় নামিয়ে ভাসিয়ে দিলে। ওরা কি বাঁচবে ?

—হয়তো বাঁচবে। আর যদি ডুবে মরে তাতে কি যায় আসে বল ?

তারপর আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ম্যাকগ্রে বলল, "স্যালিসব্যারি"র নূতন নামকরণ হয়েছে "কঙ্কুয়েষ্ট"। তুমি শুনলে খুসী হবে মেরী, এই জাহাজের অধিনায়ক এখন আর কেউ নয়, আমি— ।

ঠিক এই সময় দরজায় করাঘাত হল বেশ জোরে জোরে। যেন বেশ কয়েকজন অধীর ভাবে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলেছে। ম্যাকগ্রে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল, সকলে ভীড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলের আগে কিছুটা গম্ভীর মুখে লেগ্র্যাণ্ড। হঠাৎ এই সদল আগমনের উদ্দেশ্য কি ম্যাকগ্রের বুঝতে অসুবিধা হল না।

—তোমরা এসে পড়েছো দেখছি। আমি সম্পূর্ণ তৈরী। ভাগাভাগির কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

জোহান্স বলল, এই কেবিনে সকলের স্থান সঙ্কুলান হবে না। ডেকে গিয়ে বরং—

—বেশ তো। তাতে আর অসুবিধা কি? এই ঘরের সিন্দুকটা ধরাধরি করে ডেকে নিয়ে গেলেই হল।

সেইমতই কাজ হল। জলদস্যুদের জাহাজ লুণ্ঠন করা সম্পদ তখনও ডেকেই পড়েছিল। ম্যাকগ্রে, লেগ্র্যাণ্ড, জোহান্স ও আরো কয়েকজনের সহযোগীতায় সমস্ত কিছুই লিষ্ট তৈরী করল। বাকীরা ওখানেই কয়েক সারিতে বসে সমস্ত কিছু দেখছিল। তাদের দুচোখে লোভের আগুন জ্বলছে। শেষে সমস্ত কিছু সমান ভাগে ভাগ করে সকলকে দিয়ে দেওয়া হল। এই কাজ শেষ করতে সময়ও লাগল প্রচুর। ম্যাকগ্রে কিছুটা ক্লান্ত বোধ করছিল। সে নিজের ভাগের সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে এগুবার মুখেই কিন্তু বাধা পেল।

—আমার একটা কথা বলার ছিল—

ফিরে দাঁড়াল ম্যাকগ্রে।

লেগ্র্যাণ্ডের মুখে অস্থিরতার ছায়া।

—কি কথা—?

—মোরে সম্পর্কে আপনি তো কিছু বললেন না?

—মোরে !!!

—ক্যাপ্টেন গিলবার্ট ছোকরা চাকর সাজিয়ে তাকে এখানে এনেছিলেন। আমরা কেউ কেউ জানি সে যুবতী—তার নাম মেরী। এতজন পুরুষের সঙ্গে একজন যুবতীর থাকা কি সঙ্গত?

ম্যাকগ্রের কান গরম হয়ে উঠল। সে দ্রুত নিজের ইতঃস্তত ভাব দমন করে লক্ষ্য করল, সকলের দৃষ্টি তারই উপর নিবদ্ধ। এরকম প্রশ্নে মুখোমুখি যে দাঁড়াতে হবে একথা তার অজানা ছিল না। উত্তর প্রস্তুত করেই রাখতে হয়েছিল।

—বলতে গেলে আমার মনের কথাই প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি সকলের সঙ্গে আলোচনা করব স্থির করেই রেখে-ছিলাম। একটি যুবতীর রক্ষক একজন পুরুষই হওয়া সঙ্গত। একথা সকলেই স্বীকার করবে। আজ থেকে মেরী আমার কাছে থাকবে।

উদ্ধত ভঙ্গীতে লেগ্র্যাণ্ড বলল, তার রক্ষক অন্য কোন পুরুষ হবে না কেন সে কথা আমি জানতে চাই?

—কারণ মেরীর আমাকেই পছন্দ। দ্বিতীয়তঃ, দলপতি হিসাবে সংগৃহীত সম্পদের অন্ততঃ একচতুর্থাংশ আমার প্রাপ্য। বন্ধুগণ, তোমরা দেখেছো এক কপর্দ্দকও আমি বেশী নিইনি। তোমরা যা পেয়েছো, আমিও তাই নিয়েছি। এই স্বার্থ-ত্যাগের বিনিময়ে আমি কি মেরীকে পেতে পারি না?

কয়েকজন একই সঙ্গে বলে উঠল, ন্যায়সঙ্গত দাবী।

জোহান্স বলল, এরপর আর কথা চলে না। আজ থেকে মেয়েটি আমাদের দলপতিরই রক্ষিতা হয়ে থাকবে।

—ধন্যবাদ জোহান্স। ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে। তবে রক্ষিতা নয়, আমি তাকে বিয়ে করব স্থির করেছি।

সকলে হৈ-হৈ করে উঠল।

মৃদু হেসে ম্যাকগ্রে আবার বলল, আরো একটা কথা আমি জানিয়ে রাখি, আজকের মত ভবিষ্যতেও সকলে যা নেবে আমার প্রাপ্যও তাই হবে। প্রতিটি ব্যাপারে সকলে সমান অধিকার ভোগ করুক এই আমি চাই।

আবার সকলে হৈ হৈ করে উঠল।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেছে।

এই তিন বছরে জলদস্যু মহলে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন

করেছে ম্যাকগ্রে। চষে বেড়িয়েছে অ্যাটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। কত জাহাজ যে শিকার করেছে তার হিসাব কেউ রাখেনি। বলাবাহুল্য তার লক্ষ্য স্পেন আর পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য তরীগুলি। সেই সময় তার বিক্রম আর নিষ্ঠুরতা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তার এই কার্য্যবলীতে অভিভূত হয়ে সহকর্ম্মীরা তাকে এখন "টাইগার ম্যাক" নামে অভিহিত করে থাকে।

ওদিকে ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারে স্পেন ও পর্ত্তুগালের পক্ষ থেকে ঘনঘন অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ইংরাজ ম্যাকগ্রে আর তার দলবলকে ধরার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ইংল্যাণ্ডের একটি যুদ্ধজাহাজ কিছুদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অপরাধীদের। কিন্তু "কঙ্কুয়েষ্ট"কে ধরা যে সহজ হবে না তা উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

দলের মধ্যে যারা দায়ে পড়ে ম্যাকগ্রেকে নেতার পদ দিয়েছিল এবং পরে তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ওই পদটি গ্রহণ করবে এই রকম স্থির করে রেখেছিল, তারাও সে সমস্ত কথা ভুলে গেছে। ভুলে যাবার কারণ হল, তার দলপরিচালনার দক্ষতা, কর্ম্মতৎপরতা ও নিষ্ঠুরতা—এই তিনটি গুণ সকলের মনে অসম্ভব সম্ভ্রম জাগিয়েছে।

শুধু লেগ্র্যাণ্ড—

বেচারা অবিরাম ঈর্ষায় পুড়ে চলেছে ম্যাকগ্রে তা জানে। ঈর্ষা দলের প্রধান পদটির জন্য নয়, ঈর্ষা মেরীকে কেন্দ্র করেই। নবাগত একজন সব দিক দিয়ে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে, এ যেন পরিপাক করা সম্ভব নয়। যদিও বারবার ও জোহান্স এখন একরকম ম্যাকগ্রের দেহরক্ষীরই কাজ করছে, তবু মনে হয় ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে লেগ্র্যাণ্ড তার ক্ষতি করতে পারে। অবশ্য লেগ্র্যাণ্ডকে দল থেকে বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে কাজ করেনি ম্যাকগ্রে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বারমুদা ইংল্যাণ্ডের রাজার অধিকারভুক্ত। এখানে যিনি গভর্ণর আছেন, তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হল,

উপকূলেব ধারে কাছে জলদস্যুদের সন্ধান পেলেই তাদের দমন করা। অবশ্য মাননীয় গভর্ণর সে কাজে তেমন তৎপর নন। বুদ্ধিমান বলেই চোখ বন্ধ করে থাকেন। কারণ জলদস্যুরা তাঁকে দামী দামী উপহার দিয়ে থাকে।

এক হীমশীতল ভোরে বারমুদার প্রধান বন্দরের অল্প কিছুদূরে "কঙ্কুয়েষ্ট" নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ম্যাকগ্রে। প্রথমেই একট্রাঙ্ক লিনেন আর কিছু জড়োয়া গয়না অনুচর মারফত গভর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, মেরীকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী গীর্জ্জায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেই গীর্জ্জার পাদ্রির এত সাহস ছিল না যে তিনি বলেন, ওদের বিয়ে দিতে পারবেন না।

………………রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে আগত জাহাজটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ম্যাকগ্রে। অনেক কাছে এসে পড়েছে। পতাকা চিনতে আর কোন কষ্ট হয় না—বিরাট পর্তুগাল দেশীয় পোত। ইতিমধ্যে "কঙ্কুয়েষ্টে" ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন কোন বাণিজ্যপোত দক্ষিণ আমেরিকার দিকে চলেছে।

প্রাথমিক হুড়োহুড়ি কমে যাবার পর, শিকার ধরার আগে যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতানুসারে মেরী জানে এই সময় স্বামীর কাছে থাকতে নেই। সে কেবিনে চলে গেছে। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শুধু এসে দাঁড়িয়েছে রেলিং-এর ধারে।

জোহান্স বলল, মাসখানেক হাতগুটিয়ে বসে থেকে আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। শিকার ভালই জুটেছে বলতে হবে।

লেগ্র্যাণ্ড বলল, জাহাজখানা বড়। মাল পত্র ভালই আছে মনে হয়।

—খুব বেশী আশা করা ঠিক হবে না। ম্যাকগ্রে বলল, আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পথেই স্পেন বা পর্তুগালের জাহাজে মাল বোঝাই থাকে। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

ওদিকে—

আঙ্গোলা থেকে আগত দাস বোঝাই জাহাজের ক্যাপ্টেন রিকার্ডো চোখের সামনে থেকে দুরবিন নামিয়ে বললেন, প্রথমে তো আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জলদস্যুদের উতপাত আজকাল সর্ব্বত্র। ইংরাজদের জাহাজটা বোধহয় আমাদেরই মত ব্রাজিলের দিকে চলেছে।

রেবোলা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

—ইংল্যাণ্ড তো এখন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, তাই না ক্যাপ্টেন?

—হ্যাঁ। তাছাড়া একটা চুক্তিও হয়েছে। সমুদ্রে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগীতা করে চলবো। ভাল কথা, কুত্তার বাচ্চা-গুলো সব বেঁচে আছে তো?

—জন পাঁচেকের অবস্থা ভাল নয়। আজকালের মধ্যেই মারা যাবে মনে হয়।

মহা বিরক্ত হয়ে রিকাডো বললেন, চুটিয়ে যে লাভ করবো তারও উপায় নেই। মরে মরে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে।

রেবোলা বলল, ওদের দোষ দেওয়া যায় না ক্যাপ্টেন। যে রকম গাদাগাদি ভাবে আছে—তার উপর আবার পেট ভরে খেতে পায় না—

—এর চেয়ে ভাল ভাবে আর নিয়ে যাওয়া যায় না। দেখছো তো জাহাজে জায়গার কত অভাব।

এই সময় একজন ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল।

তাকে বিলক্ষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

—কি খবর পেড্রো?

—ওই জাহাজটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের চোখে ধূলো দেবার জন্যই ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়িয়েছে।

—তোমার এই সন্দেহের কারণ?

—আমি মাস্তুলের উপর ছিলাম। ওরা যে পতাকা বদলেছে তা আমি লক্ষ্য করেছি।

ক্যাপ্টেন রিকার্ডো আবার দ্রুত চোখের উপর দুরবিন তুলে

নিলেন। যদিও খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল, দুই জাহাজের মধ্যকার দূরত্ব এক হাজার গজের বেশী আর হবে না। তবু, সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দুরবিন ব্যবহার করা ছাড়া আর উপায় নেই।

দ্বিতীয় জাহাজটি অনেক কাছে এসে পড়ায় দুরবিনের মাধ্যমে রিকার্ডো পরিষ্কার ভাবেই সমস্ত কিছু দেখতে পেলেন। দেখলেন, কম করেও কুড়িটি কামান তাঁদের দিকে তাক করে রয়েছে। ডেকের রেলিং ঘেঁসে নির্ব্বিকার মুখে যে চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অবশ্য ইংরাজ বলে মনে হচ্ছে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল রিকার্ডোর। ওই জাহাজটি যে জলদস্যুদের তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। সম্মুখ যুদ্ধে নেমে নিজেদের রক্ষা করার চিন্তা বাতুলতা মাত্র। তাঁর কাছে মাত্র চারটি কামান আছে। তাও বিশেষ শক্তিশালী নয়। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান।

দুরবিন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রিকার্ডো কাঁপা গলায় আদেশ দিলেন, জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে। আসন্ন বিপদের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি আর ব্যস্ততার ঝড় বইতে আরম্ভ করল।

জাহাজের মুখও ঘুরিয়ে নেওয়া হল দ্রুত। কিন্তু বিপদকে পিছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার মত সময় তখন আর ছিল না। পাক খেয়ে সরে যাবার আগেই গুরু গম্ভীর শব্দে কামানের গোলা এসে পড়ল।

রেবোলা ছিটকে পড়ল। একটা রড কোন রকমে ধরে ফেলে ক্যাপ্টেন রিকার্ডো নিজেকে সামলে নিলেন। দ্বিতীয় গোলা এসে পড়ার পর হেলে পড়ল জাহাজ। একধার ফেটে গিয়ে খোলে জল ঢুকতে আরম্ভ করল। ওখানেই আছে ঠেসাঠেসি অবস্থায় হতভাগ্যরা। জল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

যারা নীচের দিকে ছিল, সরে আসতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পিছলে পড়তে লাগল। প্রথম ঝোঁকেই নাকে মুখে জল ঢুকে মারা পড়ল

কয়েকজন। অনর্গল জল ঢুকে চলেছে, বাকীদের অবস্থা যে একই রকম হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। লোয়াঙ্গা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ছিল। সে তখন নিজের কথা ভাবছে না, ভাবছে কিভাবে লিয়াকে রক্ষা করা যায়।

উপরের দৃশ্য তখন অন্যরকম। ডেকের এখানে ওখানে মৃতদেহের স্তূপ। ক্যাপ্টেন রিকার্ডোর একখানা পা উড়ে গেছে। ক্ষতস্থান থেকে স্রোতের মত রক্ত বয়ে চলেছে। তিনি আর বেশীক্ষণ বাঁচবেন বলে মনে হয় না। একনাগাড়ে গোলা বর্ষণের পর এই মাত্র কামানের গর্জন থেমেছে। বারুদের গন্ধ যে শুধু চতুর্দিক ছেয়ে রয়েছে তাই নয়, ধোঁয়া প্রায় কুয়াশার আকার নিয়েছে।

প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা একেবারেই নেই অনুভব করে, "কঙ্কুয়েষ্ট" পর্তুগীজ জাহাজটির গায়ে গা লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। প্রথমে ম্যাকগ্রে লাফিয়ে এদিকে এল, তারপর তার দলের আরো বহুজন। মৃতদেহ মাড়িয়ে মাড়িয়ে প্রায় এগিয়ে যেতে যেতে থামল সকলে। চাপচাপ রক্তের মধ্যে ক্যাপ্টেন রিকার্ডোর নিথর দেহ পড়ে আছে।

লেগ্র্যাণ্ড অবজ্ঞাভরে নিজের ডান পা ক্যাপ্টেনের মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, সাজ পোষাক দেখে মনে হচ্ছে, এই লোকটাই জাহাজের প্রধান কর্মচারী ছিল। মরে গেছে—।

—মৃতের প্রতি অসম্মান দেখান ঠিক নয় লেগ্র্যাণ্ড।

তারপর আর সকলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ম্যাকগ্রে বলল, আমাদের হাতে সময় বেশী নেই। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ডুবে যাবে। তোমরা লেগে যাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার দামী জিনিষ পত্র "কঙ্কুয়েষ্টে" নিয়ে যাবার জন্য।

একজন বলে উঠল, পর্তুগীজরা সকলে তো মারা যায়নি। এখানে ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরও কি শেষ করে দেব?

—দরকার নেই। জাহাজের সঙ্গে ওরাও সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

॥ ঘ ॥

ভোর হয়ে আসছে।

রাত্রে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি ম্যাকগ্রে। কোন দুর্ভাবনার জন্যই যে এরকম ঘটেছে তা নয়— বিরক্তি আর হতাশা তাকে সারা রাত জাগিয়ে রেখেছে। নিষ্ঠুর হিসাবে তার নাম চিহ্নিত হয়ে থাকলেও অনর্থক রক্তপাত ঘটাতে সে কখনই চায় না। অথচ গত সন্ধ্যায় অজ্ঞতার দরুণই বলতে গেলে ওই রকম ঘটনাই ঘটেছে।

পর্তুগীজ জাহাজটি আক্রমণ করার সময় অনেক প্রত্যাশা ছিল। মনে হয়েছিল প্রচুর ধনরত্ন পাওয়া যাবে। অথচ সংখ্যাতীত মানুষ হত্যা করে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া গেছে মাত্র দুহাজার সোনার ডুকেট ( মুদ্রা ) আর শ পাঁচেক অসহায় কালো মানুষ। যাদের পর্তুগীজরা বিক্রী করতে নিয়ে যাচ্ছিল। সংখ্যায় অবশ্য ওরা ছিল আরো অনেক বেশী। খোলে জল ঢোকার দরুণ মারা পড়েছে বেশ কিছু সংখ্যক। যারা বেঁচে ছিল জোহান্সের জেদে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে "কঙ্কুয়েষ্টে"।

মেরী কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারেনি ম্যাকগ্রে। সে বিষণ্ণ মুখে চেয়ারে আড় হয়ে বসে ভাবছিল। চুলের উপর মৃদু স্পর্শ অনুভব করে ঘাড় ফেরাতেই স্ত্রীর সুন্দর মুখের উপর চোখ পড়ল।

—এত মন মরা হয়ে পড়েছো কেন ?

—ভাল লাগছে না কিছু। এমন শিকার আমি চাইনা মেরী। অনর্থক রক্তপাতে আমার মন সায় দেয় না। স্তুপিকৃত মৃতদেহ নিয়ে জাহাজটা ডুবে গেল, বিনিময়ে কতটুকু লাভ হল বল ?

—তুমি স্বীকার করো না বটে, তবে আমি জানি, এসমস্ত কাজে

আগেকার মত আর উৎসাহ পাও না। আগে বহুবার
আবার বলছি, কি দরকার এসমস্ত ঝামেলার মধ্যে থাকার। খে এসেছে
ছ ছিল।

—তুমি হয়তো ঠিকই বলছো।

মেরী ম্যাকগ্রের মাথার উপর মুখ রাখল।

—বিল—

—বল?

—চল না, আমরা কোথাও নেমে যাই। যেখানে কোন গোলমাল নেই, ঝামেলা নেই—যেখানে আমি তোমাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাব।

—আমারও তো তাই ইচ্ছে হয় মেরী।

—তবে দেরী করছো কেন?

ম্যাকগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে মেরীকে সাপটে ধরে বলল, আর কিছুদিন, তার পরেই—। আমার ইচ্ছে আছে ভার্জিনীয়ায় গিয়ে বাসা বাঁধব। সদ্য স্বাধীন আমেরিকার এখন নানা সমস্যা। আমাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

দুজনের বিশ্রাম আলাপ কিন্তু আর বেশীক্ষণ গড়াল না। জোহান্স বারবার, লেগ্র্যাণ্ড, প্রমুখ আরো কয়েকজন সহকর্মী কেবিনে প্রবেশ করল। মেরীর কাছ থেকে সরে এসে ম্যাকগ্রে অর্থপূর্ণ-দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সকলের উপর।

জোহান্স বলল, নিগ্রোদের সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমরা এসেছি।

—বেশতো। ওদের সম্পর্কে একটা বিহিত তাড়াতাড়ি করাই ভাল। এতগুলো মানুষকে দিনের পর দিন বসিয়ে খাওয়ানো সোজা কথা নয়।

বারবার বলল, ব্রাজিল বা চিলি না পৌঁছান পর্যন্ত আমাদেরও অসুবিধা মানিয়ে নিতেই হবে।

—তুমি কি বলতে চাইছো ব্রাজিল বা চিলিতে গিয়ে আমরা ওদের বিক্রি করে দেব?

াছাড়া ওদের নিয়ে আর কি করা যেতে পারে?'

াও বলল, পর্তুগীজদের জাহাজে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় । অভাব ওরা পুরিয়ে দেবে। প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে বিক্রি করে।

ম্যাকগ্রে মেরীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আমরা জলদস্যু, দাস ব্যবসায়ী তো নই?

জোহান্স বলল, টাইগার অবশ্যই এ প্রশ্ন করতে পারে। সকলেই স্বীকার করবে আমরা যা করি, দাস ব্যবসা তার চেয়ে অনেক ঘৃণ্য কাজ। তবে বর্তমান পরিস্থিতি অন্যরকম। এতগুলো নিগ্রো যখন হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে তখন তাদের বিক্রি করে লাভ করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—তোমাদের সকলেরই বোধহয় এই মত?

সকলে মাথা হেলিয়ে সায় জানাল।

—তোমাদের মতামতকে আমি সব সময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। আজও বিপক্ষে যাব না। তবে এ সম্পর্কে আমার একটা কথা বলার আছে।

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—

—টাইগারের কথাই হল শেষ কথা।

—ম্যাকগ্রে বলল, "কঙ্কুয়েষ্ট"র আভিজাত্য নষ্ট হোক নিশ্চয় তোমরা চাইবে না?

—না—কখনই না—

—কাজেই চিলি বা ব্রাজিলের উপকূলে "কঙ্কুয়েষ্ট" যাবে না। নিগ্রোদের নিয়ে ওখানে পৌঁছাবে "আলফ্রেণ্ড"।

মাস ছয়েক আগে অক্ষত অবস্থায় একটি ওলন্দাজ জাহাজ অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই জাহাজের চেহারার কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে নিপুণ হাতে এবং নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন সেই "আলফ্রেণ্ড" জলদস্যু অধ্যুষিত নিউ আর্চার

বন্দরে বিশ্রাম নিচ্ছে। কয়েকজন অনুচরকেও ওখানে রেখে এসেছে ম্যাকগ্রে। পরে জাহাজটিকে কাজে লাগাবে এইরকম ইচ্ছে ছিল।

বারবার বলল, চমৎকার প্রস্তাব।

একজন বলে উঠল, টাইগারের মাথা বরাবরই পরিষ্কার।

তবে আমি এই দাস বিক্রির মধ্যে থাকব না।—ম্যাকগ্রে বলল, একজনের উপর দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি সে কাজ সেরে আসবে।

লেগ্র্যাণ্ড বলল, কাকে তুমি দায়িত্ব দিতে চাও?

—এখুনি স্থির করে ফেলব। এই ব্যাপারটাকে বেশী দিন ঝুলিয়ে রাখা আমি সঙ্গত মনে করি না।

—আমিই কাজটা শেষ করে আসতে পারি।

ম্যাকগ্রে একটু হাসল।

—আমি কিন্তু জোহান্সকেই পছন্দ করব। ওর কথাতেই নিগ্রোদের এখানে আনা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায়িক বুদ্ধি আমাদের মধ্যে ওরই একটু আছে বলে আমি মনে করি।

—কিন্তু—

লেগ্র্যাণ্ডকে অগ্রাহ্য করে ম্যাকগ্রে বলল, জোহান্স তোমার আপত্তি নেইতো?

—আপত্তির কোন কথাই উঠতে পারে না টাইগার।

—খুশী হলাম। বারবার জাহাজের মুখ বারমুদার দিকে ঘুরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর গিয়ে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ওখানে পৌঁছান দরকার।

সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে।

"কঙ্কুয়েষ্ট" ক্রমেই বারমুদার নিকটবর্তী হচ্ছে।

মনে হয় আর দিন দশেকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছান সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে অবশ্য একটি নরিউজিয়ান জাহাজ শিকার করা সম্ভব হয়েছে। যা পাওয়া গেছে তাতে খুশীই হয়েছে ম্যাকগ্রে। বরং ওই ছোট জাহাজ থেকে যে এত কিছু পাওয়া যাবে আগে কল্পনাই করতে পারে নি। খাবার-দাবার যা পাওয়া গিয়েছিল, তাছাড়া বাকী সমস্ত যথা নিয়মে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

পড়ন্ত বেলায় ডেকের একপাশে দাঁড়িয়ে ম্যাকগ্রে প্রধান সহযোগীদের সঙ্গে কথা বলছিল। সকলের ইচ্ছে বারমুদা পৌঁছাবার আগে আরো একটি শিকার জুটে যাক। অবশ্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেলে সবই সম্ভব।

ম্যাকগ্রে প্রশ্ন করল, আমরা সকলেই কি খাঁটি খৃষ্টান ?

—নিশ্চয়।

—না, বোধহয়।

সকলেই অবাক।

—কেন ?

—খাঁটি খৃষ্টান কি কখনও শুধু নিজের লালসা পূরণের জন্য নির্বিচারে এত নরহত্যা করতে পারে ? কিন্তু কি অসীম সৌভাগ্যের অধিকারী আমরা, ঈশ্বর বারংবার আমাদের অনুগ্রহ করে যাচ্ছেন !

সকলে হেসে উঠল।

জোহান্স' বলল, সময় সময় তোমার কথা শুনে মনে হয় দুর্ধর্ষ টাইগার ম্যাক উপাধীধারী ব্যক্তিটি যেন তুমি নও। আর কেউ। যাক, যা কথা হচ্ছিল, শিকার যদি এ'কদিনে আর নাও পাওয়া যায় তাতে কিছু আসবে যাবে না। ইদানিং তো আমরা প্রচুর রেস্ত করে নিয়েছি।

—আমি অন্য কথা ভাবছি।—বারবার বলল, বন্দরে পৌঁছে কদিন প্রচণ্ড হুল্লোড় করব। মদের পুকুরে অবিরাম সাঁতরে বেড়াতেও আপত্তি নেই।

—তুমি এত চুপচাপ কেন ? সকলে এতক্ষণ ধরে এত কথা বলল, তুমি টুঁ শব্দটি করলে না, ব্যাপার কি ?

ম্যাকগ্রের কথায় লেগ্র্যাণ্ড বলল, আমি শুনছি।

—শুনছো।

—সকলে কত বাজে বকতে পারে তাই শুনছি আর কি।

—কদিন থেকে লক্ষ্য করছি তুমি বেশ অন্যমনস্ক। ভীষণ চুপচাপ। তাছাড়া আমাকেও এড়িয়ে চলতে চাইছো ! ব্যাপার কি ?

—নিশ্চয় কোন গুরুতর ব্যাপার নয়। গুরুতর কিছু হলে তুমি অবশ্যই জানতে পারবে। এদিকে আকাশের অবস্থা দেখেছো কি ? আমার তো লক্ষণ খুব ভাল ঠেকছে না।

লেগ্র্যাণ্ডের কথায় সকলে দ্রুত চোখ ফেরাল। সত্যি, আকাশের অবস্থা কেমন থমথম করছে। হাল্কা লালচে ভাবের ছোঁয়া লেগেছে একধারে। হাওয়াও পড়ে এসেছে। এ সমস্তই আগত প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাষ। সকলের মনে দুর্ভাবনা চাপ বেঁধে বসল। এই অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড় যে কি প্রচণ্ড তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

ম্যাকগ্রে বলল, লক্ষণ খুব খারাপ।

—একটু হাওয়া নেই দেখেছো।—বারবার বলল, পৃথিবীকে জাহান্নামে পাঠাবার জন্য যেন হাওয়ারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় উঠবে। চারিধারের চুপচাপ ভাব সেকথাই জানিয়ে দিচ্ছে। আমাদের এখুনি সতর্ক হতে হবে। "কঙ্কুয়েষ্টে"র যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

ম্যাকগ্রের নির্দেশে সকল প্রকার সতর্কতা গ্রহণের তৎপরতা আরম্ভ হল।

অল্প কিছুক্ষণ পরে দিগন্তের উত্তর পশ্চিম কোণে মেঘ জমতে দেখা গেল। হাওয়াও উঠল অল্প অল্প। ক্রমে ফ্যাকাশে রংএর মেঘ

ঘন কালো আকার ধারণ করল। মেঘের বিস্তার আর শুধুমাত্র উত্তর পশ্চিম কোণে রইল না, ছেয়ে গেল সারা আকাশ। এইসঙ্গে তাল রেখে হাওয়ার বেগও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সন্ধ্যা শেষ হওয়ার মুখে ম্যাকগ্রের নির্দেশে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল সকলে। পরে দক্ষিণ হাতের কাজ সারার সময় আর না পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইতিমধ্যে চাকা সমেত কামানগুলিকে মোটা কাছি দিয়ে ভালভাবে বাঁধা হয়েছে। জাহাজ যখন অসম্ভব দুলতে আরম্ভ করবে তখন যদি কোনক্রমে একটি কামান নিজের জায়গা থেকে সরে আসে—সারা ডেক গড়িয়ে গড়িয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি যে শুধু করবে তাই নয়, তার তলায় পড়ে মানুষজনও মারা যেতে পারে। সমুদ্রের বুকে এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে।

প্রকৃত ঝড় উঠল গভীর রাত্রে।

সে এক প্রলয়ঙ্কর অবস্থা। ঝড়ের সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। পর্বত প্রমাণ ঢেউ ক্রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত সমুদ্রকে মথিত করে তুলল। খেলাঘরের নৌকার মতই "কস্কুয়েষ্টে"র অসহায় অবস্থা। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তার চলার পথ ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। মুহুর্মুহু প্রবল ঢেউ ডেকের উপর আছড়ে পড়তে থাকায় ক্রমেই অনেক কিছু বিকল হতে আরম্ভ করেছে।

ম্যাকগ্রে এখানে ওখানে ছুটে গিয়ে সহকর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে। সময় সময় তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে ঝড়ের গর্জনে। কখনও আবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গভীর বিপদকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। বৃষ্টির জলে সারা শরীর ভিজে জবজব করছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে ঠাণ্ডায়। এই কিছুক্ষণ আগে থাকতে না পেরে মেরী স্বামীর কাছে ছুটে এসেছিল। অনেক বুঝিয়ে ম্যাকগ্রে আবার তাকে কেবিনে পাঠিয়ে দিয়েছে।

জোহান্স মাস্তুলের ঠিক নীচেই ছিল। পাল অনেক আগেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে চারিধারে। জাহাজের খোলের

মধ্যেকার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। "কঙ্কুয়েষ্ট" অবিরাম টাল খাচ্ছে। সেই সঙ্গে হাত বাঁধা, গলায় মোটা শেকল লাগানো অসহায় কালো মানুষগুলো জর্জরিত হচ্ছে আঘাতে আঘাতে। লোয়াঙ্গা আপ্রাণ চেষ্টা করছে লিয়াকে সামলে রাখার।

হঠাৎ বিচিত্র এক শব্দ থেমে থেমে শুনতে পাওয়া গেল। চমকে উঠল জোহান্স। তার বুঝতে অসুবিধা হল না, ঝড় মাস্তুলকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না। ভেঙ্গে যে পড়বে, ওই শব্দ তারই ইসারা। অকূল, উত্তাল সমুদ্রে মাস্তুলহীন জাহাজ কল্পনাও করা যায় না। জোহান্স দৌড়ে গিয়ে এই নতুন বিপদের কথা ম্যাকগ্রেকে জানাল।

অসম্ভব বিচলিত নায়ক তখন ভেঙ্গে যাওয়া ডেকের একাংশ পর্যবেক্ষণ করছিল। এই পথ দিয়ে কম করে তিনটি কামান সমুদ্রের ভিতরে অদৃশ্য হয়েছে। জোহান্সের মুখ থেকে আরেক বিপদের সংবাদ পেয়ে ম্যাকগ্রে ছুটে এল মাস্তুলের কাছে। সন্দেহ অমূলক নয়। ঝড়ের মাতামাতি একটুও যখন কমেনি তখন মাস্তুল ভেঙ্গে পড়ল বলে।

—মাস্তুলকে বাঁচাবার একটা উপায় বোধহয় আছে।

—তুমি বলছো—

—চারপাশ ঘিরে কাঠের গোল যদি কাছি দিয়ে বাঁধা যায়, তবে নাও ভেঙ্গে পড়তে পারে।—ম্যাকগ্রে বলল, মাস্তুলের ভারপ্রাপ্তরা সব গেল কোথায়? তাদের তো এই সময় এখানেই থাকার কথা।

—আমি দেখছি—

জোহান্স অদৃশ্য হল।

এখন সময়ের মূল্য কল্পনাতীত। "কঙ্কুয়েষ্ট" এখনও যে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যায় নি তা নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। তবে আর কতক্ষণ উন্মাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে এই প্রশ্নই এখন বড়। মহা উত্তেজিতভাবে জোহান্স ফিরে এল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

—তুমি একা ফিরলে যে ?

—ওরা কেউ আসবে না।

ম্যাকগ্রে অবাক হয়ে গেল।

—আসবে না! না আসার কারণটা কি ?

—ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে আছে। লেগ্র্যাণ্ডও আছে ওখানে। ওদের বক্তব্য হল, জাহাজ যখন ডুবেই যাচ্ছে তখন খাটা খাটুনি করে লাভ কি ?

—হুঁ। ওরা মারা পড়ার জন্য সত্যি ব্যস্ত না, এর অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে ? তোমার কি মনে হয় জোহান্স ?

—আমিও সেই কথাই ভাবছি।

এই সময় হাওয়ার চাপে মাস্তুল মটমট করে উঠল। ঝড় কমেনি তো বটেই, বরং বেড়েছে। সমুদ্র আরো বেশী উত্তাল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর নিশ্চিত ভাবে আজ শেষ দিন।

ম্যাকগ্রে দ্রুত গলায় বলল, যদি সময় পাওয়া যায়, বিষয়টি নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। তুমি দৌড়ে গিয়ে জনছয়েক নিগ্রোকে এখানে নিয়ে এস।

—নিগ্রো—

—উদবৃত্ত লোক যখন আর নেই, তখন দেখা যাক ওদের সাহায্যে মাস্তুলটা বাঁচান যায় কিনা। আর দেরী করো না। সময়ের দাম এখন অনেক।

জোহান্স দ্রুত অদৃশ্য হল।

বিপর্যস্ত মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাকগ্রে। জলদস্যুদের অলিখিত আইনে কর্তব্যে অবহেলা দেখান দুরন্ত অপরাধ—একথা জেনেও ওরা হঠকারিতা প্রকাশ করছে কেন ? যদি জাহাজকে বাঁচান যায় তবে এই কেনর উত্তর ম্যাকগ্রে খুঁজে বার করবে। তারপর—

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। জোহান্স ফিরে এল জন সাতেক নিগ্রোকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া

হয়েছিল। গলার ভারী শেকলও অপসারিত হয়েছে। জোহান্স অবশ্য অস্ত্র উদ্যত রেখেছে, কারুর একটু বেচাল দেখলেই দ্বিধা মাত্র না করে শেষ করে দেবে।

এবার অনুভব করা গেল এর পরের কাজ বেশ দুরূহ। নিগ্রোরা এক বর্ণ ইংরাজী বোঝে না। কি করতে হবে আকারে ইঙ্গিতে যে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে, সে উপায়ও নেই। আলোর অভাব। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসালে লহমার জন্য চারিধার পরিষ্কার হচ্ছে এই মাত্র।

অগত্যা ম্যাকগ্রে নিজেই কাজে লেগে গেল। তার কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করে যদি নিগ্রোরা বুঝতে পারে কি জন্য তাদের এখানে ডেকে আনা হয়েছে। যা হবার হবে। এই ভেবে নিয়ে জোহান্স অস্ত্র নামিয়ে ম্যাকগ্রেকে সাহায্য করার জন্য এগুলো।

বলা বাহুল্য, বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী লোয়াঞ্জাও দলটিতে আছে। সে লিয়াকে ছেড়ে উপরে উঠে আসতে চায় নি। কিন্তু তার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায়। ম্যাকগ্রে ও জোহান্সকে গোল নিয়ে টানাটানি করতে দেখে লোয়াঞ্জাই প্রথম বুঝতে পারল. ওরা তাদের কি করতে বলছে।

লোয়াঞ্জা এগিয়ে গেল।

তারপর বাকী সকলে।

এবার আর কোন অসুবিধা রইল না। বেশ দ্রুতই গোলগুলি মাস্তুলের চারপাশে বেড় দেওয়া সম্ভব হল। কাছি জড়ানোর কাজও চলতে লাগল। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না। চারিধার কাঁপিয়ে মড়মড় শব্দে মাস্তুলের উপরের অংশ ভেঙ্গে পড়ল। মনে হল, "কঙ্কুয়েষ্ট"ও একটু হেলে পড়েছে।

ভাঙ্গা অংশটি ভীম বেগে নীচে নেমে এসেছিল। অল্পের জন্য ম্যাকগ্রে বেঁচে গেলেও, দুজন নিগ্রো সম্পূর্ণ থেঁতলে গেল। তাদের শেষ চীৎকার এক হয়ে গেল ঝড়ের হাহাকারের সঙ্গে। "কঙ্কুয়েষ্ট"কে

বাঁচাবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। প্রকৃতির এই তাণ্ডব সহজে থামবে বলে মনে হয় না।

মুখ ঢেকে বসে পড়েছে জোহান্স।

টলতে টলতে ম্যাকগ্রে চলেছে নিজের কেবিনের দিকে। সব আশা শেষ হয়ে গেছে—এই ঘনিয়ে আসা মুহূর্তে মেরীর পাশে থাকাই ভাল। নিগ্রোদের কথা ওরা কেউ মনে রাখে নি। মৃতদেহ ছুটির পাশে, বাকী চারজন স্বজাতীয়র সঙ্গে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লোয়াঙ্গা।

॥ ৬ ॥

ঘন কুয়াশা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে।

ভোর হওয়ার পূর্বাভাষ অনুভব করা যায়। ম্যাকগ্রে হাঁটু মুড়ে বসে, চোখ বন্ধ করে বহুক্ষণ ধরে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। ওই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের হাত থেকে যে রক্ষা পাওয়া যায় তা কল্পনাতীত। সেই অকল্পনীয় ঘটনাই ঘটেছে শেষ পর্যন্ত। যখন সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তখনই হঠাৎ হাওয়ার বেগ নিস্তেজ হয়ে এল।

বৃষ্টিও ধরে এল।

তখন শেষ রাত্রি। উত্তাল সমুদ্র মন্ত্র বলেই যেন শান্ত হয়ে আসতে লাগল। অবশ্য এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক খামখেয়ালীপনা সুবিদিত। প্রলয়ঙ্কর ঝড় হঠাৎই আসে, তবে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। "কঙ্কুয়েষ্ট" ক্ষত-বিক্ষত হলেও, শেষ পর্যন্ত যে রক্ষা পেয়ে গেছে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। নিষ্ঠুর জলদস্যুদের মন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়েছে।

—ঝড় ও বৃষ্টি থেমে যাবার পরই ঘন কুয়াশা গ্রাস করে নিয়েছে চতুর্দিক। বলগাহীন অশ্বর মত, কোন নিয়ন্ত্রণ না মেনে "কঙ্কুয়েষ্ট" ভেসে চলেছে। এই ভেসে চলা নির্দিষ্ট পথ ধরে কখনই নয়। সম্পূর্ণ কুয়াশা সরে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারা যাবে না জাহাজ বিপরীত-মুখী কিনা।

মমতাভরা দৃষ্টি নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে, একইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মেরী। প্রার্থনা শেষ করে ম্যাকগ্রে উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে, তার গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল।

—এবারকার মত বিপদ আমরা কাটিয়ে উঠতে পারলাম।

—ঝড় আবার উঠতে পারে। তখন কিন্তু "কঙ্কুয়েষ্ট"কে আর বাঁচান যাবে না। এইভাবে মৃত্যুকে শিয়রে রেখে আমরা আর কতদিন কাটাব?

—জলদস্যুদের জীবনই তো হল অবিরাম মরণ দোলায় দুলতে থাকা। তবে তোমার মনের ভাব আমি অনেক অগেই বুঝে ফেলেছি মেরী। এই জীবন থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করব।

—কোথায় চলেছো?

—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। সেগুলির ব্যবস্থা করা দরকার।

ম্যাকগ্রে নিষ্ক্রান্ত হল।

মাস্তুলের তলায় তখনও থেঁতলান মৃতদেহ দুটি পড়ে রয়েছে। সেই মৃতদেহ দুটির পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে চারজন নিগ্রো। তাদের নিশ্চিন্ততা বিস্ময়কর। ম্যাকগ্রে ওখানে গিয়ে দাঁড়াল। একি, চারজন কেন? সংখ্যায় ওরা সাতজন ছিল। দুজন মারা গেছে। পঞ্চম ব্যক্তি গেল কোথায়? এধার ওধার চাইতেই ম্যাকগ্রে লক্ষ্য করল, বারবার কয়জনকে নিয়ে জটলা করছে।

এগিয়ে গেল ও।

—একজন নিগ্রো কম দেখছি? মুক্তির লোভে বোকার মত জলে লাফিয়ে পড়েছে নাকি?

বারবার উত্তর দিল, খোলের মুখের বন্ধ দরজার সামনে একজন বসে আছে। সে ভেতরে ঢুকতে চায়।

—বল কি! বাইরের মুক্ত জল হাওয়া তার পছন্দ নয়? বন্দী জীবনই তার কাছে বেশী আনন্দদায়ক?

তার আকুলি বিকুলি দেখে আমার মনে হয়, ভিতরে নিশ্চয় তার কোন প্রিয়জন আছে। তাই সে বাইরে থাকতে চাইছে না।

—তোমার ধারণা সঠিক কিনা অনুসন্ধান করে দেখ গিয়ে।

বারবার চলে যাচ্ছিল, আবার ম্যাকগ্রে বলল, আজ থেকে ওই

পাঁচজন নিগ্রো আর বন্দী জীবন যাপন করবে না। জাহাজের বিভিন্ন কাজে ওদের লাগিয়ে দেওয়া হবে। বিপদের সময় ওদের সহযোগিতা পাওয়া গেছে, একথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কুয়াশা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ভারী মিষ্টি লাগছে সূর্যের হাল্কা তাপ। সকলে একে একে সেখানে উপস্থিত হতে লাগল। লেগ্র্যাণ্ডও এসে দাঁড়াল অল্প কিছু দূরে। তার মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ। ম্যাকগ্রে আর সময় নষ্ট না করে, মেরামতের কাজে লোক লাগিয়ে দিল। কালকের ঝড়ে জাহাজের যে ক্ষতি হয়েছে, তার পূরণ যত তাড়াতাড়ি করে নেওয়া যায় ততই ভাল। তিনটি কামানের সলিল সমাধি হয়েছে। সেগুলির জন্য অবশ্য আক্ষেপ থেকেই যাবে।

মৃতদেহ দুটি জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিগ্রো চারজনকে দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে কাজ করিয়ে নেওয়া হতে লাগল। ম্যাকগ্রে কাজ তদারক করতে করতে লক্ষ্য করল, বারবার পঞ্চম জনকে নিয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে একটি যুবতী। হোক না কালো, তবু তো অল্পবয়সী মেয়ে—চারিদিক থেকে অশ্লীল মন্তব্য আর শিস ভেসে আসতে লাগল। মেরীকে কেন্দ্র করে এই ধরনের কিছু করা সম্ভব নয়, ইচ্ছা না থাকলেও দলপতির স্ত্রীকে মান্য করে চলতেই হয়। এর বেলায় বাধা কই ?

'লোয়াঞ্জা আর লিয়া এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল ম্যাকগ্রের সামনে। ধীরে ধীরে মাথা নত করল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোন পন্থা তাদের জানা নেই। গত রাত্রেই লোয়াঞ্জা বুঝতে পেরেছিল, এই মানুষটিই হল দলপতি। কৃতজ্ঞতা জানাতেই যদি হয় —মাথা নোয়াতেই যদি হয়, তবে আর কারুর কাছে নয়, এঁর সামনে গিয়েই তা করতে হবে।

ম্যাকগ্রে বিব্রত বোধ করতে লাগল।

কেউ কারুর ভাষা বোঝে না। এ এক বিশ্রী ব্যাপার।

অবস্থা বুঝে বারবার লোয়াঙ্গাকে কাজে লাগিয়ে দিল। লিয়া ভীতচকিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল কোণ ঘেঁসে। মন্তব্য আর বিশ্রী ধরনের হাসি তখনও শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল এখান ওখান থেকে। ম্যাকগ্রে ভ্রূকুঁচকে সকলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

বলল উঁচু গলায়, এই পাঁচজন নিগ্রোকে আজ থেকে আমি কাজে নিযুক্ত করেছি। আর ওই মেয়েটি—ওকে তোমরা কোনভাবে বিরক্ত করেছো জানতে পারলে তার ফল মোটেই ভাল হবে না!

লেগ্র্যাণ্ড বলল, তোমার এই হুকুম একটু বাড়াবাড়ি ধরনের হ্ল না কি?

—বোধ হয় না।

—আমি তা মানতে রাজী নই।

ম্যাকগ্রের মুখ লাল হয়ে উঠল।

সে দৃঢ় গলায় বলল, তুমি মানতে রাজী হলে কি হ্লে না তাতে কিছু যায় আসে না। ভুলে যেও না, "কক্সুয়েষ্টে"র অধিনায়ক আমি—একমাত্র আমারই অধিকার আছে আর সকলের উপর হুকুম করার।

—আমরাই তোমাকে অধিনায়ক করেছি।

—সে কথা আমার মনে আছে।

—আমরা ইচ্ছে করলে আবার—

—লেগ্র্যাণ্ড—

সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। এখুনি গুরুতর কিছু ঘটে যায় বুঝি। ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে কিছু ঘটল না। ঘটল না জোহান্স মাঝে এসে পড়ায়। লেগ্র্যাণ্ডের দুচোখ থেকে তখন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। হেস্তনেস্ত হয়ে যাক তাই বোধহয় সে চাইছিল। ম্যাকগ্রে অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়েছে।

জোহান্স বলল, আমরা কোথায় রয়েছি, তুমি আন্দাজ করতে পারছো টাইগার? পায়ে পায়ে রেলিং-এর কাছে এগিয়ে গেল ম্যাকগ্রে। রৌদ্রের আভায় ভেসে যাওয়া নীল দরিয়া এখন হাসছে।

গত রাতের করাল রূপের কথা এখন কল্পনাই করা যায় না। ম্যাকগ্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে লক্ষ্য করল, দূরে—বহুদূরে আবছা ভাবে গাছপালার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কোন বড় আকারের দ্বীপ না হয়ে যায় না।

—দূরে গাছপালা দেখতে পাচ্ছ? ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতো জায়গাটা চিনতে পার কি না?

—গুয়াম বলে মনে হচ্ছে।

—গুয়াম ছাড়া আর কিছু নয়।

—তার মানে আমরা—

একটু হেসে ম্যাকগ্রে বলল, ঈশ্বরকে আরো একবার ধন্যবাদ দাও জোহান্স। "কঙ্কুয়েষ্ট" বিপরীত দিকে না গিয়ে, ঝড়ের ধাক্কায় বিস্তর পথ অনেক তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে ফেলেছে।

—সত্যি, দারুণ ব্যাপার।

—বারমুদা আর খুব বেশী দূরে নয়। আর দিন দুয়েক সময় লাগতে পারে।

একটু থেমে ম্যাকগ্রে এবার কথার মোড় ঘোরাল।

—অপ্রিয় কাজটা এখুনি আমি সেরে ফেলতে চাই।

—অর্থাৎ—

—মাস্তুল ঘটিত ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের বিচার এখুনি হবে। শৃঙ্খলা ভঙ্গের নজীর যত কম সৃষ্টি হয় ততই ভাল। ঔদ্ধত্য সময় সময় বরদাস্ত করা যায় কিন্তু দায়িত্বে অবহেলা অসম্ভব।

—এখুনি বিচার হবে?

—এখুনি। বুঝতে পাচ্ছ না কেন ব্যাপারটাকে আমি অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করছি। তাই আর ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

ম্যাকগ্রে সকলের মধ্যে ফিরে এল।

—বারবার মাস্তুলের দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের আমার সামনে উপস্থিত কর। ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন

থাকা যে গুরুতর অপরাধ একথা কেন তারা মনে রাখেনি আমার জানা দরকার।

কি ঘটতে চলেছে সকলেই অনুমান করে নিল। এরকম ঘটনা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। বারবার কয়েকজনের সহযোগিতায় অনিচ্ছুক বার্লো, র‍্যাসেল, নেলসন আর হুভারকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। কালকের সেই দাপট কোথায় উবে গেছে। চারজনের মুখেই ভয়ের চিহ্ন।

—তোমাদের কিছু বলবার আছে?

—না···মানে···আমরা···

র‍্যাসেলকে থামিয়ে ম্যাকগ্রে গম্ভীর গলায় বলল, আমতা আমতা করে নয়, আমি পরিষ্কার কথা শুনতে চাই।

হুভার বলল, বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাই—

—নেলসন, তুমি—

—অন্ধকারের দরুন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তার উপর আবার বৃষ্টি—কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম—

—বার্লো—

—নেলসনের সঙ্গে আমি এক মত। ওরকম দুর্যোগের মধ্যে কাজকর্ম করার কোন সুবিধা ছিল না। আমিও তাই—

র‍্যাসেল তোমার কি বলবার আছে?

—ওরা চলে যাবার পর আমি একা আর কি করতে পারতাম। তাছাড়া শরীরও ভাল ঠেকছিল না। ভাবলাম—

—মিথ্যাবাদী।

গর্জে উঠল ম্যাকগ্রে।

—তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। তোমরা কি জানতে না, অকারণে যারা সত্যের অপলাপ করে তাদের আমি ঘৃণা করি—কোন মূল্যেই তাদের ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না?

করুণ গলায় নেলসন বলল, আমরা কিন্তু মিথ্যা কথা বলিনি।

আমরা—থাম। জোহান্সকে তোমরা কি বলেছো আমি শুনেছি। হয়তো কারুর প্ররোচনায় তোমাদের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। আমার দৃষ্টিতে তবু অপরাধের গুরুত্ব একচুল কমে না।

এই সময় লেগ্র্যাণ্ড বলে উঠল, আমার কিছু বলার আছে—

—তোমার কথা পরে শুনছি।

—না, এখনই শুনতে হবে।

—লেগ্র্যাণ্ড, তোমার মনে রাখা উচিত আমার সহ্যের সীমা আছে। বেশ কিছুদিন ধরে তুমি আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছো কেন তাও আমি জানি। ক্ষমতার লোভ তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে। ভেতরে ভেতরে দল পাকাবার চেষ্টা করছো—এই হতভাগ্য চারজন তোমারই ইসারায় যে নেচেছে তা এখন আমার মত অনেকেই বুঝতে পাচ্ছে। আমি লুকিয়ে ছাপিয়ে কোন কাজ করতে চাই না। "কঙ্কুয়েষ্টে"র নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত কে থাকবে তার নিষ্পত্তি সকলের সামনেই হবে। তবে তার আগে এই চারজনের ব্যবস্থা আমায় করে নিতে দাও।

ম্যাকগ্রে কথা শেষ করেই অপরাধীদের দিকে ফিরল।

—জোহান্স—

—টাইগার—?

যে মাস্তুলকে অবহেলা করা হয়েছে, সেই ভাঙ্গা মাস্তুলের সঙ্গে এদের বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা কর। অবশ্য তার আগে চারজনকে আচ্ছা করে চাবকাতে ভুলবে না। মৃত্যুদণ্ডই হল প্রকৃত সাজা। তবে এদের কিছুটা দয়া দেখাতে চাই। সন্ধ্যার মুখেই বোধহয় হোয়েল আইল্যাণ্ড আমরা অতিক্রম করব। তখন এই চার বিশ্বাসঘাতককে ওই জনমানবহীন দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হবে এক বস্ত্রে, কোন খাদ্যদ্রব্য না দিয়েই।

একজন প্রশ্ন করল, ওদের অর্জিত সম্পদের কি হবে?

—তোমরা সকলে ভাগ করে নেবে।

মৃদু হর্ষধ্বনী উত্থিত হল।

ঠিক এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। হিংসার আগুনে পুড়তে থাকা লেগ্র্যাণ্ড আর স্থির থাকতে পারেনি, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হয়ে উদ্যত অস্ত্র হাতে ছুটে এল ম্যাকগ্রের দিকে। কেউই প্রস্তুত ছিল না, এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার জন্য, ম্যাকগ্রে তো নয়ই—তার মৃতদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে ব্যাপার ঘটল তা যেমন অভাবনীয়, তেমনই অবিশ্বাস্য।

অস্ত্র আর হানা হল না। প্রচণ্ড আঘাতে টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের উপর সপাটে পড়ল লেগ্র্যাণ্ড। তারপর তার দেহ গড়াতে গড়াতে সরে গেল কিছুদূরে। আঘাত বেশ গুরুতর ধরনের হয়ে গেছে। ফাঁক হয়ে যাওয়া তালু থেকে অবিরাম গড়িয়ে চলেছে রক্ত।

কারুর মুখে কথা নেই। প্রকৃত ঘটনাটি উপলব্ধি করার পরই সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল লোয়াঞ্জার দিকে। রক্তমাখা কাঠের ভারী টুকরোটা ফেলে দিয়ে সে ধীরে ধীরে ম্যাকগ্রের সামনে এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। এই সহানুভূতিশীল মানুষকে সে চোখের উপর মারা পড়তে দেখতে পারে না। তাই স্থির থাকতে না পেরে নির্মম ভাবে বাধা দিয়েছে লেগ্র্যাণ্ডকে।

লিয়াও ছুটে এসেছে ততক্ষণে। বসে পড়েছে ম্যাকগ্রের পায়ের কাছে। লোয়াঞ্জার ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল সে। অভিভূত ম্যাকগ্রে নিজের জীবনদাতার দিকে তাকাল। বিশাল দেহের অধিকারী কালো মানুষটি একইভাবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্ধর্ষ টাইগার ম্যাকের দুচোখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নিজের ডান হাত রাখল ওর বাঁ কাঁধের উপর। তারপর মৃদু চাপ দিল। ততক্ষণে সম্বিত ফিরে এসেছে সকলের। প্রথমে গুঞ্জন, তারপর কোলাহলে ভরে উঠল চারিধার। জোহান্স, বারবার ও

আরো কয়েকজন ঝুঁকে পড়ল লেগ্র্যাণ্ডের দেহের উপর। অনুমান মিথ্যে নয়, আঘাতের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে ক্ষমতালোভী ইয়র্কশায়ারের অধিবাসীটি জীবনের পরপারে চলে গেছে।

ডেকে যে এত কিছু ঘটে গেছে তা মেরীর জানবার কথা নয়। সারারাত মৃত্যুর মুখোমুখি বসে কেটেছে—ঘুম হয়নি। ঘুমের আশায় তাই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড কোলাহল কানে আসায়, আশঙ্কাতুর মন নিয়ে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। প্রথমে বুঝতে পারেনি কি হয়েছে। তারপর লেগ্র্যাণ্ডের মৃতদেহর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ম্যাকগ্রে পত্নীর নিকটবর্তী হল।

—ওঁর এ অবস্থা কি ভাবে হল?

—আমাকে মারতে এসে নিজেই হত হয়েছে লেগ্র্যাণ্ড।

—ঈশ্বর মহানুভব। কিন্তু—

—আমাদের মনে যাদের জন্য ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই, এই কালো মানুষটি তাদেরই একজন। কিন্তু ও যদি সময় মত তৎপরতা না দেখাতে, তাহলে আমার মৃতদেহ এখানে পড়ে থাকতে দেখতে পেতে।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার লোয়াঙ্গার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মেরী সকলের সামনেই সবলে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। বিপদ মুক্তির আনন্দে দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসতে লাগল এই সঙ্গে। যারা ঈর্ষাকাতর তারা ছাড়া বাকীরা এই দৃশ্য পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল।

পথে আর কোন বিপদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। নির্বিঘ্নেই "কঙ্কুয়েষ্ট" বারমুদার তীরে এসে ভিড়েছে। অবশ্য শৃঙ্খলাভঙ্গকারী

চারজনকে হোয়েল আইল্যাণ্ডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল—কান্নার বান ডাকিয়ে দিয়েছিল তারা, কিন্তু কিছুতেই কর্ণপাত করা হয়নি। জলদস্যুদের নিয়মে অভিযুক্তদের দয়া দেখানো চলতে পারে না। যে আদেশ একবার দেওয়া হয়ে গেছে তা পালিত হবেই।

"কঙ্কুয়েষ্ট" নোঙ্গর করার অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচুর সোরগোল তুলে অধিকাংশ জলদস্যুরা তীরে নেমে গেল। তারপর ছুটল অদূরে পানশালার দিকে। বহুদিন পরে সকলে আকণ্ঠ যে পান করবে তাই নয়, নারাও মরুভূমি হয়ে যাওয়া হৃদয়কে সরস করে তুলবে। পণ্যা নারীরা দলে দলে ওই সমস্ত জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকে। কখন কোন জাহাজ তীরে এসে ভাড়বে, আর তারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দেহ তুলে দেবে ছিনিমিনি খেলার জন্য পশু হয়ে যাওয়া কতকগুলি মানুষের হাতে।

লিয়া, লোয়াঙ্গা বা বাকী চারজনকে আর খোলের মধ্যে ফিরে যেতে হয়নি। মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারলেই সেই আদেশ সানন্দে পালন করেছে। এত অনুগ্রহ, এত স্বাধীনতা, স্বপ্নেও কি কখনও আশা করেছিল তারা?

দুজনে দাঁড়িয়েছিল জাহাজের এক ধারে। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল অনেকদূর পর্যন্ত। বহু মানুষের সরগম, কর্মচঞ্চল বন্দর তাদের হতবাক করে দিয়েছিল। আঙ্গোলার যে বন্দর থেকে তাদের বোঝাই করা হয়েছিল, এখানকার সঙ্গে সে জায়গার তুলনাই চলে না।

লিয়া বলল, কত ভাল জায়গা।

অন্যমনস্ক ভাবে বলল লোয়াঙ্গা, সাদা মানুষরা আরো কত শহর তৈরী করেছে।

—ওরা কত কি পারে! সব সাদারা বোধহয় খারাপ নয়।

—আমারও তাই মনে হয়। আমাদের নিয়ে এখন কি করবে বলতো?

—এখানেই বোধহয় বেচে দেবে। লাওয়ুব মুখে শোননি, যাদেব খেত-খামার আছে তারাই মানুষ কেনে। তাবা খুব খাবাপ লোক। চাবুক দিয়ে মারবে আর আমাদের দিয়ে কাজ করাবে।

লিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে লোয়াঙ্গা বলল, আমাব মন বলছে, যাবা খোলের মধ্যে আছে তাদের বেচা হবে। আমরা ছ'জন রেহাই পেয়ে যাব।

—প্রধান বোয়ানোর প্রাণ বাঁচিয়েছো বলে বলছো ? হতে পাবে! তাহলে আমরা কি শুধু এদের সঙ্গে ভেসে বেড়াব ?

—তা কি কবে বলবো ?

ওদিকে—

এই মাত্র বিগলিত হাসিতে মুখ ভাসিয়ে পাদ্রি ইয়ং "কঙ্কুয়েষ্ট" থেকে বিদায় নিলেন। জলদস্যুদেব জাহাজ বন্দরে এসেছে জানতে পাবলেই তিনি উপস্থিত হন। আশীর্বাদ কবেন সকলকে। প্রার্থনা জানান, প্রতিনিয়ত ওরা যেন দামী দামী শিকাব পেতে থাকে। বলা বাহুল্য প্রতিবারেব মত এবাবও কিছু স্বর্ণমুদ্রা আব কিছু কাপড়-চোপড় সঙ্গে কবে নিয়ে গেছেন।

জোহান্স বলল, ঈশ্বরেব প্রতিনিধি বলে এবা নিজেদের দাবী কবে। অথচ যারা নির্বিচারে মানুষ খুন করছে, ধর্মের সমস্ত অনুশাসন তচনচ করে দিচ্ছে তাদের জন্য আবাব প্রার্থনাও জানাচ্ছে।

গম্ভীর গলায় ম্যাকগ্রে বলল, এরা লোভী জোহান্স। আমবা যা কবি তার মধ্যে কোন কারচুপি নেই। অথচ এবা ঈশ্বরকে সামনে বেখে—তাঁর দোহাই দিয়ে পাপ করে চলেছে। ভাল কথা, গভর্নরকে ভেট পাঠানো হয়েছে কি ?

—হ্যাঁ। লং পৌঁছে দিয়ে আসতে গেছে।

—এই আবেক ভণ্ড। বারবার বলল, ইংল্যাণ্ড থেকে যত রাজ্যের অপদার্থদের নানা দেশে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছে।

ওরা তিনজন ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না।

—টাইগার, তুমি জাহাজ থেকে নামবে না ?

—না।

—মাটিতে বহুদিন পা দেওয়া হয়নি। আমরা ঘুরে আসি। এই সঙ্গে ভাল ভাবে গলাও ভিজিয়ে নেওয়া যাবে।

—নিশ্চয়। তবে যাবার আগে তোমরা আমার একটা কথা শুনে যাও।

দুজনে উৎসুক ভাবে ম্যাকগ্রের মুখের দিকে তাকাল।

তখনই সে কিন্তু কিছু বলল না। পায়চারী করল কয়েকবার। মাথায় আঙুল চালিয়ে চুল এলোমেলো করে দিল। তারপর এসে দাঁড়াল দুজনের সামনে। কিসের আবেগ যেন মুখের প্রতিটি রেখার উপর ছাপ ফেলেছে।

—সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে আমরা অনেকদিন একই সঙ্গে আছি। তবে এবার আমায় তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।

—বিদায় নিতে হবে !

হ্যাঁ, বারবার। তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট যে হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু কি করব ? অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমায় এই সমাধানে পৌঁছাতে হয়েছে।

দ্রুত গলায় জোহান্স বলল, কেন এই সমাধানে তুমি পৌঁছালে ? আমরা কি তোমায় অবজ্ঞা করেছি ?

—কখনই না। তোমাদের মত সহকর্মী পেয়েছিলাম বলেই এত-দিন কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছি। আসল কথা হল, এই জীবন আর ভাল লাগছে না। স্ত্রীর সঙ্গে এবার নিরিবিলিতে সময় কাটাতে চাই।

বিশ্বের যে কোন দেশের পণ্যবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেনদের যার নাম শুনলে রক্ত শুকিয়ে যায়, সেই টাইগার ম্যাকের মুখ থেকে এমন ঝিমিয়ে পড়া প্রস্তাব বেরুবে জোহান্স যা বারবার কল্পনাই করতে পারে নি। রক্তের প্রতি বিন্দুতে যার উন্মাদনা সে আর দশজনের মত শিষ্ট গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবে কি ভাবে ?

জোহান্স বলল, আমার মনে হয় না সেজীবনে তুমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। দুর্বিসহ হয়ে উঠবে—

তাকে বাধা দিয়ে ম্যাকগ্রে বলল, সত্যি যদি সে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, আমি ফিরে আসব। কথা দিচ্ছি ফিরে আসব। তখন যদি তোমরা আমাকে অধিনায়ক হিসাবে মেনে না নাও, তাতেও কিছু যাবে আসবে না। একজন সাধারণ সহযোগী হিসাবেই আমি দলে থাকব।

এরপর নানা যুক্তি দিয়ে জোহান্স ও বারবার অনেক বোঝাল কিন্তু ম্যাকগ্রের মত পরিবর্তন আনা সম্ভব হল না। তার এজীবনের উপর যবনিকা পড়বেই। রক্তে সে আর হাত রাঙ্গাবে না।

শেষে বারবার বলল, কিন্তু তুমি যাবে কোথায়? ইংল্যাণ্ডে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়ার অর্থই হল ফাঁসিমঞ্চে গিয়ে দাঁড়ান।

—সত্ত স্বাধীন আমেরিকায় যাব আমি। নানা দেশের লোক দলে দলে ওখানে গিয়ে জুটছে। আমাকে কে চিনবে? আমি মিশে যাব জন-সমুদ্রে। তোমরা একটা ছোট জাহাজ আমাকে সংগ্রহ করে দাও। পুরানো হলেও চলবে।

—কবে তুমি রওয়ানা হতে চাও?

সম্ভব হলে কালই।

—এত তাড়াতাড়ি!

মৃদু হেসে ম্যাকগ্রে বলল, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব হবে, আমি মেরীকে তত বেশী খুশি করতে পারব। তোমরা তো দেখেছো, তার জন্য বেশী সময় কখনই দিতে পারিনি। আর একটা কথা—

—বল?

—যে পাঁচজন নিগ্রো এখন কাজে নিযুক্ত আছে, তারা আমার সঙ্গে যাবে। নিশ্চয় তোমাদের আপত্তি নেই? ওদের সঙ্গের একজন আবার আমার জীবনদাতা। যুবতীটিকে নিয়ে যেতে চাই। মনে

হয় আমার জীবনদাতার সে স্ত্রী বা বান্ধবী। অকৃতজ্ঞ নই বলেই একাজ আমায় করতে হবে।

—পাঁচজন কেন, তুমি একশজন নিগ্রো নিয়ে যেতে চাইলেও কারুর আপত্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। তুমি কি বল জোহান্স ?

—তোমার কথাই ঠিক। তবে একটা কথা, টাইগার চলে যাবার পর "কঙ্কুয়েষ্টে"র কে নায়ক হবে সে সমস্যার কিন্তু কোন সমাধান হল না।

বিমর্ষ দুই সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ম্যাকগ্রে বলল, সে সমস্যার সমাধান আমি করেই যাব। জাহাজের অধিকাংশ মানুষ বেসামাল অবস্থায় এখন পানশালাগুলিতে রয়েছে। ওরা ফিরে আসুক, তারপর সকলের সামনেই আমি নিজের ভবিষ্যতের কথা বলব। এবং তখনই নির্বাচিত হবে "কঙ্কুয়েষ্টে"র ভবিষ্যৎ নায়ক। ও সমস্ত কথা এখন থাক। চল, আমরাও সুরার সেবা করি খানিক। যতদূর মনে পড়ছে, ফরাসী আঙ্গুরের রস এখনও কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে।

ম্যাকগ্রে এগুলো।

তাকে অনুসরণ করল জোহান্স আর বারবার।

॥ ৮ ॥

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর।

ছোট আকারের জাহাজ "রেনবো" মেরিল্যাণ্ডের আঘাটায় এসে নোঙ্গর করল। অ্যাটলান্টিকের দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে "রেনবো" পটোম্যাক নদীর অববাহিকায় এসে পড়েছিল, তারপর নদী বেয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আমেরিকার মূলভূখণ্ড ছুঁয়ে নিজের যাত্রা শেষ করেছে।

মেরীকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাকগ্রে তীরে নেমে পড়ল।

এরপর নামল পঁচিশজন নিগ্রো। যার নেতৃত্ব করছে লোয়াঞ্জা। লিয়াও আছে সঙ্গে। ম্যাকগ্রে যদিও বলেছিল, ছজনের বেশী লোক সঙ্গে নেবে না। দলের লোকেরা জোর করে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে চলেছে, সাহায্যকারী সঙ্গে যত বেশী সংখ্যক থাকে ততই ভাল।

ম্যাকগ্রে চারিধার খুঁটিয়ে দেখল। কাছাকাছি জনবসতি আছে বলে মনে হয় না। জংলা অঞ্চল। তবে দূরের জমি চাষের উপযোগী বলেই মনে হয়। কিছু যন্ত্রপাতি আর কয়েকটি গৃহপালিত জন্তু সংগ্রহ করতে পারলেই চাষ-আবাদের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। সে স্থির করে ফেলল, এখন আর বেশীদূর না এগিয়ে এখানেই বসবাস আরম্ভ করবে। কালে এই অঞ্চলই জনসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মেরী বলল, কাছাকাছি শহর এখান থেকে কতদূর ?

—একশ মাইল বা তার বেশীও হতে পারে। আমার কোন ধারণা নেই। আমেরিকার মাটিতে আমি এই প্রথম পা দিলাম।

জায়গাটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না? আমি তো ভাবছি এখানেই ঘর বাঁধব।

—এখানে!

—হ্যাঁ, মেরী। আমার মত কুখ্যাত জলদস্যুর প্রকাশ্যে না যাওয়াই ভাল। কোন শহরের ধারে কাছে ঘেঁসা ঠিক হবে না। বলাতো যায় না, কেউ হয়তো আমাকে চিনে ফেলল। দেখছো তো প্রচুর অনাবাদি জমি পড়ে রয়েছে। চাষ-বাস এখানে আরম্ভ করে দিলে বরং এই দেশের উপকারই হবে।

আরো নানা ভাবে বুঝিয়ে মেরীর মন থেকে ভয় দূর করবার চেষ্টা করল ম্যাকগ্রে। তারপর লোয়াঙ্গাকে নির্দেশ দিল জাহাজ থেকে কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে আসতে। জায়গাটা অবিলম্বে পরিষ্কার করে বাসোপযোগী করা প্রয়োজন।

বারমুদা থেকে মেরিল্যাণ্ড পর্যন্ত আসতে মাসছয়েকের কিছু বেশী সময় লেগে গেছে। বারমুদার কাছাকাছি অবশ্য আমেরিকার নিম্নাংশ ফ্লোরিডা। ওখানে নামলে সময় অনেক কম লাগতো। ফ্লোরিডা স্পানিশ অধিকৃত বলেই ওখানে নামেনি ম্যাকগ্রে। তবে এই বেশী সময়টুকু বৃথা যায়নি। স্বামী-স্ত্রী মিলে নিগ্রোদের আপ্রাণ ভাবে কাজে লাগে এমন ইংরাজী শেখাবার চেষ্টা করেছে। ফলস্বরূপ এখন তারা বলতে না পারলেও, মোটামুটি বুঝতে পারছে। লাভের দৃষ্টিকোণ দিয়ে এও কম নয়।

দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্র বিপ্লবে শ্রান্ত আমেরিকার কিছু কিছু সংবাদ ম্যাকগ্রে নানা সূত্রে আগেই সংগ্রহ করেছিল। এই মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই দলে দলে ইংরাজ অ্যাটলান্টিকের উপকূলবর্তী দীর্ঘ অঞ্চলে বন কেটে বসত আরম্ভ করেছিল। ভার্জিনীয়াই ছিল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য এই উপনিবেশটি ইংল্যাণ্ডের রাজার অধীনেই শাসিত হচ্ছিল।

কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হল না। নানা বৈষম্য ও পক্ষপাতদুষ্ট

ঘটনা প্রবাসী ইংরাজদের রাজার বিরুদ্ধে করে তুলল। এবং অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা দাবী করে বসল স্বাধীনতার। আরম্ভ হল রাজা ও প্রজার মধ্যে যুদ্ধ। বহু বছর ব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে শেষ হল ১৭৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর—সেইদিন রাজপক্ষীয় সেনাপতি কর্ণওয়ালিশ মুক্তি যুদ্ধের অধিনায়ক ওয়াশিং-টনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

বর্তমানে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে দ্বিতীয় দফায় কার্য্য পরিচালনা করছেন। এই নতুন দেশটি সমৃদ্ধির পথে। অজস্র জমি চারিধারে—ঢালাও আদেশে নামমাত্র খাজনা দিয়ে জঙ্গল কেটে বসবাস আরম্ভ করছে নবাগতরা। আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে নিগ্রো আনা হচ্ছে। দেখতে না দেখতেই তারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে চড়া দরে। এই সমস্ত দাসদের চাবুক মেরে মেরে অষ্টপ্রহর খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলতে গেলে খেতে খামারে।

ম্যাকগ্রে বুক বেঁধে তাই এখানে এসে নেমেছে। জমি পাওয়া যাবে, খাটবার লোকও সঙ্গে রয়েছে—ভাবনা কি? তাছাড়া সে ইংরাজ, অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও সংগ্রহ করে নিতে অসুবিধা হবে না। দশ দিন লেগে গেল গুছিয়ে বসতে। বেশ শক্ত-পোক্ত ঘর তৈরী হল নাম না জানা সমস্ত গাছের কাঠ দিয়ে। হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য উঁচু বেড়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পেটের জন্য বর্তমানে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। জাহাজের ভাঁড়ারে যা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে একবছর চলে যাবে। অবশ্য সুযোগ পেলেই খরগোস বা খাওয়া চলে এমন সমস্ত পাখি মারা হচ্ছে। ম্যাকগ্রে এবার চাষ আবাদের দিকে মন দিল। জমি তৈরী হতে লাগল। প্রাথমিক দুর্ভাবনাকে কাটিয়ে উঠেছে মেরী। এখন সে অনেক স্বচ্ছন্দ।

লোয়াঙ্গা আর তার সঙ্গীরা যে কোন ধরনের পরিশ্রমে পশ্চাদপদ নয়। তারা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল, উদার চেতা প্রভুর সঙ্গে

মানিয়ে চললেই তাদের মঙ্গল। পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন ভাবে এই দেশে বাঁচা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাবে কোন সাদার হাতেই—উদারতার পরিবর্তে তখন অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করতে হবে। এই ভাল—সুদূর বিদেশে এর চেয়ে ভাল আর কিছু আশা করা যায় না।

কয়েকদিন পরে আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েছে।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। তার উপর আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আজ আকাশে সূর্য্য হাসছে। চমৎকার দিন। প্রায় পঁচিশ একরের মত জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল। এখানে গম পোঁতার ইচ্ছে ম্যাকগ্রের। আকাশ পরিষ্কার হতেই সে নিজের লোকজন নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। এই জমিটুকু পরিষ্কার করতে তার দুমাস সময় লেগে গেছে।

মেরী রান্নার কাজে ব্যস্ত আছে। তাকে লিয়া সাহায্য করছে। লিয়া এখন ইংরাজী অনেক সড়গড় করে ফেলেছে। থাকে বেশীর ভাগ সময় মেরীর সঙ্গেই। হঠাৎ দুজনেই শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। কয়েকটি ঘোড়া যেন ঘরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কারা এল আবার? এখানে পা দেবার পর থেকে কোন নবাগতর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

মেরী ও লিয়া বেড়ার কাছে ছুটে গেল।

ক্ষুরের আওয়াজ ম্যাকগ্রের কানেও গিয়েছিল। সবিস্ময়ে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, তিনজন অশ্বারোহী তাদের ঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তিনজনের মধ্যে একজন বয়স্ক। তাঁর সাজ-পোষাক মূল্যবান। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এক নজরেই বুঝতে পারা যায়।

প্রবীন কাছাকাছি এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, আপনি কে ?

—বিল ম্যাকগ্রে।

· এখানে কি করছেন ?

—এখানকার কিছু অনাবাদি জমি চাষ উপযোগী করছি। আপনি— ?

—আর্থার হলওয়ে।

একটু থেমে আবার বললেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে। আপনি অনধিকার চর্চা করছেন। এই জমি আমার।

সচকিত হল ম্যাকগ্রে।

— আপনার ? আমার ধারণা হয়েছিল···

—এই অঞ্চলের দুহাজার একর জমি সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছি : সবটা কাজে লাগাতে পারি নি বলেই, এধারটা এখনও এই অবস্থায় পড়ে ছিল। আপনাকে নতুন মনে হচ্ছে। কোথা থেকে আসছেন ?

—ফলমাউথ থেকে।

আর্থার স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে বললেন, দুবার সুযোগ নষ্ট করেছি স্বদেশ ঘুরে আসবার। আমার ঠাকুরদাদা লণ্ডনের অল্প দূরের একটা গ্রাম থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন।

ম্যাকগ্রে বুঝতে পাচ্ছিল, মানুষ হিসাবে আর্থার হলওয়ে খুব খারাপ নন। অচিরেই সে সত্যি মিথ্যা জড়িয়ে এখানে আসার কারণ বর্ণনা করল। সস্ত্রীক যে এসেছে একথাও বলতে ভুলল না।

শেষে কুণ্ঠিতভাবে বলল, আমি মোটেই বুঝতে পারি নি, এই জমির কোন অধিকারী আছেন। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

মৃদু হেসে আর্থার বললেন, ক্ষমার কথা পরে আসছে। আগে বলুন তো এই নিগ্রোদের পেলেন কোথায় ?

—পথে সংগ্রহ করেছি। দাম একটু বেশী পড়েছে।

—দাস ব্যবসায়ীরা আজকাল ডাকাত হয়ে উঠেছে। ক্রেতাদের পকেট ভালভাবেই ঝেড়েঝুড়ে নিতে পারে। সংখ্যায় তো বেশ কয়েকজন দেখছি ?

—পঁচিশজন।

—আপনি ভাগ্যবান লোক। এমন শক্ত-সমর্থ দাস কাছে থাকলে কোন কাজেই পিছিয়ে পড়তে হয় না।

এরপর অনেক কথা হল। জানা গেল, আর্থার হলওয়ে ধনী এবং অকৃতদার ব্যক্তি। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে তাঁর খামার-বাড়ী। থাকেন অদূরের শহর রিচমণ্ডে। ইচ্ছে হলে মাঝে মধ্যে জমি পরিদর্শনে আসেন। যেমন গতকাল এসেছে। সকালে দুই কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, বহুদিন অদেখা এই অঞ্চলটির উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে যাওয়া।

আর্থারকে নিজের নবনির্মিত গৃহে নিয়ে গেল ম্যাকগ্রে।

মেরীকে দেখে তিনি খুশী হলেন।

মাত্রা বজায় রেখে রসিকতা করলেন তার সঙ্গে।

অনুরোধের চাপে পড়ে মধ্যাহ্নের আহার তাঁকে ওখানেই সারতে হল। আর্থার এত খুশী হয়ে পড়েছিলেন যে, জমির ব্যাপারে রফায় এসে গেলেন ম্যাকগ্রের সঙ্গে। স্থির হল, সামান্য অর্থের বিনিময়ে দেড়শ একর জমি আর্থার নবাগত স্বদেশবাসীকে ছেড়ে দেবেন। অবশ্য এই সঙ্গে দুজন দাসকে হস্তান্তরিত করতে হবে। কারণ বর্তমানে আর্থারের কিছু লোকাভাব চলছে।

বিদায় নেবার সময় ম্যাকগ্রে প্রশ্ন করল, কাছাকাছি কোন গীর্জা আছে! একজন ধর্মযাজক পেলে ভাল হত।

—এখান থেকে মাইল পনেরো উত্তরে আর্লিংটন। ওই ছোট শহরে ভজনালয় আছে। ধর্মযাজককে কি প্রয়োজন ?

—আমার দাসেদের যে সর্দার, তার বিয়ে দিতে চাই। মেয়েটি সঙ্গেই আছে।

চমৎকার। দাসদের প্রতি এত সহানুভূতি আমেরিকায় মোটেই দেখা যায় না। আপনার মত প্রভু পাওয়া ভাগ্যের কথা। শুধু ওই দুজনকে নয়, বাকী সকলকেও খৃষ্টান করে নেবেন। খৃষ্টানের সংখ্যা এই মহাদেশে যত বাড়তে থাকে ততই ভাল। একজন ধর্মযাজককে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আবার দেখা হবে।

আর্থার হলওয়ে অশ্বারোহণ করলেন।

·········পাতার সংখ্যা দেখে নিয়ে বই মুড়ে রাখলাম। ঘুমে চোখ ভরে আসছে বলেই আর পড়তে ইচ্ছে করল না। কব্জিতে বাঁধা সেণ্টার সেকেণ্ডে সি-মাষ্টারের দিকে তাকালাম, তিনটে বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। রাত শেষ হতে চলেছে, ঘুমের আর অপরাধ কি ?

জেফ্রির ঠাকুরদাদা সেকেলে লোক হলেও, এমন সাবলীল ভাষায় লিখেছেন যে, পাতার পর পাতা দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়। বইটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে নিয়ে আমি সোফা ছেড়ে উঠলাম। রেমার্ক পাশ ফেরা অবস্থায় একটু কুঁজো হয়ে শুয়ে আছে সোফা কাম বেডের উপর। গভীর ঘুমে অচেতন।

আমি হাই তুললাম। আড়ামোড়া ভেঙ্গে এগিয়ে গেলাম জানলার দিকে। অল্প পর্দা সরাতেই উপর দিকে দৃষ্টি পড়ল, কুয়াশার লেশ মাত্র নেই। নক্ষত্রখচিত ঝকঝকে আকাশ। এবার তাকালাম নীচের দিকে। রাত তৃতীয় প্রহর, তবু নীচে বহু নীচে প্রশস্ত পথের উপর দিয়ে ধাবমান গাড়ীর সংখ্যা অল্প নয়। এখান থেকে যন্ত্রযানগুলিকে খেলনার গাড়ী বলে মনে হচ্ছে।

আমি সরে এলাম জানলার পাশ থেকে। জেফ্রির পূর্বপুরুষ লোয়াঙ্গা এখন আমার মনের আনাচে কানাচে ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। কি সমস্ত দিনই গেছে। আজকের সুসভ্য আমেরিকায়

বসে ভাবতে কষ্ট হয়, এককালে দাস ব্যবসা কি ফলাও আকার ধারণ করেছিল। সেই সমস্ত দাসের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়াতেই ছিল বাহাদুরী।

সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে বলতে হবে, লোয়াঞ্জার ভাগ্য অনেক প্রসন্ন ছিল। বিল ম্যাকগ্রের মত সহৃদয় কর্তা পাওয়ায় তাকে অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি। ম্যাকগ্রের দাসদের প্রতি ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দীর দাম্ভিক প্রভুরা নিশ্চয় বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করে গেছেন। আমি অতীতের কথা ভাবতে ভাবতেই রেমার্কের পাশে এসে শুয়ে পড়লাম।

চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। ঘুম এল বলে।

## ॥ দুই ॥

নিউইয়র্কে আমার থাকার দিন শেষ হল।

গত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রেমার্কের সঙ্গে এমন গভীর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে যে তাঁকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। অবশ্য আশার কথা, আমেরিকায় আমার দুবছরের অবস্থানের মধ্যে কয়েকবার নিউইয়র্কে আসার সুযোগ পাব। দেশেও ফিরতে হবে এই পথ হয়ে।

বিমান বন্দরে আমাকে বিদায় দিলেন রেমার্ক।

বলা বাহুল্য তিনিও বেশ মনমরা।

রানওয়ের উপর দিয়ে দীর্ঘ-দৌড় শেষ করে বিমান উপরে উঠল। আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই, সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। নীচের দিকে তাকিয়ে রেমার্ক বা অন্য কাউকে দেখতে পেলাম না, বিমান বন্দর দ্রুত চলে গেছে চোখের আড়ালে।

আমি নিজের শরীর ডুবিয়ে দিলাম আরামদায়ক আসনে। নিউইয়র্কের বাসের দিনগুলির কথাই ভাবছিলাম। দেখতে দেখতেই কেটে গেল। জেফ্রির কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। আসার আগে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ধরা গলায় বলেছিল, আমাকে এত বেশী করে মনে না রাখলেই ভাল করতেন স্যার।

—কেন ?

আমিও কম অবাক হলাম না।

—আপনি এসেছেন এদেশে কাজ নিয়ে।

—তাতো এসেইছি !

—নিগ্রোদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। কম্পানির কর্তাদের চোখ লাল হয়ে উঠবে। তাঁদের

আভিজাত্যে ঘা পড়বে কিনা। যাদের কালো চামড়া তারা তো মানুষ নয় স্যার, আমেরিকায় তারা শুয়োর ছাগলের সামিল।

কি উত্তর দেব প্রথমে ভেবে পেলাম না।

তারপর বললাম, আবার নিউইয়র্কে এলে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

—যদি বেঁচে থাকি তবেই দেখা পাবেন।

—একথা বলছো কেন ?

—শরীর আর বইছে না স্যার। মনে হচ্ছে কবরের দিকে আমার পা একটু বেশী এগিয়ে গেছে।

তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জেফ্রি বলল, যেতে দিন ও কথা। আমার ঠাকুর্দাদার বইখানা পড়েছিলেন ?

—প্রায় অর্ধেকটা পড়ে ফেলেছি। ভাল লাগছে।

—শেষ করুন। আমেরিকার সাদাদের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। আরেকটা কথা স্যার—

—বল ?

—আমাদের পক্ষ নিয়ে বেশী মাতামাতি যেন এখানে করবেন না। সাদা হিংস্র ভল্লুকরা আপনাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবে। দেশে ফিরে গিয়ে বরং আমাদের দুর্দশার কথা খবরের কাগজে লেখবার চেষ্টা করবেন।

জেফ্রিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পাচ্ছি না। ঘুরে ফিরেই তার কথা মনে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ নির্যাতিতদের মধ্যে একমাত্র ওকেই তো চিনি। বিচিত্র এই দেশ, এক দিকে উদারতার উৎস, অন্য দিকে মানবিকতার উপর বিরামহীন ব্যভিচার। লিঙ্কনের মত মানুষ আবার কবে হোয়াইট হাউসে আসন গ্রহণ করবেন কে জানে ?

জানলার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করলাম। আকাশের দিকে এক ঘেয়ে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকব ? ভাল লাগল না। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই দৈনিক পত্র বা পত্রিকায় মনযোগী

হয়েছেন। আমিও জেফ্রির ঠাকুর্দাদার লেখা বইখানির পাতা ওল্টাতে লাগলাম। অর্ধেকের বেশী পড়া হয়ে গেছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে, আমেরিকায় থাকতে থাকতেই এই বই-এর বাংলা অনুবাদ করে ফেলি। দেশে ফিরে ছাপবার চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে নিজের অক্ষমতার কথা। দু লাইন কবিতাও যে কখন লেখেনি, সে অনুবাদের কাজ কি ভাবে করবে?

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় দৃষ্টি আটকাল অবশ্য টিক মার্কা করা জায়গাতেই। অর্থাৎ আগের পাতা পর্যন্ত পড়া হয়ে গেছে। পরিচ্ছেদের প্রথম লাইনটি হল চিঠির গোছা হাতে নিয়ে অ্যাব্রাহাম কি যেন ভাবতে ভাবতে এগুচ্ছিলেন।

ইলিনয়ের লোকেরা অ্যাব্রাহমকে অনেষ্ট এব্ বলে উল্লেখ করে থাকে। পথ নির্জন। ঝাঁকড়া এক ওক গাছের তলা দিয়ে এব চলেছেন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, তাঁর দীর্ঘ হাড় সর্বস্ব শরীর যেন দুলতে দুলতে এগুচ্ছে। জ্যাক মরিসনের পানশালার দিকেই তিনি এগুচ্ছেন মনে হয়। এই সময় ওখানে অনেকে জমায়ত হয়। বাড়ী বাড়ী না গিয়ে চিঠি বিলি করার অনেক সুবিধা। ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহই উনি একবার করে ওখানে যান।

হঠাৎ এব-এর চিন্তা স্রোত বাধা পেল।

দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে আসছে পিছন দিক থেকে। এব দ্রুত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, স্বাস্থ্যবান এক নিগ্রো তরুণ ভীতভাবে ছুটতে ছুটতে আসছে। তার পিছনে দুজন বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ—তারা নিশ্চিত ভাবে তরুণকে ধাওয়া করে আসছে। দুজনের হাতেই বন্দুক।

প্রকৃত ঘটনা কি এব সহজেই অনুমান করলেন। নিগ্রো দাস অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালাচ্ছে, প্রভুরা ব্যাপার আঁচ করেই তাকে তাড়া করেছেন তাকে ধরে ফেলার জন্য। কিন্তু এদৃশ্য তো আজকাল এখানে দেখা যায় না। ইলিনয় আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে

অবস্থিত। উত্তরের মানুষরা তো দাসত্ব প্রথাকে বেশ কিছুদিন থেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।

নিগ্রো তরুণ তাঁর কাছে এসে পড়েছিল। দারুণভাবে হাঁপাচ্ছে সে। তার বিশাল বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। ভারী মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঘামের স্রোত। সে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। এবং বাধা দিলেন।

—দাঁড়াও—

—ওরা আমাকে ধরতে আসছে।

—দেখেছি।

তাঁর কথা উপেক্ষা করেই তরুণ এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হল না—মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। এব অবশ্য গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। অসম্ভব বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। ততক্ষণে বন্দুকধারীরাও এসে উপস্থিত হল। দৌড়ে আসার দরুণ তাদের অবস্থা সঙ্গীন।

এব গম্ভীর গলায় বললেন, অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। আইন ভঙ্গ করার দায়িত্ব অনেক।

একজন দম নিয়ে, বিরক্তির সুরে বলল, কি সমস্ত বলছেন। একটা নিগ্রোকে যদি মেরে ফেলেই থাকি তাতে কি যায় আসে?

দ্বিতীয়জন বন্দুকের নলের খোঁচায় তরুণের উপুড় হয়ে যাওয়া দেহ সোজা করে বলল, মরেনি। কাঁধের একটু ছাল উঠে গেছে বোধহয়। ম্যাক, দেখছো কি? ব্যাটাকে তুলে নিয়ে চল।

এব বললেন, আপনাদের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। একে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন না।

—কি বলতে চাইছেন?

—বুঝতে না পারার মত ঘোরাল কিছু আমি বলিনি।

—আপনি আমাদের পরিচিত নন। একটা নিগ্রোর জন্য কেন মিথ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করছেন?

—আমি জানতে পারি কি আপনারা কোথাকার লোক ?

—টেক্সাসে আমাদের বাড়ী।

—অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী।

—হ্যাঁ।

এবার দৃঢ় গলায় এব বললেন, ইলিনয় যে উত্তরাঞ্চলের শহর তা বোধহয় আপনারা মনে রাখেন নি ? এখানে দাসত্ব প্রথাকে ঘৃণা করা হয়। নিগ্রোদের আমরা মানুষ বলে মনে করি।

আগন্তুক দুজন রাগে গরগর করছিল। কিন্তু জোর জুলুম করে কিছু করার সাহস তাদের হল না। কারণ গুলির শব্দ পেয়ে বেশ কয়েকজন এসে পড়েছিল। তারা অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল সমস্ত কিছু।

দুজনের মধ্যে একজন বলল, ওর বাপকে আমি কিনেছিলাম।

—হতে পারে।

—ওর উপর আমার দাবী আছে।

—ও সমস্ত পুরানো প্রথা এখন অচল। আপনারা আর কথা বাড়াবেন না। আমি এবার ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাই।

এব অদূরের জনতার দিকে তাকালেন এবার। সকলেই পরিচিত। একজনকে হাতছানি দিয়ে বললেন, ডাগলাস, শোন একবার। একে ধরাধরি করে ডাঃ জোন্সের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ডাগলাস এগিয়ে এল।

শুধু ডাগলাস নয় আরো কয়েকজন।

আগন্তুকদের একজন রাগে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করল, আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?

—নিশ্চয়।

মৃদু গলায় এব বললেন, জাঁদরেল কোন পরিচয় আমার নেই। এখানকার পোষ্টমাষ্টার। আমার নাম অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন।

এই পর্যন্ত পড়ে আমি বই বন্ধ করলাম। এই তাড়াহুড়োর মধ্যে নয়। লস এঞ্জালসে গিয়ে নিরিবিলিতে বেশ তারিয়ে তারিয়ে

পড়তে হবে। ওভার নাইট ব্যাগের মধ্যে বইখানা ভরে ফেলে তাকালাম এধার ওধার। নিশ্চিন্ত, নিশ্চুপ পরিবেশ। অবশ্য প্লেনের মৃদু যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। রিষ্টওয়াচের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব।

নেশা আমাকে উতলা করে তুলল। অনেকক্ষণ ঠোঁটের আগায় সিগারেট তুলতে পারিনি। আমি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। প্যাসেঞ্জার কেবিন ছেড়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম স্মোকিং স্পেসে। জনা তিনেক সেখানে ধোঁয়ার জাল বুনছিলেন। মৃদু গলায় আলাপ-আলোচনাও চলছিল। বলা বাহুল্য আলোচনার বিষয় আগামী মার্কিন নির্বাচন। কেনেডি কি নিক্সন—কে যাবেন হোয়াইট হাউসে।

আমি সোফার একপাশে বসে পড়ে পলমল ধরালাম। নিউইয়র্কে বহুল প্রচারিত এই সিগারেট তেমন কড়া নয়। নির্বাচনী আলোচনায় আমার কান ছিল না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমি লোয়াঙ্গার কথা ভাবছিলাম। জেফ্রির সেই পূর্বপুরুষ, যে দাসত্বের তিলক কপালে এঁকে পৌনে দু'শতাব্দী আগে আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছিল।

আর জলদস্যু জীবনে ফিরে যায়নি বিল ম্যাকগ্রে। মেরীর আগ্রহ আর আকর্ষণ তাকে গার্হস্থ্য জীবনেই আটকে রাখল। এতদিন পরে এখানে মেরী পুত্রের জননী হল। বিস্ময়ের বিষয় মাত্র পনেরো দিন পরে লিয়াও একটি স্বাস্থ্যপুষ্ট বাচ্চা উপহার দিল লোয়াঙ্গাকে।

একটি ইংরাজ ও একটি নিগ্রো দম্পতির জীবন স্বচ্ছন্দখাতে বয়ে চলল। আমেরিকায় তখন ক্রীতদাসদের উপর নির্মম অত্যাচারের ঝড় বইতে থাকলেও, ম্যাকগ্রে কখনই লোয়াঙ্গা বা তার সঙ্গীদের সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করেনি। বরং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় যে সমৃদ্ধি লাভ করা গেছে তার জন্য সে কৃতজ্ঞ।

পোটোম্যাক নদীর তীরবর্তী ওই নির্জন অঞ্চল ক্রমেই বসতিপূর্ণ

হয়ে উঠতে লাগল। নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে উর্বরা জমির আকর্ষণে কিছু কিছু মানুষ তো এলই—বহু দূরবর্তী ইংল্যাণ্ড থেকেও জুজাহাজ বোঝাই ইংরাজ এসে উপস্থিত হল। নাম গোত্রহীন জংলা অঞ্চল অচিরেই খ্যাতিলাভ করল গ্রেটাউন-এর নামে এক নদী বন্দর হিসাবে।

কালস্রোতে জীবন যৌবন যেমন ভেসে যায়, মৃত্যুও আসে তেমনই নির্দিষ্ট সময়ে। পরিণত বয়সে ম্যাকগ্রে মারা যাবার পর, বাড়ীর কর্তা হয়ে বসল তারই ছেলে গ্যারি। লোয়াঞ্জা অবশ্য মারা গেল অতি বৃদ্ধ বয়সে। তার ছেলে ক্যারি, বাপের মতই বিশাল দেহী আর কর্মঠ। গ্যারির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তো বটেই। খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করায়, লোয়াঞ্জা ছেলের নাম রেখেছিল কারাড। ছোট করে ক্যারি। মালিকপুত্র গ্যারির সঙ্গে মিলও রইল।

মেরী ও লিয়া ছেলেদের মুখ চেয়ে বেঁচে রইল।

এর পরের বেশ কয়েক বছরের ইতিহাস অস্পষ্ট। লোয়াঞ্জার নীম্নতম দু তিন পুরুষ কি ভাবে দিন কাটিয়েছিল তার ইতিহাস পাওয়া যায় নি। সঠিক বিবরণ কেউ লিখে রাখেনি বলেই এই অবস্থার সৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত লোয়াঞ্জার চতুর্থ পুরুষ উইলি জ্যাকসানের সন্ধান পাওয়া যায়।

উইলি ম্যাসাচুস্টেসের ধনাঢ্য কার্পাস ব্যবসায়ী হেনরী বোলসের ক্রীতদাস। উদয়অস্ত খেটেও সে মালিকপক্ষর মন জয় করতে পারেনি। নির্দয় প্রহারে জর্জরিত হওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ম্যাকগ্রের পরিবারের আওতা থেকে সে যে কিভাবে ছিটকে এতদুর এসে পড়েছে তার ইতিহাস সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নয়।

······ভাবতে ভাবতে আমি পর পর দুটো সিগারেট পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সময় হয়ে এসেছে। যে কজন এখানে ছিলেন তাঁরা ইতিমধ্যেই চলে গেছেন। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। স্মোকিং স্পেস ছেড়ে আমি নিজের সিটে ফিরে এলাম।

আমাদের ডিসি ফোর তখন নামার মুখে। জানলা দিয়ে নিচের দিকে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছবির মত দেখাচ্ছে লস এঞ্জালসকে। আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ নগর। এখানেই আছে বর্ণাঢ্য হলিউড। আছে, সিনেমা জগতের প্রখ্যাত পুরুষ ওয়াল্টার ডিসনের অপূর্ব সৃষ্টি ডিসনেল্যাণ্ড। স্থির করে রেখেছি, প্রথম সুযোগেই ডিসনেল্যাণ্ড দেখে আসবো।

গোছ-গাছ করার কিছু ছিল না। কার্গো সিপে আমার মাল আগেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। ওভারনাইট ব্যাগটি কোলের উপর তুলে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলাম। মিনিট পনেরো পরে আমাদের প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করল। তারপর দৌড় শেষ করে ঝাঁকুনি খেয়ে থামল।

কিছুটা দুশ্চিন্তা নিয়ে নামলাম প্লেন থেকে। এখন আমার মনের অবস্থা নিউইয়র্কে পা দেবার সময়কার মত। সম্পূর্ণ অজানা জায়গা। অবশ্য রেমার্ক তার করে দিয়েছেন এখানকার অফিসে। কেউ না কেউ আমাকে নিশ্চয় নিতে আসবে। সে যদি আমায় চিনতে না পারে তবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে যে বেশ বেগ পেতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

মন্থর পায়ে রানওয়ে পার হয়ে বিমান বন্দরের মূল বাড়ীর মুখে পৌঁছালাম। অন্যান্য যাত্রীরা অনেক আগেই এই পথটুকু অতিক্রম করে গেছেন। তাঁদের ব্যস্ততা আছে, আমার নেই।

—ক্ষমা করবেন—

চমকে উঠেছিলাম।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, একজন প্রগাঢ় যৌবনা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে আবার বলল, মিঃ ব্যানার্জী—আমি বোধহয় ভুল করছি না?

এবার আমার অবাক হবার পালা।

—ঠিকই অনুমান করেছেন! কিন্তু আপনি—

—আমি হিল্ডা ডেভিস। মিঃ স্যামুয়েল গ্রাণ্টের সেক্রেটারী।

স্যামুয়েল গ্রাণ্টের নাম আমার অজানা নয়। আমাদের প্রধান কারখানার উৎপাদন বিভাগের বড়কর্তা তিনি। তাঁর সেক্রেটারী সুন্দরী হবে তাতে আর সন্দেহ কি। তবে সেই মনোরমা আমাকে রিসিভ করতে যে বিমান বন্দরে আসবে ভাবতে পারিনি। তা না হয় হল। কিন্তু মহিলা আমাকে চিনে ফেলল কি ভাবে?

—আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি।

—কেন?

—অবাক হবার মত কথা নয় কি? আগে কখনও দেখেন নি, অথচ এক নজরেই চিনে ফেললেন আমাকে?

—একজন ভারতীয়কে চিনে নেওয়া এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। তা ছাড়া আপনার চেহারার বিবরণ এবং আপনি কি রং-এর স্যুট পরে আসছেন তার বর্ণনা তার করে নিউইয়র্ক থেকে জানান হয়েছিল। আসুন—

আমরা দুজন এগুলাম।

—কোথায় যাচ্ছি?

—বাইরে গাড়ী অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু মিস—

—হিল্ডা ডেভিস।

—মিস ডেভিস, আমি আমার মাল-পত্তরের কথা বলছিলাম। সেগুলো খালাস করার ব্যবস্থা করলে ভাল হত না।

—সে ব্যবস্থা হবে। স্লিপটা আমায় দিন।

আমি পকেট থেকে স্লিপ বার করে হিল্ডার হাতে দিলাম। ক্রমে আমরা দুজন কারপার্কের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। নিউ-ইয়র্কের যে কোন জায়গায় যে গাড়ীর ভীড় দেখেছি তার তুলনায় কম। চেষ্টনাট-কালারের লম্বা ধরনের চমৎকার এক গাড়ীতে গিয়ে

বসলাম। একজন মধ্যবয়স্ক লোক আগে থেকেই সেখানে ছিল। হিল্ডা মাল খালাসের স্লিপ তাকে দিতেই সে অদৃশ্য হল।

গাড়ী সচল হল।

হিল্ডাই চালাচ্ছে। গাড়ী যত এগুতে লাগল, নয়নাভিরাম লস এঞ্জালস তত বেশী আমার কাছে প্রতিভাত হতে লাগল। কত অর্থের বিনিময়ে এ সমস্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তার হিসাব কষে বার করাও বোধহয় অসম্ভব ব্যাপার।

কেমন দেখছেন ?

মৃদু হেসে বললাম, আমি গরীব দেশের মানুষ। এত চাকচিক্য আমাদের নেই। এখানে যা দেখছি তাই ভাল লাগছে।

—এখানে এমন অনেক কিছু দেখবেন যা নিউইয়র্কেও নেই।

—জানি। এ রাস্তার নাম কি ?

—জেফারসন বুলভার্ড।

—আমরা চলেছি কোথায় ?

—বাঙ্কার হিল এভিনিউ-এ কম্পানির একটা বাড়ী নেওয়া আছে। তাতে দুকামরার মোট ফ্ল্যাট আছে আড়াইশোটা। তারই একটায় আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

—আপনিও ওখানে থাকেন নাকি ?

—হ্যাঁ। চাবিটা নিন।

—চাবি !

—আপনার ফ্ল্যাটের চাবি।

আমি হিল্ডার হাত থেকে চাবি নিলাম। লম্বা সাইজের স্টিলের চাবি। উপরকার চওড়া অংশে সাতানব্বই নম্বর খোদাই করা রয়েছে। অর্থাৎ সাতানব্বই নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা এই চাবি দিয়ে খোলা যাবে। আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হল না। মিনিট পঁচিশের মধ্যেই ডাউন-টাউন লস এনজেলসে পৌঁছে গেলাম। তারপর গাড়ী এসে থামল সেই ফ্ল্যাট বাড়ীর সামনে।

হিল্ডার পিছু পিছু ভেতরে গেলাম।

লিফটের সামনে পৌঁছে সে বলল, নিজের ফ্ল্যাটে একা পৌঁছাতে নিশ্চয় কোন অসুবিধা হবে না ?

—অসুবিধা কিসের ?

—ঠিক আছে। চলে যান। এখন আপনার বিশ্রাম দরকার।

নিউইয়র্কে কিছুদিন থাকায় সমস্ত সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে আমার কোন অসুবিধাই হল না। মাঝারি সাইজের ওয়েল ফার্নিস্‌ট ঘর। অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও বর্তমান। দুখানি ঘর আমার পক্ষে অতিরিক্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আমি একা মানুষ, এত জায়গা নিয়ে কি করব ভেবে পেলাম না।

কোট হ্যাঙ্গারে আটকে গা এলিয়ে দিলাম সোফায়। নানা কথা ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরালাম। কয়েক টান দেবার পরই মন ভেসে গেল কয়েক হাজার মাইল দূরে। বিহারের সেই ছোট্ট শহর—বাড়ীর কথা কয়েকদিন থেকে বার বার মনে পড়ছে। অবশ্য এতে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই।

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে সময়ের হিসাব করলাম, এখন মুঙ্গেরে সন্ধ্যা উতরে গেছে। আটটা হবে। বাবা দোতলায় নিজের শোবার ঘরে ইজি চেয়ারে বসে নিশ্চয় রেডিও শুনছেন। মা আর পাপ্পুর মধ্যে বোধহয় লুডো খেলা চলেছে। লেখা—লেখা এখন বাবার রাতের খাবার সাজাতে ব্যস্ত। এক আধদিন নয়, পুরো দুটি বছর পরে আবার সকলের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সিগারেটের টুকরো ক্রমেই ছোট হয়ে এল।

সোফা ছেড়ে উঠে আমি ম্যান্টিল পিশের কাছে এগিয়ে গেলাম। অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিয়ে এবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ঘরখানা। তারপর কুকিং স্পেশে গেলাম। ওখানে পা দেবার পর একটা কথা মনে পড়তেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

নিউইয়র্কে রেমার্ক ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা চিন্তা করতে হয়নি। এখানে আমি সম্পূর্ণ একা।

জীবনে রান্না করা দূরের কথা, উনুনের পাশে গিয়ে কখনও দাঁড়িয়েছি কিনা সন্দেহ। এখানে প্রতিদিন পেটকে শান্ত করার ব্যবস্থা করব কি ভাবে? মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম। আসার আগে, মামুলি ধরনের ছচার পদ কি ভাবে রান্না করতে হয় লেখার কাছ থেকে শিখে এলে ভাল হত।

নিয়মিত যে হোটেলে খাব তার উপায় নেই। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সমস্ত উঁচু সুরে বাঁধা। খরচে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। অগত্যা সিদ্ধ ডিমের উপর নির্ভর করে দিন কাটাতে হবে। আমি বিমর্ষ ভাবে ঘরে ফিরে আসার পরই কলিং বেল বেজে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

এয়ারপোর্টের বাইরে কার পার্কে দেখা সেই মধ্য বয়স্ক লোকটি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার স্যুটকেশ ছুটি তার পায়ের কাছে নামানো। ট্রাঙ্কটি নেই দেখে, স্বাভাবিক কারণেই বেশ অবাক হলাম।

সে ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল, দেশ থেকে অনেক কিছু ভরে এনেছেন মনে হচ্ছে ট্রাঙ্কে। ভীষণ ভারী। কেয়ারটেকারের জিম্মায় রেখে এসেছি। এখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা সে করবে।

—ধন্যবাদ। বসুন।

—এখন আর বসব না। একটু তাড়া আছে। ভাল কথা, এবেলা খাওয়ার পাট তিপ্পান্ন নম্বর ফ্ল্যাটে গিয়ে চুকিয়ে আসতে হবে। এই রকম ব্যবস্থাই করা আছে।

—তিপ্পান্ন নম্বর ফ্ল্যাট!

—হিল্ডা ডেভিস ওখানে থাকেন। রাত্রি থেকে আপনাকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে হবে।

আমি বললাম, কিভাবে যে ব্যবস্থা করব সেটাই হল সমস্যা।

—কেন?

—আমি রান্না-বান্না একেবারেই করতে পারি না।

—তাতে কিছু যাবে আসবে না। প্যাকটিন আর ড্রাই ফুডের প্যাকেট যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আর ভাবনা কি। প্রয়োজন বোধে একটু গরম করে নিতে পারেন বা ভেজে নেওয়া চলতে পারে—ব্যাস। ওই সমস্ত খাবার সর্বত্র পাবেন। এমন কি এই বাড়ীর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে যে ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আছে তাতেও পাওয়া যায়।

একথা যে কেন আগে আমার মনে আসেনি বুঝলাম না। নিউইয়র্কে রেমার্ককে তো দেখেছি—তিনি প্রায়ই ওই ধরনের খাবার নিয়ে আসতেন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। এবার লস এনজেলসকে দারুন ভাল লাগতে লাগল।

—একটু হাল্কা হওয়া গেল।

লোকটি মৃদু হেসে বিদায় নিল।

আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে টিভির সামনে গিয়ে বসলাম। এখানকার হালচাল একটু দেখা যাক। সংবাদপত্রে দেখেছিলাম, কালিফোর্নিয়ার প্রাথমিক ভোটে ডেমোক্রাট প্রার্থী বব কেনেডি এগিয়েছেন। আমেরিকানরা রবার্ট কেনেডিকে আদর করে বব বলে ডাকে। নির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু দেখতে পেলে ভাল হয়। কেন জানি না আমি চাইছিলাম, বব মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ে বসুন।

টিভির নব ঘোরালাম।

সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে।

কাজ-কর্ম আরম্ভ করেছি। শহরের উপকণ্ঠে কারখানা। সে এক এলাহি ব্যাপার। আট ঘণ্টা ওখানে থাকতে হয়। মিনিবাসের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আমিও মিনিবাসে চেপে প্রতিদিন যাই। সত্যি কথা বলতে কি, কাজ করে এত আরাম আমি আগে আর কখনও পাইনি।

ইতিমধ্যে একদিন হলিউডের আনাচে-কানাচে ঘুরে এসেছি। মেট্রো গোল্ড্‌উইন মেয়র ষ্টুডিওর ভেতরেও গিয়েছিলাম। অনুমতিপত্র অবশ্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। কোন সামাজিক বই-এর সুটিং হচ্ছিল। প্রখ্যাত রিচার্ড বার্টন ফ্লোরে ছিলেন।

আজ ছুটির দিন ছিল।

বেড়িয়ে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছি। তারপর বাড়ীতে চিঠি লেখা শেষ করতে এক ঘণ্টা সময় নিলাম। অনেক কিছু লিখতে হল। আড়ামোড়া ভেঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাব, দৃষ্টি পড়ে গেল জেফ্রির ঠাকুর্দাদার লেখা বইটির উপর। এ কদিনে আর একপাতাও পড়তে পারিনি।

তুলে নিলাম হাতে।

কাল সকালে ওঠার তাড়া নেই। এখানে সপ্তাহে দুদিন ছুটি। যত রাতই হোক বই-এর বাকী অংশ শেষ করব। বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে, টেবিল ল্যাম্প জ্বাললাম। ল্যাম্প মাথার গোড়ায় রেখে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। লস এনজালেসের পথ-ঘাট অবশ্য তখন হাস্যে-লাস্যে ঝলমল করছে।

প্লেনে যে পর্যন্ত পড়েছিলাম তারপর থেকে আরম্ভ করলাম—

॥ ক ॥

……উইলিকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল, আঘাত তেমন গুরুতর নয়। হাঁটুর নীচের চামড়া ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। অবশ্য প্রচুর রক্তপাত হওয়ার দরুন কালো ছেলেটি এখনও অজ্ঞান। চিকিৎসার সমস্ত রকম ব্যবস্থাই করা হল।

জ্ঞান ফিরে আসার পর লিঙ্কন উইলিকে নিয়ে গেলেন নিজের আস্তানায়। অতি সাধারণ অবস্থা। জীর্ণ দুটি ঘরে তাঁর ওঠা-বসা। দৈন্যতার ছত্রছায়ায় কোন রকমে টিকে আছেন বলা যায়। উইলির ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা হয়তো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়, একথা অনুভব করেও লিঙ্কন পিছিয়ে পড়তে পারেন নি—তাঁর সংবেদনশীল মন তাঁকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

জ্ঞান হবার পর উইলিকে গরম দুধ খেতে দিয়ে, তিনি জানতে চাইলেন তার অতীতের কথা। উইলি যা বলল তার সারমর্ম হল, ঠাকুর্দাদার কথা মনে পড়ে না। তবে তার বাবা জর্জিয়ার রেনল্ড স্মিথের দাস ছিলেন। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হত সেখানে। তবে একবার প্রায় মরণের মুখ থেকে স্মিথকে ফিরিয়ে আনার দরুন পরিস্থিতি পালটে গেল। স্মিথ উইলির বাবাকে মুক্তি দিলেন। তবে রোহান —উইলির বাবা তাঁকে ছেড়ে চলে না গিয়ে ওখানেই থেকে যান। জমির কাজকর্মে সহায়তা করতে থাকেন। এরপর একরকম সুখেই দিন কাটতে থাকে।

রোহান মারা যাবার পর পরিস্থিতির হেরফের হয় না। উইলি স্মিথকে কাজকর্মে সহায়তা করতে থাকে। তিনি তাকে কিছু কিছু হাতখরচও দিতেন। মাসছয়েক আগে তাঁর দুই বন্ধু জরীপের কাজে

বেরুবার মুখে জনাচারেক নিগ্রো চাইলেন বিদেশে তাঁদের সুখ-সুবিধার উপর নজর রাখবে বলে।

স্মিথ উইলি এবং আরো তিনজনকে তাঁদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন, এবং বলে দিলেন, ক্রীতদাস বলতে যা বোঝায় এরা এখন আর তা নয়। এদের প্রতি যেন সদয় ব্যবহার করা হয় এবং হাত খরচ দেওয়া হয় নিশ্চিতভাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। জোর করে তাদের গলায়, ক্রীতদাসের পরিচয়সূচক চাকতি এঁটে দেওয়া হয়। চাবুক মেরে মেরে তাদের দিয়ে কাজ করাতে থাকেন জরীপ কর্মী দুজন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্প্রিংফিল্ডের কাছাকাছি আসবার আগেই তিনজন অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পালায়। এরপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে উইলিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে থাকে ওরা দুজন। ইলিনয়ের কাছে এসে আর থাকতে পারে না সে। প্রাণ হাতে করেই পালাতে থাকে। তারপর—

সমস্ত শুনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন লিঙ্কন। মনুষ্যত্বের উপর এইভাবে বলৎকার আর কতদিন চলবে আমেরিকায়? কোন নিগ্রো স্বেচ্ছায় এখানে আসেনি, তাদের মাতৃভূমি থেকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে—মানুষ তাদের কিনছে দরাদরি করে গরুছাগলের মত। সমস্তই কষ্টসাধ্য কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তারপর আবার অমানুষিক অত্যাচার কেন?

দাসপ্রথার উগ্র সমর্থক হল আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা। ওখানকার তুলোর চাষে নিগ্রোরা অপরিহার্য। অথচ চাবুকের ঘায়ে তাদের যে যত বেশী জর্জরিত করতে পারে সমাজে সে তত বেশী বাহবা পায়। লিঙ্কন এই অবিচারের শেষ চান। নিগ্রোরা এদেশে কিভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার সূত্র খুঁজতে খুঁজতে রাত ভোর করে দিয়েছেন কতবার। যদিও তিনি জানেন তাঁর ক্ষমতা সীমিত; তাই সময় সময় আক্ষেপ জাগে মনে। যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা কিন্তু প্রকৃত আসনে মনুষ্যত্বকে বসাবার কোন চেষ্টাই করছেন না।

লিঙ্কন অবশ্য জানেন না—কি ভাবেই বা জানবেন, আজ যে জন্য আক্ষেপ করছেন, সেই বিষয়টিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য পরম পুরুষ তাঁকেই মনোনীত করেছেন। যা হোক, লিঙ্কন আর নিজের আস্তানায় অপেক্ষা করলেন না। এখন তাঁর অনেক কাজ। এই ছোট জনপদটির তিনি শুধু পোষ্টমাষ্টার নন, চিঠি বিলিও তাঁকেই করতে হয়। উইলি আজ থেকে যে তাঁর কাছে থাকবে এসম্পর্কে দ্বিধার আর কোন অবকাশ নেই। চিঠির ব্যাগ নিয়ে তিনি বেরুলেন।

রাট্‌লেজ সরাইখানায় তেমন লোক সমাগম তখনও হয়নি। স্থানীয় আদালতের বিচারপতি গ্রীন, জোস্যুয়া স্পীড এবং স্প্রিংফিল্ড থেকে আগত নিনিয়ান এডওয়ার্ডস একটি টেবিলকে কেন্দ্র করে, হুইস্কির স্বাদ নিতে নিতে কথাবার্তা বলছেন।

তাঁদের আলোচনার বিষয় হল আগামী নির্বাচন। ইলিনয় ষ্টেটের বিধান পরিষদে কাকে প্রার্থী দেওয়া যায় নিউ সালেম থেকে সেই সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে নিনিয়ান এডওয়ার্ডস স্প্রিংফিল্ড এখানে এসেছেন। ইলিনয়ের গভর্ণর হলেন তাঁর জনক।

গ্রীন বলছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে এই ছোট শহরটিকে অতি সাধারণ মনে হলেও, এখানকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না মিঃ এডওয়ার্ডস।

—দক্ষিণের এই জনপদগুলি যে ক্রমেই উন্নতির পথে চলেছে তা আমি জানি মিঃ গ্রীন। তবে হুইগ পার্টি সম্পর্কে—

এডওয়ার্ডসের কথা শেষ হবার আগেই জোস্যুয়া স্পীড বললেন, তবে হুইপ পার্টির উপর এখানকার কিছু লোক সন্তুষ্ট নয়। তাদের মতে এই দল হল ধনীসমাজের মুখপাত্র।

গ্রীন বললেন, তুমি কি চ্যাংড়া ছোকরাদের কথা বলছো ?

—ঠিক ধরেছেন। তবে ওরা শুধু চ্যাংড়া নয়, অত্যন্ত বদ প্রকৃতির।

—ওধরনের লোক সব জায়গায় কিছু কিছু আছে—এডওয়ার্ডস বললেন, তাই আমার পরিকল্পনা হল নিউ সালেম থেকে এমন একজন প্রার্থী মনোনীত করা হোক, যে সাধারণ শ্রেণীর—দরিদ্র হলেও ক্ষতি নেই। তবে অবশ্যই ভদ্র, ভাল বক্তা এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। এমন কেউ আছে নাকি ?

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে স্পীড বললেন, এমন একজন মাত্র ব্যক্তিই নিউ সালেমে আছে। যাকে আপনার অবশ্যই পছন্দ হবে।

—কে সে ?

স্পীড কিছু বলার আগেই রান্নাঘরের দরজা পেরিয়ে অ্যান ওঁদের কাছে এসে দাঁড়াল। অ্যানকে চমৎকার দেখতে। মানানসই স্বাস্থ্য। তবে এই বয়েসের মেয়েরা যেমন হাসিখুসী থাকে, তার মধ্যে সে ভাব অনুপস্থিত। মুখের উপর মলিন পর্দা পড়ে রয়েছে যেন। সে সরাই-খানার মালিক রাট্লেজের একমাত্র মেয়ে।

—আপনাদের আরো হুইস্কি লাগবে কি ?

—এখন নয়। মিস অ্যান—

অ্যান চলে যাচ্ছিল। গ্রীনের আহ্বানে থামল।

—তোমাকে আজ বড় বেশী মনমরা দেখাচ্ছে ? মিঃ ম্যাকলিনের কাছ থেকে কি এখনও কোন চিঠি পাওনি ?

একটু ইতস্তত করে অ্যান বলল, না। ম্যাক নিউইয়র্কে যাবার পর এত চুপচাপ হয়ে গেছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

কথা শেষ করে সে ঘরের অন্যপ্রান্তে চলে গেল।

এডওয়ার্ডসের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় স্পীড বললেন, মেয়েটি ভাল। এক ছোকরা বিয়ে করার আশা দিয়ে নিউইয়র্ক সরে পড়েছে। তারপর থেকেই বেচারীর মনের অবস্থা ভাল নেই।

—আবার কাজের কথায় আসা যাক—গ্রীন বললেন, আপনি জানতে চাইছিলেন মিঃ এডওয়ার্ডস, সেই ব্যক্তিটি কে ? তার চেয়ে ভাল প্রার্থী আর কেউ হতে পারে না। নিউ সালেমের সকলেই তাকে ভালবাসে।

—তার নাম কিন্তু আপনারা কেউ বলছেন না।

এই সময় চারজন যুবক বেপরোয়া ভঙ্গীতে সরাইখানায় প্রবেশ করল। তাদের গুণ্ডা শ্রেণীর বলে মনে হয়। শ্রীমণ্ডিত চেহারার তিনজনকে চোখ বড় বড় করে দেখল তারা। তারপর উঁচু গলায় হাসতে লাগল।

শেষে হাসি থামিয়ে একজন বলল, দেখছো জ্যাক, এই সরাই-খানাও আজকাল বড়লোকদের আড্ডাখানা হয়ে উঠেছে।

জ্যাক বলল, তাইতো দেখছি, নতুন নতুন ঠেকছে, ওই লোকটি কে হে ?

—কে জানে। বাইরের কোন ক্যাপ্তেন হবে বোধহয়।

স্পীড চাপা গলায় এডওয়ার্ডসকে বললেন, এদের কথাই বলছিলাম। নিউ সালেমের সমাজ-জীবনকে বলতে গেলে এরা আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে।

কার্টার খেঁকিয়ে উঠল।

—মনে হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে চুপিচুপি কিছু যেন বলছেন মিঃ স্পীড ? ওকাজ করে আর নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।

জ্যাক বলল, অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যা করতে এসেছি তার ব্যবস্থা আগে দেখ।

অ্যান ঘরের আরেক প্রান্তে তখনও দাঁড়িয়েছিল। ওরা চারজন সেইদিকে ফিরল। তারপর এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। ভয় পেয়ে গেল অ্যান। সে রান্নাঘরের যাবার জন্য পা বাড়াল।

—আপনি ভয় পাবেন না মিস র‍্যাট্‌লেজ। আমাদের কুমতলব নেই। শুধুমাত্র একটি প্রস্তাব আছে।

—বলুন ?

—আমরা আপনার কাছে এক পিপে মদ চাইব—আপনি দেবেন। আমরাও কোন গোলমাল না করে চলে যাব।

কার্টারের কথা শেষ হতেই অ্যান কাঁপা গলায় বলল, আপনারা যদি বার বার এরকম করেন তবে আমাদের চলে কি করে ? আমার বাবা তো অনেক রেস্তর অধিকারী নন।

—তাকি আর জানি না। কিন্তু কি করব বলুন ? আমাদের পকেট যে একেবারে খালি। মাঝে মাঝে এরকম আব্দার রাখতেই হবে। জ্যাক, দেখছো কি ? একটা পিপে বার করে নিয়ে এস।

নিনিয়ান এডওয়ার্ডস অবাক হয়ে এদের কথা শুনছিলেন এতক্ষণ। এবার বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, পিপের ব্যাপারটা যদি বাদ দেওয়া যায় তবে আমি আপনাদের হুইস্কি পান করাতে পারি।

চারজনই অবাক হয়ে তাকাল বক্তার দিকে।

—আপনার পকেটে এখন কত ডলার আছে জানতে পারি কি ?

—অবান্তর প্রশ্ন। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনাদের ভালরকম নেশা আমি নিশ্চয় করাতে পারব।

জ্যাক ঝাঁজিয়ে উঠল, আপনার বদান্যতা কে চাইছে মশাই ? চুপ করে বসে থাকুন। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না।

—চুপ করে বসে থাকতে পারলে ভালই হত। কিন্তু তা আর পাচ্ছি কই ?

এডওয়ার্ডস উঠে দাঁড়ালেন। স্পীডও।

—মারামারি করতে চান নাকি ?

চারজনই রুখে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময় সরাইখানায় প্রবেশ করলেন লিঙ্কন। তাঁর কাঁধে ঝুলছে চিঠির ব্যাগ। চারজনের হাবভাব দেখেই তিনি বুঝলেন গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে। দেখা যাচ্ছে সময় মতই এখানে এসে পড়েছেন।

—ব্যাপার কি ?

জ্যাক বলল, বাইরের লোকের সর্দারী আমরা কখনই বরদাস্ত করব না।

—বটেই তো। তোমাদের বিরুদ্ধে বোধহয় তেমন কোন অভিযোগ নেই ?

—একেবারেই না। আমরা শুধু একটা—

—একটা কি— ?

—একটা মদের পিপে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

লিঙ্কন হেসে ফেললেন।

পিপে নিয়ে যাবার ব্যাপারে আমারও যে আপত্তি আছে। আর ভীড় বাড়িও না। এখান থেকে যাও এবার।

—লোকটাকে শায়েস্তা না করেই— ?

—সে দায়িত্ব আমার।

—এব—

—কার্টার, অবাধ্যতার পরিণাম ভাল হয় না। গায়ের জোরে আমার সঙ্গে যে পেরে উঠবে না তা আগে প্রমাণিত হয়েছে। তাই বলছিলাম, কয়েকজন ভদ্রলোকের সামনে আমাকে হাত ছাড়তে হোক তা তোমরা নিশ্চয় চাইবে না। আর ভীড় বাড়িও না এখানে। এবার কাজে-কর্মে যাও।

লিঙ্কনকে শ্রদ্ধা বা ভয় করে না এমন লোক এখানে অল্পই আছে। চারমূর্তি একটু ইতস্তত করে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল। অ্যানের মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসি। লিঙ্কন তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

হাঁপ ছাড়ার ভঙ্গীতে বিচারপতি গ্রীন বললেন, বাঁচা গেল। ছোকরারা একেবারে ঝড় বইয়ে দিয়েছিল।

—এই লোকের কথাই বলছিলাম—স্পাড বললেন, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। এখানকার সকলেই ওকে ভালবাসে।

লিঙ্কন তখন ব্যাগ থেকে চিঠি বার করতে করতে বলছেন, তোমার একটা চিঠি আছে অ্যান। নিউইয়র্কের ছাপ দেখলাম। মিঃ ম্যাকলীন নিশ্চয় ভাল কোন কথা লিখেছেন।

অ্যান চিঠি নিয়ে ভেতরে চলে যাবার পর লিঙ্কন তিনজনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্পীড পরিচয় করিয়ে দিলেন এডওয়ার্ডসের সঙ্গে। নির্বাচনের ব্যাপারেই যে ইনি এখানে এসেছেন তাও বলতে ভুললেন না।

চেয়ারে বসে পড়ে লিঙ্কন বললেন, হুইপ পার্টির প্রার্থী এখান থেকে কে হতে পারে মিঃ গ্রীন? আপনারা কাউকে মনোনীত করেছেন নাকি?

মৃদু হেসে গ্রীন বললেন, একরকম স্থির হয়ে গেছে বলতে পার। সেই লোকটি কে হতে পারে বলতো?

—আমি তো জোসূয়া স্পীডের কথা বলবো। রাজনীতির উপর ওঁর ভাল জ্ঞান আছে! তাছাড়া—

বাধা দিয়ে স্পীড বললেন, আমার কথা বাদ দাও।

—আমরা আপনার কথাই ভাবছি।

এডওয়ার্ডসের কথা শুনে লিঙ্কন হতবাক হয়ে গেলেন।

—আমার কথা!

—নিউ সালেমের আপনিই যোগ্য প্রার্থী।

—কিন্তু—···আপনি কি জানেন মিঃ এডওয়ার্ডস, আমি অতি সাধারণ লোক। ভাল করে লেখা পড়া পর্যন্ত শিখিনি। ইলিনয়ের আইন সভার জমজমাট পরিবেশে আমাকে মোটেই মানাবে না। আমার ভালো একটা স্যুট পর্যন্ত নেই।

—স্যুটের অভাব কি? হবে। আপনার যোগ্যতার বিচারক আপনি নিজে হতে পারেন না মিঃ লিঙ্কন। আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, আপনিই হবেন এখানকার যোগ্য প্রার্থী।

—চমৎকার ব্যবস্থা।

স্পীড থামতেই গ্রীন বললেন, ভুলে যেও না আইন পরিষদের সদস্য হলে প্রতিদিন তুমি তিন ডলার করে পাবে।

—মন্দ নয়। এই তিন ডলারের টোপটা আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলল। দারুণ অর্থকষ্ট যাচ্ছে। প্রতিদিন তিন ডলার পেলে মোটামুটি চলে যাবে। কিছু কিছু ধার শোধও করতে পারব। তবে—

কথা শেষ না করেই লিঙ্কন হাসলেন।

—থামলে কেন? যা বলবার মন পরিষ্কার করেই বল?

—এই সরাইখানায় পা দেবার আগে ভাবতেও পারিনি, আমার মত অতি সাধারণ একজন মানুষকে আপনারা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করে বসে আছেন! আজ আমার জন্য আরো কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে কে জানে।

এডওয়ার্ডস বললেন, এই রকমই হয়। কখন যে অকল্পনীয় সমস্ত ঘটনা জীবনে দেখা দেবে তার ঠিক থাকে না। কি স্থির করলেন? ব্যস্ততার সঙ্গেই আপনার মতামতের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

—আমাকে একটু ভাবতে দিন।

—বেশ।

—বেশী সময় অবশ্য নেব না। যা হোক একটা উত্তর সন্ধ্যার মধ্যেই পাবেন। আপনারা বসুন। এখনও অনেক চিঠি বিলি করতে বাকী আছে। চলি—

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লিঙ্কন। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাইরে এসেই তিনি লক্ষ্য করলেন, ডান ধারে বাগানের মত ফালি যে অংশটুকু আছে সেখানে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যান। তিনি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অ্যান মুখ তুলল।

—মনে হচ্ছে নিউইয়র্ক থেকে ভাল কোন খবর আসেনি?

অ্যান মৃদু গলায় বলল, চিঠি পড়ে মনে হল, ম্যাক আর কোনদিন এখানে ফিরে আসবে না।

—অর্থাৎ—

—আমাদের বিয়ে আর হচ্ছে না।

—খুবই দুঃখের কথা। মিঃ ম্যাকনীল যে এরকম করবেন ভাবতেই পারিনি।

—মনের দিক থেকে আমি শক্ত আছি—অ্যান বলল, ম্যাকের প্রতি আমার যে গভীর দুর্বলতা ছিল তা নয়। তবে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার বয়স আমার হয়েছে, তাই আমি তার বাকদত্তা হয়েছিলাম। সমস্ত চুকে গেল, একরকম ভালই হল বলতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে লিঙ্কন বললেন, এমন আর কেউ আছে কি যে তোমায় ভালবাসে? জান কিছু?

আমার জানা নেই।

—আমার কিন্তু জানা আছে। ম্যাকনীল আসরে উপস্থিত থাকায় সে বেচারা এতদিন এগিয়ে আসতে সাহস করেনি।

—কার কথা বলছেন?

—আমি নিজের কথাই বলছি।

হতবাক হয়ে গেল অ্যান রাটলেজ।

—তুমি এখন আর কারুর বাকদত্তা নও, তাই মনের কথাটা প্রকাশ না করে থাকতে পারলাম না।

—আপনি···আপনাকে তো······

মুখে করুণ হাসি ফুটিয়ে লিঙ্কন বললেন, আমার মত কদাকার মানুষকে প্রেমিক হিসাবে কল্পনা করা বেশ কষ্টসাধ্য বুঝি। আমার আড়ালে আমাকে নিয়ে একটু হাসি ঠাট্টা করা চলে তার বেশী কিছু নয়। তুমি বিব্রত বোধ করছো বুঝতে পাচ্ছি। কেন যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে গেলাম জানি না। দুঃখিত। আমায় ক্ষমা কর অ্যান।

—লিঙ্কন ফিরে চললেন।

—মিঃ লিঙ্কন—

নিজের গতি সচল রাখলেন লিঙ্কন।

—এব—

থামলেন তিনি। ফিরে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। অ্যানের মুখে বিচিত্র আলোছায়ার বিস্তার। সে এগিয়ে এল অদ্ভুত মানুষটির দিকে। তার দুচোখের কোলে জল টলটল করছে।

—আমায় তুমি ক্ষমা কর এব। ম্যাকের উপরকার চাকচিক্য আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। তুমি আমার পাশে পাশে রয়েছো—তোমাকে দেখেও দেখিনি। তোমার হৃদয়ে আমার জন্য যে এত জায়গা রয়েছে কল্পনাও করিনি।

—ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হচ্ছে না অ্যান। ধীরে ধীরে পা ফেলাই ভাল।

—তুমি কি বলতে চাইছো?

—আমি আমার মনের কথা প্রকাশ করেছি ঠিকই—তবে তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার আছে কি না তোমায় খতিয়ে দেখতে হবে। আমি দরিদ্র, বিশেষত্বহীন, বাস্তবপন্থী মানুষ—এমন একজনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে কি না গভীরভাবে ভেবে দেখতে বলি।

—ভেবে দেখতে বলছো?

—ওরা আমাকে নির্বাচনে দাঁড় করাতে চায়। সাময়িক ব্যাপার। তবু ভেবে মতামত দিতে বলেছে। তোমার সমস্যা তো আরো বড়। ভাল করে ভেবে দেখতে হবে বইকি। তারপরও যদি মন চায়, জানিও—তোমার পাশে পাশেই আমি থাকব।

—বেশ, ভেবে দেখব। তুমি নির্বাচনে দাঁড়াবে শুনে বড় ভাল লাগল এব।

—বললাম তো, এখনও স্থির হয়নি। আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

—তোমার মত লোকেরই আইন পরিষদে যাওয়া উচিত। এ

অঞ্চলের সকলেই দাসপ্রথার বিরোধী। কিন্তু উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে কিছু বলার মত লোকের বড় অভাব। তুমি পারবে এব।

এই কথা শোনার পর উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইলেন লিঙ্কন।

—অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যান। এই দিক দিয়ে বিষয়টিকে আমি একেবারেই বিচার করিনি। তাইত! নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াবার এ এক মহান সুযোগ। আর কোন দ্বিধা নয়। আমি নির্বাচন প্রার্থী হব।

অ্যানকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এখন তাঁর অবস্থা ভারী কিছু কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে যাওয়ার মত। অবশ্য এখুনি আস্তানায় ফিরলেন না। ব্যাগে অনেক চিঠি আছে। সেগুলি বিলি করা দরকার।

॥ খ ॥

ইংল্যাণ্ডে তখন প্রথম চার্লসের রাজত্বকাল।

তাঁর কঠিন শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে দলে দলে লোক দেশ ত্যাগ করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই যাচ্ছিল নতুন মহাদেশ আমেরিকায়। সেখানে তারা যাচ্ছিল মুক্ত পরিবেশে নতুন জীবন আরম্ভ করার আশায়। সকলেই শুনেছে পুরোপুরি স্বাধীনতার মধ্যে ওখানে বাস করা চলে।

এই হাজার হাজার গৃহছাড়া মানুষের মধ্যে একজন ছিলেন স্যামুয়েল লিঙ্কন। আজ অতি খ্যাত ম্যাসাচুসেটস শহর যেখানে প্রতিষ্ঠিত, তারই কাছাকাছি তিনি বসবাস আরম্ভ করলেন। স্যামুয়েলের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না। তিনি ভাল ভাবেই জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু কয়েক পুরুষের পরই এই পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল।

টমাস লিঙ্কন স্যামুয়েলের নিম্নতম পঞ্চম পুরুষ। তাঁর আয়ের কোন ভাল ব্যবস্থাই নেই। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়ে চলেছেন। টমাস লেখাপড়া শেখেননি। শেখেননি বললে ঠিক বলা হয় না, সুযোগই পাননি। অতি শৈশব থেকেই বেঁচে থাকার সংগ্রামে তিনি নেমেছেন। তবে তাঁর স্ত্রী সামান্য লেখাপড়া জানতেন এবং এ সম্পর্কে উৎসাহও ছিল প্রচুর।

লিঙ্কন পরিবার ম্যাসাচুসেটসের কাছে আর ছিলেন না। টমাসের বাবার আমলেই স্থান বদল হয়েছিল। ওঁরা চলে এসেছিলেন, কেনটাকীর কাছে এক জঙ্গল ঘেঁসা জায়গায়। ছোট একটি কাঠের ঘর—তারই মধ্যে কোন রকমে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছিলেন টমাস। এখানেই ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুআরি দিক পুরুষ

অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন জন্মগ্রহণ করেন। তখন টমাস বা তাঁর স্ত্রী কি ভাবেই বা বুঝবেন, তাঁদের এই ছেলে একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবে।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অ্যাব্রাহাম বড় হতে লাগলেন। কৈশোরে তিনি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাঠ সংগ্রহ করতেন। সেই কাঠ জ্বালানীর কাজে লাগতো বা টমাস কিছু তৈরী করে বাজারে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন। শ্রীমতী লিঙ্কনের কিন্তু ছেলের জন্য চিন্তার শেষ ছিল না। স্বামী নিরক্ষর। ছেলেও যদি লেখাপড়া না শেখে তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হবে! নিয়মিত স্কুলে পাঠাবার সাধ্য নেই। তিনি নিজের সীমিত ক্ষমতায় অ্যাব্রাহামকে যতটুকু শেখান যায়, তারই চেষ্টায় লেগে পড়লেন। পরবর্তীকালে কৃতজ্ঞ পুত্র নির্জের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, I owe everything that I am to my mother.

দিন কেটে চলল।

সে সময় তিনি বুনো গমের হাতে-তৈরা এক অখাদ্য ধরনের আটার রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। মাছ বা মাংস তাঁর কাছে স্বপ্ন ছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য এক ভবঘুরে শিক্ষক দয়া করে তাঁকে কিছুদিন শিক্ষাদান করেছিলেন। কেনটাকীতেও বেশী দিন থাকা চলল না। টমাস সপরিবারে সাউথ ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে চলে এলেন। এখানেই অ্যাব্রাহামের মনোলোকে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটল।

মিসেস লিঙ্কন মারা গেলেন। মাকে ভীষণ ভালবাসতেন অ্যাব্রাহাম। দারুণ আঘাত পেলেন। ভেঙ্গে পড়া মনকে প্রকৃতস্থ করতে অনেক সময় লাগল। অসম্ভব চুপচাপ হয়ে গেলেন এরপর থেকে। তবে ইতিমধ্যে তাঁর আশপাশের সকলেই জেনে ফেলেছিল তিনি অতি সৎ প্রকৃতির তরুণ।

এই সুবাদের দরুন তিনি প্রথম চাকরীর মুখোমুখি হলেন।

আজকের গতিশীল আমেরিকার ছবি সেদিন অনুপস্থিত। যে

সমস্ত ব্যবসাদার ভাল লাভের আশায় দূরে পণ্য নিয়ে গিয়ে কারবার করতে চাইতো তাদের অনেক অসুবিধার বেড়া অতিক্রম করতে হত। যাতায়াতের উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। কঠিন ছিল বিশ্বাসী কর্মচারী পাওয়া। অ্যালান জেনট্রি তাই আর কাল বিলম্ব না করে লিঙ্কনকে সহযোগী হিসাবে নিয়ে—নৌকায় মাল সাজিয়ে ভেসে পড়লেন নানা জায়গায় ব্যবসা করতে।

লিঙ্কনের বয়স তখন মাত্র আঠারো। কিন্তু ওই বয়সেই নানা জায়গায় ঘুরে ব্যবসার ব্যাপারে তিনি যে সততা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন তা অতুলনীয়। নিউ সালেমে ফিরে আসবার পর তাঁর দ্বিতীয় চাকরী হল ব্যবসায়ী অফটের কাছে। একই ধরনের কাজ। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মাল বেচতে হবে। নৌকা সাজিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন তিনি। এবার এমন এক অভিজ্ঞতা হল যার কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি।

ঘুরতে ঘুরতে নিউ অর্লিয়েনস শহরের প্রধান বাজারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে দেখলেন, শেকল দিয়ে বাঁধা অসংখ্য নিগ্রো বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভীত-সচকিত হয়ে জড়োসড়ো ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাথি মেরে মেরে তাদের পরীক্ষা করে দেখছে ক্রেতারা। আর দশটা পণ্যের মতই দর ওঠানামা করছে। নিউ অর্লিয়েনস তখন দাস বিক্রীর নাম-করা বাজার।

মানবতার প্রতি এই অবিচার লিঙ্কনের মনে নিদারুণ ঘা দিল। নিগ্রো কেনা-বেচার কথা তিনি শুনেছিলেন—তবে গরু ভেড়ার সামিল যে তাদের জীবন তা কল্পনাও করতে পারেননি। বলতে গেলে সেই দিন থেকেই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। পরবর্তী কালে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না। তিনি বলেছেন, স্বাধীনদেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার হবে সমান। শুধু মাত্র গায়ের চামড়া কালো বলে কাউকে মর্মান্তিক ভাবে দাবিয়ে রাখা চলবে না। সুতরাং ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ চাই।

কাজ সেরে, প্রায় শোচনীয় মনের ভাব নিয়ে নিউ সালেমে ফিরে এলেন। অফটের দোকানেই কাজ-কর্ম করে যেতে লাগলেন। তখন তাঁর অবসর সময়ে একমাত্র কাজ ছিল নানা ধরনের বই একাগ্র মনে পড়ে যাওয়া। হাতের লেখা ছিল অতি খারাপ - অক্ষরগুলি যাতে সুছাঁদের হয় সে চেষ্টাও তিনি একসময় অবিরাম চালিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর নিস্তরঙ্গ খাতেই বয়ে গেল।

লিঙ্কনের বয়স তখন তেইশ। ভাল লোক হিসাবে তাঁকে জানলেও, ভাল ভাবে পেট ভরার মত আয় তিনি করতে পারতেন না। অফটের দোকানে চাকরী করে সামান্যই আয় হত তাঁর। এই সময় ইলিয়া প্রদেশের সিমানায় বিপদের ডংকা বাজতে আরম্ভ করেছিল। ব্ল্যাক হক নামে অতি সাহসী রেডইণ্ডিয়ান, তার দলবল নিয়ে লুটতরাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

ব্ল্যাক হককে দমন করার জন্য এক সৈন্যদল গঠন করা হচ্ছিল। লিঙ্কন তাতে যোগ দিলেন। তাঁকে ক্যাপ্টেনের পদ দেওয়া হল। এই অভিযানে তিনি যোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। নিউ সালেমে ফিরে আসার পর শুনলেন, শাসন পরিষদের আগামী নির্বাচনের তোড়-জোড় চলেছে। বন্ধু-বান্ধবরা ধরে বসল তাঁকে দাঁড়াতে হবে।

আপত্তি যে করেননি তা নয়। কিন্তু সুহৃদের দল আপত্তিতে কান দিল না। অবশ্য অনিবার্যতাকে যে রোধ করা যায় না তা আরেকবার প্রমাণিত হল। লিঙ্কন নির্বাচনে পরাজিত হলেন। পরিস্কার বুঝতে পারা গেল, নিউ সালেমের বাইরে তাঁর পরিচিতি বিস্তার লাভ করেনি।

হতাশার নাগপাশ থেকে অচিরেই নিজেকে ছিনিয়ে আনলেন, তারপর আবার ঝাঁপ দিলেন কঠিন জীবন সংগ্রামে। অফটের দোকান উঠে যাওয়ায় চাকুরী গিয়েছিল। কামারশালা প্রতিষ্ঠা করে ছোট ছোট লোহার জিনিষ তৈরী করবেন এই রকম ইচ্ছে ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে দোকানের কাজেই ফিরে যেতে হল। তবে এবার চাকরী নয়, বেরী নামে একজনকে অংশীদার নিয়ে ব্যবসায় নামলেন।

বলা বাহুল্য ব্যবসা টিকল না। বিরাট ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। না খেতে পেয়ে অবশ্য তাঁকে মরতে হল না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই সময় তিনি নিউ সালেমের পোষ্ট-মাষ্টারের চাকরীটি পেলেন। এরপর গড়িয়ে গড়িয়ে দুটি বছর কেটে গেল। পঁচিশ বছরে পা দিয়েছেন অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন।

আবাব শাসন পরিষদের নির্বাচন এসে গেছে।

আবার প্রার্থী হবার অনুরোধ পেয়েছেন।

আবার কি নির্বাচনে দাঁড়াবেন লিঙ্কন ?

* * * *

দেখতে দেখতে নির্বাচন এসে গেল।

জয়লাভ করলেন লিঙ্কন। স্থানীয় তরুণদের কাছ থেকে বাধা পেলেও, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই বাধার প্রতিফলন দেখা যায়নি। লিঙ্কনের জনপ্রিয়তা স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় তরুণদের ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল। যাহোক বাস্তবে একথাই প্রমাণিত হল, দারিদ্র্যের চাপে দিশাহারা যে বালক বঞ্চনার মূর্তপ্রতীক হিসাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত—সততা আর নিষ্ঠার জোরে যৌবনে সে জীবনের প্রশস্ত রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকাল থেকেই উইলি আজ ভীষণ ব্যস্ত।

সে জানে মাসা লিঙ্কনের জয়লাভের কথা ঘোষিত হবার পরই, তাঁর সামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। বাড়ীতে এখন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শুভেচ্ছা জানাতে আসবেন। তাঁদের আপ্যায়নের

দিকে নজর রাখতে হবে। উইলি ছাড়া আর কে করবে একাজ। কারণ আত্মভোলা প্রভুর ও-সমস্ত দিকে খেয়ালই নেই।

গুলিতে আহত হবার পর, বেশ কিছুদিন হাসপাতালে পড়েছিল। উইলির ক্ষত পেকে যাওয়ার জন্যই তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। তারপর লিঙ্কন নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। মাইনে অবশ্য দিতে পারেন না। সে সাধ্য তাঁর নেই। তাতে কিছু যায় আসে না উইলির। প্রভুর মহানুভবতা সে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করেছে— একজন আজন্ম অত্যাচারিত ক্রীতদাস এতেই কৃতার্থ।

সংসার বলতে যা বোঝায়, ছন্নছাড়া জীবনের অধিকারী লিঙ্কন তার আওতায় নন। তবে উইলি জেনেছে, প্রভু সংসারী হতে চলেছেন। মন দেওয়া নেওয়ার পালা শেষ হয়েছে। এবার অ্যান রাটলেজ শ্রীমতী লিঙ্কনের আসন পূর্ণ করবেন। তারপর উইলি বিয়ে করবে। প্রভুরও তাই ইচ্ছা।

জীর্ণ ঘরটি ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে করবার চেষ্টা করছিল উইলি। লিঙ্কন বহুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। গেছেন অ্যানের বাড়ী তার অসুস্থতার কথা শুনে। দরজার গায়ে মৃদু শব্দ হল। ফিরলেন বোধহয় তিনি। উইলি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল। লিঙ্কন নন, বিচারপতি গ্রীন আর জোসুয়া স্পাড এসেছেন।

দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন।

—গৃহস্বামী কোথায়?

গ্রীনের প্রশ্নের উত্তরে কুণ্ঠিতভাবে উইলি বলল, তিনি মিস অ্যানের ওখানে গেছেন। এবার ফিরবেন।

—একজন আইন পরিষদের সদস্যকে এই ঘরে মানায় না। তুমি কি বল স্পাড?

—আপনি ঠিকই বলেছেন। এব-কে ঘর বদলাতে হবে।

—ভাল একটা বাড়ীর ব্যবস্থা আমরাই দেখব।

স্পীড বললেন, আমার তো মনে হয় এব যেতে চাইবে না। কি

রকম একগুঁয়ে জানেন তো? কিছুতেই রাজী হবে না নিজের জন্য বেশী খরচ করতে। বলবে, আগে ধার শোধ করে নিতে দাও, তারপর ওসমস্ত হবে। অথচ মজার কথা কি জানেন, পাওনাদাররা মোটেই চাপ দেয় না। তারা জানে, দেরী হতে পারে কিন্তু টাকা মারা যাবে না।

—আচ্ছা, এবের এত ধার হল কিভাবে? ওর তো কোন বদ-খেয়াল নেই।

—আপনি জানেন না দেখছি! একজন অংশিদার নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। নেশার দাস হয়ে, চরম বেহিসাবীপনায় একদিন অংশিদার দোকান লাটে তুলে সরে পড়ল। এব সচ্ছন্দে দায়িত্ব এড়াতে পারতো—ও সে ধরনের লোক নয় আপনি তো জানেন। সমস্ত ধার নিজের ঘাড়ে নিয়ে—শোধ করে চলেছে এখনও।

—আশ্চর্য লোক।

গ্রীনের কথা শেষ হবার পরই লিঙ্কন ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর দীর্ঘ দেহ ক্লান্তিতে যেন নুয়ে পড়েছে। মুখের ভাবও তেমন সুবিধার নয়। অতিথিদের শুভ কামনা করে তিনি চেয়ারে আড় হয়ে বসলেন।

গ্রীন বললেন, এবার তুমি জীতবে আমি জানতাম এব। আজ পর্যন্ত কোন পোষ্টমাষ্টার বোধহয় আইন পরিষদের সদস্য হয়নি।

লিঙ্কন মৃদু হাসলেন।

স্পীড প্রশ্ন করলেন, কেমন লাগছে বল?

—এখনও কোন নতুন অনুভূতিবোধ করছি না। অধিবেশন আরম্ভ হবার পর মনকে বিচার করে দেখব। আপনাদের কথা আমার সব সময় মনে থাকবে। যে সাহায্য, যে সহযোগিতা দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। ধন্যবাদ।

—এবার জীবনের মান কিন্তু উঁচু করতে হবে। এই ভাবে থাকা আর চলবে না।

লিঙ্কন আবার হাসলেন।

—তা বোধহয় সম্ভব হবে না। অনেক ধার রয়েছে যে?

—ধারের জন্য চিন্তা নেই। শোধ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

—তা হয় না মিঃ স্পাড। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ মুক্ত হতে চাই।

এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন বিচারপতি গ্রান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথাবর্তা হতে লাগল। আইন পরিষদে লিঙ্কনের কি ভূমিকা হবে তা নিয়েও আলোচনা চলল।

এক সময় স্পাড বললেন, এব তার মুখ থেকে একটা শুভ সংবাদ আমরা শুনেছি। তুমি একেবারেই আমাদের কাছে চেপে গেছ, ব্যাপার কি?

—কি ব্যাপার বলুন তো?

গ্রীন একটু হেসে বললেন, তুমি বিয়ে করছো শুনলাম?

—বিয়ে!

—অ্যান রাটলেজের সঙ্গে তোমার হৃদ্যতার কথা আমরা তো জানি। চমৎকার মেয়ে। যে কোন ছেলেকে সে সুখী করতে পারে।

—বিয়ের দিন স্থির কি করে ফেলেছো?

স্পীডের প্রশ্ন শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন লিঙ্কন। কোন গুরুতর বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছেন এই রকম তার অবস্থা। কয়েক মিনিট কিছুই বললেন না। তারপর—

—অ্যানের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে না।

—সে কি!

—কেন বলতো?

—কোন রকম বোঝাপড়ার অভাবেই কি—

—সমস্ত রকম বোঝাপড়া আমাদের শেষ হয়েছিল মিঃ গ্রান। তাতে কোন খুঁত ছিল না। তবে—

—আমাদের খুলে বল ব্যাপারটা কি হয়েছে ?

ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করলেন লিঙ্কন। সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। করুণ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

—এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা ঘটে সে রকম কিছু ঘটেনি। আসল কথা হল, সে আর বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই!!!

এই ধরনের কিছু শুনতে পাবেন, দুজনের কেউই কল্পনা করতে পারেননি। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে রইলেন, এমন একজন মানুষের দিকে যে সে অবিরাম আঘাত সহ্য করে চলেছে।

—বিশ্বাস করতে আপনাদের মন চাইছে না বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু এর চেয়ে বাস্তব আর কিছু নেই। কিছুক্ষণ আগেও সে বেঁচে ছিল, এখন নেই।

ভারী গলায় গ্রীন বললেন, তোমাকে সন্ত্বনা জানাবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না এব। কতই বা বয়স হয়েছিল অ্যানের, জীবনে কতটুকুই বা উপভোগ করতে পারল ?

দুঃখীতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে স্পীড বললেন, এর চেয়ে খারাপ কিছু আর হতে পারে না। এসময়ে তোমাকে আমরা—

—আপনারা সঙ্কুচিত হবেন না। মনের দিক থেকে আমি বেশ শক্ত আছি। বাস্তবকে না মেনে নিয়ে উপায় তো নেই। অ্যানকে কেন্দ্র করে আমার কিছু পরিকল্পনা ছিল—ওসমস্ত নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি ঝাড়া হাত-পায়ে এবার কাজে মন বসাতে পারব।

এই সময়ে বাইরে কয়েকজনের সাড়া পাওয়া গেল।

—আপনারা বসুন। কারা এল দেখি।

লিঙ্কন দরজার দিকে এগুলেন। বিচারপতি গ্রীন আর জোস্যুয়া স্পীড অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অদ্ভুত মানুষটির চলমান দেহটির দিকে।

লিঙ্কনের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হল।

বছর চারেক পরে নিউ সালেমে থাকার দিনও তাঁর ফুরিয়ে এল। আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁকে বাসা বাঁধতে হল গিয়ে স্প্রিং-ফিল্ডে। ইলিয়া স্টেটের ওটিই তখন কেন্দ্রীয় নগর। আইন পরিষদ ওখানে উঠে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য উইলি সঙ্গে আছে—তাঁর সুখ-সুবিধার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে।

ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে তখন চারিধারে আলোচনা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের স্টেটগুলির মানুষেরা জোর গলায় রায় দিয়েছে, ক্রীতদাস প্রথা থাকবে। কালো মানুষরা দাস হবার জন্যই জন্মায়। তাদের শ্রমকে মূলধন করেই অনেক অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় আছে একথা ভুললে চলবে না।

উত্তরাঞ্চলের স্টেটগুলি অন্য কথা বলছে। তাদের অভিমত হল, হৃদয়বিদারক এই প্রথা তুলে দিতে হবে। অর্থ দিয়ে মানুষ কেনা আর চলবে না। নিগ্রোদের গায়ের রং কালো হলেও আর দশজন সাদা মানুষের মত বাঁচার অধিকার তাদের আছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশের দুই অঞ্চলের ব্যবধান ক্রমেই দুস্তর হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কার্য্য-কলাপ নৈরাশ্যজনক। তাঁরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে দু দিক সামলাবার চেষ্টা করছেন।

দেশের হালচাল দেখে নিদারুণ মর্মবেদনায় ভুগছেন লিঙ্কন। আইন পরিষদের সভ্য হয়েও যে কিছু করার মত ক্ষমতা তাঁর হয়নি তা বুঝেছেন। প্রাদেশিক পরিষদ দাস প্রথার মত দেশব্যাপি সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অগত্যা তাকে এখানে-ওখানে এই অসাম্যর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। তাঁর মূল কথাই হল, মানুষে মানুষে কোন্ প্রভেদ থাকতে পারে না। তবে একটা বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তিনি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন নিগ্রোদের বন্ধু হিসেবে।

বছর গড়িয়ে চলল।

আরো তিনটি নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি আইন পরিষদেই রইলেন। প্রাদেশিক রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ তাঁর ষ্টিফ ডগলাস। স্প্রিংফিল্ডের নামকরা ব্যারিষ্টার—অর্থশালী ব্যক্তি। তাঁর বাসনা হল, একদিন না একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করা।

প্রতিষ্ঠা জোরাল করবার জন্য লিঙ্কনও আইন ব্যবসা সুরু করেছেন। তখন ওই অঞ্চলের অধিকাংশ রাজনীতিজ্ঞ আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। লিঙ্কনের যদিও কোন ডিগ্রী ছিল ন তবে তখনকার দিনে ডিগ্রী না থাকলেও ওকালতি করার অধিক দেওয়া হত। অবশ্য স্প্রিংফিল্ডের বড় আদালতে প্রবেশ করার জ তাঁকে একটি পরীক্ষায় পাশ করে নিতে হয়েছিল।

ক্রমেই তিনি রিপাব্লিকান দলের একজন পাণ্ডা হয়ে উঠখন তিনি বুঝেছিলেন, ভাল বক্তা না হতে পারলে রাজনীতিতেসংটন অর্থহীন। আপ্রাণ চেষ্টা করে সেই গুণের অধিকারী হলেন মস্ত আইন ব্যবসাও এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ক সঙ্গে আরো একটি বিষয় তিনি বুঝেছিলেন, যা তিনি চান তার পূর্ণ রূপ দিতে গেলে, প্রাদেশিক রাজনীতিতে চিরকাল থাকা চলবে না। কেন্দ্রীয় পরিষদ অর্থাৎ মার্কিন সিনেটের সদস্য হতে হবে। এই ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে তিনি তৎপর হলেন। এখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিশ্চিতভাবে ষ্টিফ ডগলাস।

।। গ ।।

স্প্রিংফিল্ডের কোর্ট হাউসের তিনতলায় একটি মাঝারি সাইজের ঘরে "ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লিঙ্কন" ল-অফিস। দারুন অগোছাল ঘর— চারিধারে কাগজপত্রের ছড়াছড়ি। ষ্টুয়ার্ট বা লিঙ্কন, দুজনের কেউই এখন অফিসে নেই। লিঙ্কন অবশ্য স্প্রিংফিল্ডেও ছিলেন না, কয়েকটি ায়গা হয়ে ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট বুকানানের সঙ্গে ার ওখানে দেখা হয়েছে এরকম কথাও শোনা যাচ্ছে। তিনি অবশ্য জধানী থেকে গতকাল ফিরে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আসতে পারেন।

হা ব্যস্তভাবে উইলি তখন অফিসঘর গোছাচ্ছে। বিড় বিড় কতে বকতে কাজ করে চলেছে সে। "ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লিঙ্কন" ফিসের ক্লার্ক হার্নডনও রয়েছে। অতি করিৎকর্মা তরুণ। লের ধারে বসে লম্বা একটা কাগজে কি সমস্ত লিখে াচ্ছে সে।

এক সময় মুখ ফিরিয়ে হার্ণডান বলল, উইলি, তুমি নিগ্রো বলে তোমার মনে কোন দুঃখ আছে?

প্রশ্ন শুনে উইলি সচকিত হল।

নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর বলল, না স্যার।

—তুমি সাদাদের ঘৃণা কর?

—আমি করি না স্যার।

—অথচ দেখ দক্ষিণাঞ্চলের সাদারা তোমাদের ঘৃণা করেন। আবার তোমাদের উদয়-অস্ত খাটিয়ে নিতেও তাদের বাধে না। তোমাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের দৌলতেই ওরা আজ সম্পদশালী।

উইলি কি বলবে ভেবে পেল না।

হার্ণডান বলল, আমেরিকার বাজারে কবে প্রথম নিগ্রো বিক্রি হয়েছিল জান ?

—ঠিক জানিনা স্যার।

—১৬১৯ সালে। ভার্জিনীয়ায় নিগ্রো বিক্রির বাজার বসেছিল প্রথম। তারপর দুশবছরের বেশী কেটে গেছে, কিন্তু ওই পাপ ব্যবসা দেশ থেকে দূর হয়নি। আমরা এখনও ভালভাবে সভ্য হয়ে উঠতে পারনি, কি বল ?

উইলি আর কি বলবে। সে জানে হার্ণডান-এর স্বভাব। মাঝে মাঝেই এই তরুণ ভদ্রলোক তাকে এই ধরনের কথা বলেন। আসল ব্যাপার হল, হার্ণডান একজন দাসপ্রথা বিরোধী। লিঙ্কন সহকারি হিসাবে একজন সম-মনোভাবাপন্নকেই পেয়েছেন।

বেলা তখন পড়ে আসছে।

কোর্টহাউসের কাছাকাছি অন্য একটি বাড়িতে লিঙ্কন তখন দলীয় কয়েকজন সভ্যর সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। ওয়াশিংটন এবং অন্যত্র সাম্প্রতিক সফরের সময় নেতাদের সঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তারই বিবরণ তিনি দিচ্ছিলেন। বলা চলে তাঁকে বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছিল।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন নিনিয়ান এডওয়ার্ডস ও জোস্যুয়া স্পীড। স্প্রিংফিল্ডে আসার পর এডওয়ার্ডের সঙ্গে লিঙ্কনের ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলেছে। জোস্যুয়া স্পাড মাঝে মাঝে আসেন নিউ সালেম থেকে।

—হ্যালো এব—আজ সকালেই ফিরেছো শুনলাম। কেমন আছ ?

—চমৎকার। সফর ফলপ্রসূ হয়েছে বলতে পার। মিঃ স্পীড, ছমাস পরে দেখা হল। সব ভাল তো ?

স্পাড বললেন, ভালই বলা চলে। দাসপ্রথার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের মনোভাব কিরকম বুঝলে ? মিটমাটের কোন সম্ভাবনা আছে ?

—মিটমাটের জোরাল কোন চেষ্টা হচ্ছে বলে আমি শুনিনি। তাছাড়া চেষ্টা হলেও তাতে যে বিশেষ কোন কাজ হবে আমি মনে করি না।—লিঙ্কন এবার গলায় জোর দিয়ে বললেন, দক্ষিণের লোকেরা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে আছে। তারা গরু ছাগলের মত বাজার থেকে নিগ্রোদের কিনবেই।

এডওয়ার্ডস বললেন, এই জঘন্য মনোভাব থেকে আমরা যে কবে রেহাই পাব ঈশ্বর জানেন।

—প্রেসিডেন্টের উচিত আরও শক্ত হওয়া।

স্পাডের কথা শুনে মৃদু গলায় লিঙ্কন বললেন, দুর্বল লোকের পক্ষে হঠাৎ শক্ত হওয়া নিশ্চয় কঠিন। তাছাড়া প্রশাসন আইন—সম্ভবতই তো দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেদের পক্ষে।

—তুমি কি ডেড স্কটের কেসের কথা বলছো?

—হ্যাঁ। বিচারপতির ওই ধরনের রায় দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? এতে তো দাস ব্যবসায়ী এবং দাস ক্রেতা—দুপক্ষই উৎসাহিত হচ্ছে।

ওই কেসটির সম্পর্কে এখানে কিছু বলে নেওয়া ভাল।

ক্রীতদাস প্রথা থাকবে কি থাকবে না—এই নিয়ে আমেরিকার উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। দাঙ্গাহাঙ্গামাও হচ্ছে এখানে ওখানে। কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রথা আইন করে তুলে দেবার সাহস না করলেও, কিছু একটা করা দরকার তা অনুভব করলেন। শেষে দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি সীমারেখা চিহ্নিত করা হল। এই সীমারেখার নাম হল, 'ম্যাসন অ্যাণ্ড ডিকসন লাইন', ডিকসন লাইনের উত্তরে ক্রীতদাস প্রথা থাকবে না, দক্ষিণে নিগ্রোদের কেনা-বেচা করা চলবে।

এই জোড়াতালি ব্যবস্থাতেও কিন্তু গোলমাল থামল না। উত্তরের লোকেদের বক্তব্য সমস্ত আমেরিকা থেকে এই প্রথা তুলে দিতে হবে। এই রকম সময় ডেডস্কট নামে একজন নিগ্রো অসম সাহসিকতার

পরিচয় দিয়ে বসল। আমেরিকার প্রধান আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সে আবেদন জানাল, সে মনিবের সঙ্গে দক্ষিণ থেকে উত্তরাঞ্চলে এসেছে। উত্তরে দাসপ্রথা নেই। সুতরাং সে এখন স্বাধীন। অথচ প্রাক্তন মনিব তাকে জোর করে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইছেন। মহামান্য আদালত তার স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

মামলা আরম্ভ হল।

ফলাফল প্রকাশিত হল যথাসময়।

বিচারপতি ট্যান নিজের রায়ে বললেন, আইনের মতে নিগ্রোমাত্রই তার মনিবের সম্পত্তি বিশেষ। মনিবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই তাদের আজীবন থাকতে হবে। নিগ্রোদের এমন কোন অধিকার নেই যার জোরে তারা শ্বেতাঙ্গদের কোনকিছু করতে বাধ্য করতে পারে।

এই রায় শুনে দক্ষিণের লোকেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। উত্তরে দেখা গেল ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া। এ কি অবিচার। নানা প্রতিবাদ সভায় লিঙ্কন বক্তৃতা করতে লাগলেন। একজায়গায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন,……যেহেতু প্রত্যেক নিগ্রো রক্তজলকরা পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজের অন্ন সংস্থান করে থাকে, সেইহেতু মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার ও দাবী আমাদের কারুর চেয়ে বিন্দুমাত্র কম তো নয়ই এবং অনেকাংশে বেশী, ঘরে আরো যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে একজন এতক্ষণ পরে বলে উঠল, কিছু লোক আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মিথ্যা করে দিচ্ছে।

—এই ব্যাপারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ চাই। সমস্যার যাতে সুষ্ঠু সমাধান হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব স্থির করেছি।

একটু থেমে লিঙ্কন আবার বললেন, কাজেই নিজেকে আর প্রাদেশিক রাজনীতিতে অবদ্ধ রাখতে চাই না। আগামী নির্বাচনে আমি সিনেটের সদস্য-পদের জন্য চেষ্টা করব। মিঃ স্পীড এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? নিনিয়ান, তুমি কি বল? আপনাদের কারুর যদি কিছু বলার থাকে তবে বলুন?

স্পীড বললেন, তুমি যে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করতে পেরেছো জেনে বড় খুসী হলাম। সিনেটে তোমার মত লোকের এখন দরকার আছে।

—আমার শুভেচ্ছা নাও। এডওয়ার্ডস বললেন, রিপাব্লিকান দল তোমাকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

অন্যান্যরাও আনন্দ প্রকাশ করল। এর পর আগামী নির্বাচন সম্পর্কেই আলোচনা চলল কিছুক্ষণ। শেষে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন এডওয়ার্ডস।

—বিকেল শেষ হতে চলেছে। এবার আমায় যেতে হবে। স্প্রিংফিল্ডে আজ ফিরে এসে ভালই করেছো। সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে এস।

—ব্যাপার কি?

—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। উপলক্ষ্য অবশ্য গুরুতর কিছু নয়, আমার শ্যালিকার সঙ্গে কয়েকজন যুবকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

—তোমার শ্যালিকা—

—কয়েকদিন হল মেরী এখানে এসেছে। তুমি বোধ হয় জান, কেণ্টাকীর প্রসিদ্ধ টড পরিবারে আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীর সহোদরা বলে বলছি না। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে, মেরী সুন্দরী ও রসিকা। মিঃ স্পাড—

স্পাড দ্রুত গলায় বললেন, আপনার ওখানে ডিনারে উপস্থিত থাকতে পারলে আমি খুসী হতাম। উপায় নেই, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমায় নিউ সালেমে ফেরার জন্য যাত্রা করতে হবে।

এডওয়ার্ডস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন।

—তুমি নিশ্চয় সময় মতই উপস্থিত হবে এব। আরেকটা কথা জানাই, মেরী কিন্তু আর বেশীদিন কুমারী থাকতে চায় না। বলতে পারো, মনের মত স্বামী খুঁজতেই সে স্প্রিংফিল্ডে এসেছে।

কথা শেষ করে তিনি হাসলেন।

লিঙ্কন তরল গলায় বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার মিনিয়ান, আমার সম্পর্কে তাঁর মনে কোন উচ্ছ্বাস জাগবে না।

অ্যান রাটলাজের মৃত্যুর পর সারা জীবনের মত তাঁর প্রেম-পর্ব শেষ হয়েছে এসম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন লিঙ্কন। মনে হয় নিজের চেহারার ব্যাপারে তিনি হীনমান্যতায় ভুগতেন। নয়তো তাঁর ধারণা ছিল, আর কোন মেয়ে তাঁকে পছন্দ করবে না। তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগও তাঁর কম ছিল, অবশ্য আরো অনেকের মত সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টাও তিনি করতেন না।

অতিথিরা প্রায় সকলেই এসে পড়েছেন।

শহরের সেরা তরুণরা হাসি আর গল্পে ভরিয়ে তুলেছে এডওয়ার্ডসের ড্রইংরুম। গৃহস্বামীর কিন্তু সেদিকে মন নেই। তিনি ঘন ঘন তাকাচ্ছেন দরজার দিকে। মেরী টিফ ডগলাসের সঙ্গে মৃদু গলায় কথা বলছে। খাটো গড়নের সুশ্রী তরুণী। তার দিদি এলিজাবেথও রয়েছেন কাছাকাছি।

—এস, এব। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

এডওয়ার্ডসের কথায় সকলে দরজার দিকে মুখ ফেরালেন। মেরী দেখল ঘরে প্রবেশ করছেন একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। সুশ্রী তাঁকে বলা চলে না, তবে ব্যক্তিত্ব যেন ফেটে পড়ছে। লিঙ্কন মৃদু হেসে সকলকে অভিবাদন জানালেন।

—মেরী এদিকে এস। এবের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

এলিজাবেথ ভ্রূ কুঁচকালেন।

পরিচয়ের পালা শেষ হল।

লিঙ্কন বললেন, নিনিয়ানের মুখে আপনার কিছু প্রশংসা আমি শুনেছি।

—উনি একটু বাড়িয়েই বলেন আমার সম্পর্কে।

এডওয়ার্ডস কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, এব, একটু সাবধানে এগিও। আমার সুন্দরী শ্যালিকার ধারণা, যাকে বিয়ে করবে, সে নাকি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হবে।

হাসি আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যা চমৎকারভাবে কেটে গেল।

এরপর মাস ছয়েক কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার লিঙ্কনের সঙ্গে দেখা হয়েছে মেরীর। মনের মধ্যে বিপ্লব দেখা দিলেও, লিঙ্কন মুখ ফুটে কিছু বলেননি। চাঁদ ধরতে যাওয়ার অপচেষ্টা না করাই ভাল। ধনী আর সুন্দর তরুণের অভাব নেই। তাদের মধ্যে কারুর জায়গা এতদিনে নিশ্চয় মেরীর মনে হয়ে গেছে।

এলিজাবেথ কিন্তু ধৈর্য রাখতে পাচ্ছেন না। তাঁর বোন যে এখনও কাউকে জীবনসাথী হিসাবে মনোনীত করতে পারেনি তা তিনি জানেন। আর কত সময় নেবে সে! এবার নভেম্বর মাসেই শীত বেশ ঘনিয়ে এসেছে। এডওয়ার্ডস ফায়ার প্লেসের সামনে বসেছিলেন। এলিজাবেথ দৃঢ়বদ্ধ মনোভাব নিয়ে এলেন, স্বামীর সঙ্গে মেরীর বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে।

—বাবার চিঠি এসেছে।

—আজ এলো?

—হ্যাঁ। আজই এসেছে। তিনি জানতে চেয়েছেন মেরীর বিয়ের কতদুর কি হল?

এডওয়ার্ডস মুখ তুলে বললেন, তাঁকে লিখে দাও—

এলিজাবেথ স্বামীকে থামিয়ে বললেন, না, আমি তাঁকে লিখতে পারব না, এখনও কিছু হয়নি। ব্যাপারটা আর মেরীর উপর ছেড়ে রাখা যায় না, কি বল?

আমরাই বরং—

—তা হয় না লিজা। ওর ভবিষ্যত ও নিজেই স্থির করবে। করবে কি বলছি, ইতিমধ্যে করে চুকেছে।

—তার মানে?

—ওর স্বামী পছন্দ হয়ে গেছে।

—তুমি বলতে চাও—

একটু হেসে এডওয়ার্ডস বললেন, না, আমি কিছু বলতে চাই না। সে কিছুক্ষণ আগে আমাকে যা জানিয়েছে সে কথাই বলতে চাইছি।

—নিশ্চয় ডগলাস?

—না।

—তবে?

—এব।

প্রায় এক মিনিট এলিজাবেথ কথা বলতে পারলেন না। তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এ হতে পারে না। মেরী কত বড় পরিবারের মেয়ে। শিক্ষিতা, সুন্দরী—! মিঃ লিঙ্কনের সঙ্গে তাকে মানাবে না। তিনি তো—

—এব দেখতে সুন্দর নয়, অতি সাধারণ ঘরের ছেলে—একথা সবাই জানে। কিন্তু এতে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে? মেরীর তাকে পছন্দ, মনে হয় এটাই হল শেষ কথা।

এলিজাবেথ কিছু বলার আগেই মেরী সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার মুখের ভাব দেখে মনে হয় সে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা শুনতে পেয়েছে। এডওয়ার্ডস তার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন।

—আমার সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছিল মনে হয়।

উত্তেজিতভাবে বললেন এলিজাবেথ, তুমি নাকি মিঃ লিঙ্কনকে বিয়ে করতে চাইছো?

—হ্যাঁ।

—আমি জানতে চাই কেন? কি এমন গুণ তাঁর মধ্যে আছে যা দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পার আমি ভেবে পাচ্ছি না।

মেরী শান্ত গলায় বলল, এই প্রসঙ্গে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু এত কথায় আমি যাব না। শুধু এইটুকু বলব, আজ পর্যন্ত যত লোককে আমি জেনেছি—তার মধ্যে ওই ভদ্রলোকই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর ভবিষ্যতের সঙ্গে আমি নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারি।

—তুমি ভুল পথে চলেছো—কষ্ট পাবে।

নিনিয়ানকে বিয়ে করে তুমি যদি সুখী হয়ে থাক, তবে আমারও তো অসুখী হবার কোন কারণ নেই।

নিনিয়ান এডওয়ার্ডস এবার বললেন, যদি কিছু মনে না কর তাহলে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

—বলুন?

—সেই ভদ্রলোক জানেন কি, তুমি তাঁকে বিয়ে করতে চাইছো?

—না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এখানে আসবেন। তাঁকে আমি পরিষ্কার ভাবেই সমস্ত কথা বলব।

এলিজাবেথ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কি যে হতে চলেছে, আমার ভাবতেও ভয় করছে। মেরী আমার কথা শোন, ছেলেখেলা নয়, সারা জীবনের ব্যাপার—বিষয়টি নিয়ে তুমি ভালভাবে চিন্তা করে দেখ।

পরিচারিকা এসে জানাল, মিঃ লিঙ্কন সাক্ষাত প্রার্থী।

এডওয়ার্ডস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

তারপর স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

—চল লিজা এবার আমরা অন্যত্র যাই। ওদের দুজনকে একান্তে কথা বলার সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত।

—কিন্তু—

—কোন দ্বিধা আমাদের আসা উচিত নয় লিজা। মেরীর ব্যক্তি-

স্বাধীনতায় হাত আমরা দেব না। নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা ভাবনা ওকেই করতে দাও। এস আমরা পাশের ঘরে যাই।

অনিচ্ছুক এলিজাবেথকে একরকম টানতে টানতে ওঘরে নিয়ে গেলেন এডওয়ার্ডস।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সেদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে দৃষ্টি ফেরাল মেরী। লিঙ্কন প্রবেশ করলেন। এরকম অবস্থায় যে কোন মানুষই একটু সেজে-গুজে আসবে। তরুণী—বিশেষে সুন্দরী তরুণীর সামনে সকলেই নিজেকে মনোহর করে রাখতে চায়। কিন্তু লিঙ্কনকে দেখে সেরকম কিছু মনে হল না। অতি সাধারণ চাকচিক্যহীন পোশাক তাঁর গায়ে, এবং অতি দীর্ঘ শরীরে সেগুলি কিছুটা বেমানানও বটে।

তিনি স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে মুখ ভাসিয়ে অভিবাদন জানালেন।

বসলেন দুজনে সোফায়।

এলোমেলোভাবে কথাবার্তা হল কিছুক্ষণ।

তারপর—

—নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি?

মেরীর প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে থাকবার পর লিঙ্কন বললেন, অনুমান করতে পারিনি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। শুধু ভাবছি, অন্ধকারের দিকে এগুতে আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন?

—অন্ধকার। আমি আলোর পিয়াসী মিঃ লিঙ্কন।

—অবস্থা দেখে তা কিন্তু মনে হয় না।

—মনে হয় না বলছেন?

—ঠিক তাই মিস মেরী। নিজের ভবিষ্যতকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করাই ভাল। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিলেই ঠকতে হয়। আপনি আমার সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানেন না। স্থির নিশ্চিত হবার আগে সমস্ত কিছু জেনে নেওয়া দরকার।

—বেশী কিছু জেনে আর কি হবে? আপনার সম্পর্কে যা জেনেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে তাকালেন লিঙ্কন।

তারপর বললেন তিনি, ষ্টিফ ডগলাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে। তার মত পুরুষরাই আপনার ভবিষ্যত উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন।

—কিভাবে বুঝলেন?

—ষ্টিফ নামকরা রাজনীতিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। সম্পদশালী—মেরী লিঙ্কনকে কথা শেষ করতে দিল না।

মৃদু হেসে বলল, মেয়েদের মনের খবর পুরুষরা কতটুকুই বা রাখে। আপনি কি জানেন, সব মেয়ের ভাল লাগার মাপকাঠি এক রকম নয়? কেউ পরিপূর্ণ ভবিষ্যতকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তবে সামনের দিকে পা বাড়ায়, আবার কেউ ভবিষ্যতকে গড়ে নিতে ভালবাসে।

—আপনি জানেন না—

—আমি জানি। আপনার বংশ-মর্যাদা নেই, স্কুল-কলেজের শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাও আপনার নেই।

—এরপরও কথা আছে। আপনি জানেন না আমার আরও অনেক কিছু নেই।

—বললাম তো আমি জানি—সব জানি। উঁচু সমাজের মানুষ আপনাকে গেঁও বলে অবজ্ঞা করে, জন্মলগ্ন থেকেই দারিদ্র্য আপনার পিছু নিয়ে রয়েছে। বললাম তো সমস্ত আমার জানা আছে।

মহাবিস্মিত লিঙ্কন বললেন, আপনি কেণ্টাকী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের মেয়ে।

—হ্যাঁ।

—অতি স্বচ্ছল পরিবেশে আপনি বড় হয়েছেন।

—ঠিকই বলছেন।

—অথচ আপনাকে গিয়ে পড়তে হবে বিপরীত পরিবেশে। নগ্ন দারিদ্র্য কাকে বলে আপনি জানেন না। তারপর—

—তারপরের কথা এখন ভেবে লাভ নেই। আমি তো আগেই বললাম, এমন মেয়েও রয়েছে যে ভবিষ্যত গড়ে নিতে চায়।

জীবনে লিঙ্কন অনেক কিছু দেখেছেন। তবে তাঁকে স্বীকার করে নিতে হল, এমন মনের পরিচয় আগে কখনও পাননি। কেমন অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি। অবশ্য একথাও তাঁর মনে হতে লাগল, এই বোধ হয় অনিবার্য পরিণতি। স্থানীয় সমস্ত অভিজাত তরুণ যাকে লাভ করার জন্য অধীর হয়ে রয়েছে, সেই মেরী টডের, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ অভাবনীয় সন্দেহ নেই—তবে নানা অক্ষমতা থাকলেও ওকে মেনে নিতে হবে। মেরীর ব্যবহারেই হয়তো ভাগ্যের ইঙ্গিত নিহিত।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন লিঙ্কন।

শেষে—

—সমস্ত কিছু জানার পর, আমার মত একজন কদাকার মানুষকে যদি আপনি নিজের জীবন-সাথী করতে চান—সত্যি কথা বলতে কি, এরপর আর আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। তবে—

—বলুন—

—মিঃ এডওয়ার্ডস আপনার মনের কথা জানেন কি ?

—তাঁকে আমি সমস্ত বলেছি। খুসী হয়েছেন। তিনি যে আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয় তা আপনার অজানা নয়।

—সে কথা আমি ভালভাবেই জানি। তাঁর আগ্রহ আর সহযোগিতাতেই আমার পক্ষে আইন পরিষদে প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছে। আপনার বাবা—তিনি কি—

—না। তাঁকে এখনও কিছু বলা হয়নি। মনে হয় তিনি রাজী হবেন।

প্রশ্ন ফুরিয়ে গেল। এরপর কি বলা উচিত লিঙ্কন ভেবে পেলেন

না। আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। তিনি কিছু বলছেন না দেখে মেরীই আবার কথা বলল।

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি ? না, আর কিছু ভাববার নেই।

—তবে কিছু বলুন ?

একটু ইতস্তত করলেন লিঙ্কন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, আজ সত্যি আমার অবাক হবার দিন মেরী। ভবিষ্যতে আরো কত বৈচিত্র্য যে অপেক্ষা করছে ঈশ্বর জানেন।

মেরীর মুখে নরম হাসি ফুটে উঠল।

—অত দূরে নয়—আমার পাশে এস বস।

লিঙ্কন নিজের সোফা ছেড়ে মেরীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

টেবিলের উপরকার অগোছাল কাগজের স্তূপকে তখন গুছিয়ে রাখছিল উইলি। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা-খচিত পতাকার দিকে। পতাকাটি টেবিলের একটু উপরে দেওয়ালের সঙ্গে আটকান রয়েছে। উইলি ঘরে একা নেই, হার্ণডানও রয়েছে। অন্যধারে বসে সে যেন কি লিখছে।

এবার বলল, তুমি পতাকার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছ কেন ?

সঙ্কুচিত ভাবে উইলি বলল, পতাকায় কতগুলো তারকা আছে মনে রাখতে পারি না। সেই কারণে মাঝে মাঝে গুনে দেখে নিচ্ছিলাম।

—যতগুলো তারকা পতাকায় আছে ততগুলো প্রদেশ নিয়ে আমাদের দেশ। তবে আমার কি মনে হচ্ছে জান—

—কি মনে হচ্ছে আপনার ?

—এতগুলো তারকা হয়তো শেষ পর্যন্ত পতাকায় থাকবে না। দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলোর মতিগতি সুবিধার নয়।

—মতিগতি সুবিধার নয় কেন বলুনতো? উত্তরের লোকেরা কি ওদের কোন ক্ষতি করেছে?

মহা বিরক্ত হয়ে হার্ণডান বলল, তুমি তো আচ্ছা উজবুক দেখছি। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে উত্তরের মানুষ আওয়াজ তুলেছে—দক্ষিণীদের কখনই তা ভাল লাগছে না। এরপর সত্যি যদি কোন দিন দাসপ্রথা বিলোপ করা হয় আইন করে তখন কি ওরা যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে থাকতে চাইবে? মনে হয় না।

উইলি এবার কি বলবে ভেবে পেল না। এই গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তার নেই। একথা যে হার্ণডানের অজানা আছে তা নয় তবু সে রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে উইলিকে টেনে আনবেই। ঠিক এই সময় লিঙ্কন ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখের উপর সব সময় যে কৌতূকের ছায়া বিরাজ করতে থাকে এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। পরিবর্তে শান্ত সমাহিত ভাব বিরাজ করছে।

—আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে কি বলা হয়েছে হার্ণডান?

ঘরে প্রবেশ করার আগে লিঙ্কন হার্ণডানের কথা শুনতে পেয়েছেন।

—অনেক কথাই বলা হয়েছে স্যার।

—ঠিকই বলেছো। তবে তার মধ্যে একটা বিশেষ কথা আছে, আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি করার সময় সেই বিশেষ কথাটা বার বার স্মরণ রাখতে বলেছেন—যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান। কোন ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

—কালোরা সাদা নয় স্যার। ঘোষণাপত্রে ওই কথা অনেকে মানবে না।

—মানতে হবে হার্ণডান। তুমি বলছিলে না, দাসপ্রথা যদি কোন দিন বিলোপ হয় তাহলে দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে না থেকে আলাদা হয়ে যাবে?

—এই রকমই হবে আপনি দেখে নেবেন।

হতে দেওয়া হবে না। শক্ত হাতে ওদের ধরে রাখা হবে। ওই সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের মানবতাকে অপমান না করার অপরাধে অভিযুক্ত করতে হবে।

—কিন্তু একাজের দায়িত্ব নেবে কে? কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছেন। তাঁরা দাসপ্রথা বিরোধী এবং দাসপ্রথা সমর্থক—তুপক্ষকেই খুসী করে চলেছেন।

লিঙ্কন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সত্যি তো, দায়িত্ব নেবে কে? হার্ণডান মিথ্যে বলেনি। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট এবং সরকার এই ব্যাপারে এত নিস্পৃহ যে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বিশ্বের আর কোন দেশের পরিচালকমণ্ডলীর এমন লজ্জাজনক তুরদৃষ্টির অভাব আছে কিনা সন্দেহ।

ওই প্রসঙ্গকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে লিঙ্কন বললেন, এই চার দেওয়ালের মধ্যে বসে আমরা ওই ব্যাপারের কতটুকুই বা করতে পারি। ও প্রসঙ্গ এখন থাক। তোমাদের বরং নতুন ধরনের খবর শোনাই।

হার্ণডান আর উইলি উৎসুক হয়ে তাকাল।

—আর কিছু দিন পরে, জানুয়ারী মাসের প্রথমেই আমি বিয়ে করতে চলেছি। নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছ, পাত্রী মেরী টড।

উইলি হর্ষসূচক শব্দ করল।

হার্ণডান বলল, অত্যন্ত সুখবর স্যার। তবে আপনাকে—

—থামলে কেন? বল?

—আমি একটু অবাক হচ্ছি। এরকম একটা ব্যাপারের পর আপনি যথেষ্ট আনন্দিত হবেন এই রকমই আশা করা যায়, আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

—তুমি ঠিকই বলেছো হার্ণডান। মেরী টডের মত যুবতীকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই। অনেক উমেদারকে

পাশ কাটিয়ে আমি সেই ভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছি। তবুও পরিপূর্ণ আনন্দ বলতে যা বোঝায় তা অনুভব করতে পাচ্ছি না।

—বিচিত্র ব্যাপার স্যার।

—বিচিত্র তাতে সন্দেহ নেই। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমাদের দুজনের মধ্যে এখন যে বিরাট অসাম্য রয়েছে তার দূরত্ব কখনই কমবে না বরং আরো দুস্তর হয়ে উঠবে। তাই ভাবছি—

—আপনি কি বিয়ে বাতিল করে দেবার কথা ভাবছেন?

—কি যে ঠিক ভাবছি আমি, নিজেও পুরোপুরি জানি না। তাই অস্বস্তিবোধ মনের মধ্যে পাক খেয়ে চলেছে। ও কথা থাক, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাববার অনেক অবকাশ পাওয়া যাবে। আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। উইলি সঙ্গে যাবে নাকি?

লিঙ্কন দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

উইলি অনুসরণ করল তাঁকে।

কি ভাবে যেন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

হিতাকাঙ্খীরা সকলেই খুশী হলেন। লিঙ্কন গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে চলেছেন, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। মেরী টডের মত প্রাণময়ী, সুরূপা যুবতীকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া কম কথা নয়। অবশ্য কিছু মানুষ ঈর্ষার আগুনে পুড়তে লাগলেন। তাঁরা ভেবে পেলেন না, ওই কদাকার দীর্ঘকায় পুরুষটির মধ্যে মেরী এমন কি পেলেন, যাঁর জন্য তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করতে চলেছেন?

যাঁকে নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা চলছে চারিধারে, তিনি কিন্তু আর এক চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চলেছেন। বিয়ের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই মনে হচ্ছে সমস্ত নিরর্থক—এ বিয়ে না হওয়াই ভাল! কারণ—তিনটি কারণ লিঙ্কনকে ভীষণ উতলা করে রেখেছে। প্রথম, মেরী যাই বলুক, এই অসম বিবাহ কখনই সুখের হতে পারে

না। দ্বিতীয়, মেরীর উচ্চ আশা তাঁকে চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলবে। তৃতীয়, তিনি দ্রুত নিজের স্বাধীনতা হারাবেন।

কিন্তু এখন তিনি করবেন কি?

সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

মেরী চায়, লিঙ্কন বিরাট রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠুন। তাঁর যাতায়াত নিয়মিত ওয়াশিংটনে হোক। প্রতিষ্ঠায় সকলকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যান। কি ভাবে এই সব সম্ভব তাও নাকি তার জানা আছে। লিঙ্কনের কিন্তু জানা আছে, তাঁর মত গেঁও মানুষের পক্ষে অত উঁচুতে ওঠা কোন দিনই সম্ভব হবে না। তিনি বরং ভাল আইনজ্ঞ হবার জন্য যদি চেষ্টা করেন তবে তা সম্ভব হলেও হতে পারে।

চরম উদ্বিগ্নতার মধ্যে লিঙ্কনের সময় কাটতে লাগল।

সময় কারুর অপেক্ষায় থাকে না। দেখতে দেখতে সেই দিনটি এসে গেল। এই দিনটির মুখোমুখি লিঙ্কন এখনই হতে চাইছিলেন না। কিন্তু তাঁর চাওয়া না চাওয়াতে কি আসে যায়—আজই মেরীকে বিয়ে করার জন্য সবান্ধবে গির্জায় যেতে হবে।

জোসুয়া স্পাড বহু আগাম এসে পড়লেন।

বরের অনুগামীদের মধ্যে তিনিই প্রধান। তাঁকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে। তিনি টুপি মাথা থেকে নামিয়ে হার্ণডানের দিকে তাকালেন। সেও আগে-ভাগেই সেজেগুজে তৈরী হয়ে রয়েছে। দেখা গেল ওপাশের দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারছে উইলি! কর্তার বিবাহ উপলক্ষ্যে সেও কিছু কম উত্তেজিত নয়।

—আজ দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে কি বল?

হার্ণডান কোটের কলার আরেকটু তুলে বলল, গত বছর নববর্ষের সময়ও এই রকম ঠাণ্ডা ছিল।

—আমাদের বর কোথায়? সাজগোজে ব্যস্ত নাকি?

—মনে হয় না। তিনি ওসমস্ত ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখুন।

—কেন—কেন—

স্পীড আশ্চর্য হলেন।

—তুমি ও-কথা বলছো কেন?

—বিয়ে করতে চলেছে এমন কাউকে এত গোমড়া হয়ে থাকতে আমি দেখিনি। জল ভরা ঘন মেঘ যেন তিনি নিজের মুখের উপর নামিয়ে এনেছেন। ব্যাপার খুব সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না।

মৃদু হেসে স্পাড বললেন, ঘাবড়ে গেছে।

—কেন বলুন তো?

—তুমিও ঘাবড়াবে।

—আমিও—!

—নিশ্চয়। আমিও বিয়ে করতে যাবার আগে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

লিঙ্কন ঘরে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে যাঁর পরিণয় সম্পন্ন হতে চলেছে, তাঁর এই বিষণ্ন হাবভাব সত্যি বিস্ময়কর। তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন। তারপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লেন চেয়ারে।

—মিঃ স্পাড আমার একটা উপকার করবেন।

—সাধ্যে কুলালে অবশ্যই করব।

লিঙ্কন পকেট থেকে একটা খামে মোড়া চিঠি বার করে বললেন, কোন শক্ত কাজ নয়। মেরীকে এই চিঠিখানা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

—চিঠি!

জোস্য়া স্পীড আশ্চর্য হলেন।

—তোমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে যেতে আর তো বেশী সময় বাকী নেই। এখন আবার চিঠি কেন?

—এর প্রয়োজনীয়তা এখনই মিঃ স্পাড। এই চিঠি লেখার

পিছনে আছে আমার দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা। অনুগ্রহ করে এটা নিয়ে আপনি মেরীর কাছে চলে যান।

—অনুগ্রহ দেখাবার মত কোন ব্যাপারই নয়। যেতে আমার কোন অসুবিধাই হবে না। মনে হচ্ছে কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেছো এই চিঠিতে। আপত্তি না থাকলে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বল।

একটু ইতস্তত করে লিঙ্কন বললেন, আপত্তি করার মত কিছু নেই। বরং ও সম্পর্কে বলতে পারলেই আমি খুশী হব।

—বাকী জীবন যখন দুজনে পাশাপাশিই থাকবে তখন আর চিঠি কেন? পরে মুখেই তো বলতে পারতে?

—সে সুযোগ পাবার সম্ভাবনা নেই। আসল কথা হল, আমাদের বিয়ে হচ্ছে না।

ঘরে যেন বজ্রাঘাত হল।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন স্পীড। হার্ণডানও।

—এই বিষয় নিয়ে আমি দিনের পর দিন ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত আমাকে এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েছে।

তীক্ষ্ণ গলায় স্পীড প্রশ্ন করলেন, এই সিদ্ধান্তের পিছনে কি যুক্তি আছে আমরা জানতে পারি কি?

—যুক্তিহীন কোন ব্যাপারে ছুটছি না তা আপনি অনুমান করতে পেরেছেন দেখে খুশী হলাম। মেরী চায়, আমি রাজনীতির তুঙ্গে বিরাজ করতে থাকি। কিন্তু আপনারা তো জানেন, সে প্রতিভা বা সে সাধ্য আমার নেই। সে এ সমস্ত কথা বুঝতে চাইবে না। নিজের ইচ্ছার স্বার্থক রূপ দেখার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবে। মাঝ থেকে সংসারে ঘোর অশান্তি দেখা দেবে। এই দাম্পত্য জীবন কতদিন আমি টেনে নিয়ে যেতে পারব। তার চেয়ে আগেই সরে দাঁড়ান কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

—তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়?

এব, আমি তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে করতাম।

—বোকার মত আমি কিছু করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

তীক্ষ্ণ গলায় স্পীড বললেন, তার চেয়ে অনেক খারাপ কাজ তুমি করতে চলেছো। এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে এখন কেন—আগে সমস্ত ওঁদের জানিয়ে দাওনি কেন? একটি পরিবারের সম্মান নষ্ট করার এবং একটি যুবতীর মন ভেঙ্গে দেবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

লিঙ্কন থতিয়ে গেলেন।

তারপর থেমে থেমে বললেন, আপনার এই অভিযোগ আমি অস্বীকার করতে পারি না। নিজের অক্ষমতার কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—শেষ সময়ে এই নাটকের অবতারণা না করলেই ভাল হত। অপরাধ স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে। যাক্ আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মিঃ স্পীড আপনি কি—

—ক্ষমা কর এব, চিঠি নিয়ে আমি মিস টডের কাছে যেতে পারব না।

—আপনি গেলেই কিন্তু ভাল হত।

—বললাম তো পারব না।

রাগতভাবে তিনি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

লিঙ্কন হার্ণডানের দিকে তাকালেন।

—তুমি কি—

—আপনি আমায় চিঠি নিয়ে মিস টডের কাছে যেতে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—ক্ষমা করবেন স্যার, ওই রকম হৃদয়বিদারক কাজ আমার পক্ষে করা কখনই সম্ভব হবে না।

—চিঠিটা তো ওখানে পৌঁছান দরকার।

—হতে পারে। একটা চিঠি ঠিকানা মত পৌঁছে দেবার মত লোকের অভাব হবে না। আপনি আর কাউকে বলুন স্যার।

লিঙ্কনের মুখে অস্থিরতার ছায়া পড়ল।

তিনি কিছুটা দ্রুত গলায় বললেন, উইলি, এদিকে শোন—

উইলি দরজার ওপাশেই ছিল। ঘরে প্রবেশ করল। এতক্ষণ সে সমস্ত কথাই শুনেছে। বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত কর্তা নিয়েছেন তা সে মোটেই মেনে নিতে পাচ্ছে না, মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

—উইলি, এখুনি তোমাকে মিঃ এডওয়ার্ডসের বাড়ী যেতে হবে। এই চিঠিখানা মিস মেরীর হাতে গিয়ে দেবে। নাও, রওনা হয়ে পড়।

—এই নিষ্ঠুর কাজ আমাকে দিয়ে আশা করবেন না।

—তুমিও আপত্তি করছ!

—মিস মেরাকে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব না। এর জন্য যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিঙ্কন বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না। চিঠি দিয়ে আর কাজ হবে না বুঝতে পাচ্ছি। অপ্রিয় কাজটা আমাকেই করতে হবে গিয়ে। চলি—

—তুমি তাহলে আমাদের কথা শুনবে না?

—আপনারা বিশেষ ক্ষুণ্ন হয়েছেন বুঝতে পাচ্ছি মিঃ স্পীড। কিন্তু কি করব? আমার সামনে আর তো কোন পথ খোলা নেই।

মন্থর পায়ে লিঙ্কন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৭ ॥

দুবছর কেটে গেছে এরপর।

নামকরা উকীল হবার বাসনা লিঙ্কনের সফল হয়নি। তবে সিনেটে প্রবেশ করে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবেন এই ইচ্ছে অবশ্য তাঁর অনেক দিনের। তবে তাতেই কিছু ভাল রাজনীতিজ্ঞ হয়ে ওঠা যায় না এই ধারণাও তাঁর ছিল। অজান্তেই তিনি কিন্তু বক্তা হয়ে উঠেছিলেন। পরিচিত গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর নাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। এমন কি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষরাও মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলেন, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন নামে উত্তরের কে একজন দাস-প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

অচিরেই তাঁর শত্রু সৃষ্টি হ'ল।

তিনি অবশ্য সতর্ক আছেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন ষ্টিফ ডাগলাস। এই ভদ্রলোকের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী ছিল। তিনি একজন ধনী ব্যবহারজীবী এবং পরে ইলিনয় স্টেটের মন্ত্রী। মানুষের মন জয় করা যায় এমন শব্দ চয়ন করে, গুছিয়ে বক্তৃতা করতে পারেন। তাঁর গোপন ইচ্ছে হল, যে কোন উপায়ে হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদ অধিকার করা। এর জন্য তিনি প্রয়োজন বোধে দাসপ্রথার স্বপক্ষেও মত প্রকাশ করবেন, বিপক্ষেও মত প্রকাশ করবেন!

ডাগলাস অবশ্য প্রথম দিকে লিঙ্কনকে উপেক্ষা করেই চলতেন। ওই বিশ্রী ধরনের গেঁও মানুষটা আর তাঁর কি ক্ষতি করতে পারবে এই ধারণাই ছিল। ক্রমেই কিন্তু তিনি বুঝলেন, যাকে অতি তুচ্ছ মনে করেছিলেন সে সহজ ব্যক্তি নয়। বহুক্ষেত্রে লিঙ্কনের প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা উগ্র হয়ে উঠছে।

ডাগলাস সতর্ক হলেন।

একটা সত্য এতদিন পরে কিন্তু লিঙ্কনের সামনে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ; মেরীকে তিনি বিয়ে করতে চান নি, কারণ তার উচ্চ আশা তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলবে বলে। অথচ এখন তিনিই চান, প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ হতে, দেশের ঐক্যকে যে অসাম্য ঘুণপোকার মত জীর্ণ করে চলেছে তা দূর করার যে কোন প্রয়াসে আপ্রাণভাবে অংশ গ্রহণ করতে।

বিচিত্র মনের গতি।

লিঙ্কন এখন এক এক সময় ভাবেন আর লজ্জিত হন। কি বিশ্রী কাণ্ডই না সেদিন করেছেন। মেরীর মনোভাব তো তাঁর প্রতিকূল ছিল না। সে তাঁর উৎস হয়ে এগিয়ে আসতে চেয়েছিল—সে চেয়েছিল তিনি মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়ান।

শেষ পর্যন্ত লিঙ্কনকে মনোস্থির করে ফেলতে হল। মেরী যদি তাঁর অতীতের কার্য্যকলাপ ক্ষমার চোখে দেখে তবে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। বেশ বুঝতে পাচ্ছেন মেরীকে পাশে না পেলে বাকী জীবন কখনই ভালভাবে কাটবে না। বিয়ের ব্যাপারে আর সময় নষ্ট না করে, সঙ্কোচ এড়িয়ে এখনও না যাওয়াটাই নির্বুদ্ধিতা। সেদিন জোস্য়ুা স্পাড ঠিকই বলেছিলেন, কোন পরিবারের সম্মানকে নিয়ে খেলা করার অধিকার তাঁর নেই।

সত্যি, সেদিন কি খামখেয়ালীপনার পরিচয়ই না দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পক্ষে এরকম কাজ করা যে কিভাবে সম্ভব হ'ল তিনি ভেবেই পান না। এতে তো কোনই সন্দেহ নেই, যে কোন দিক দিয়ে তিনি মেরীর উপযুক্ত নন, তবু সে তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল!

লিঙ্কন মনকে দৃঢ় করলেন।

আর অপেক্ষা নয়, অনেক হয়েছে।

—উইলি—উইলি—

উইলি দ্রুত ঘরে প্রবেশ করল।

—বলুন মাশা—

—আমার ওভারকোটটা নিয়ে এস। পরিষ্কার আছে তো?

—খুব অপরিষ্কার নয়। তবে কাঁধের কাছে একটু ধুলো জমেছে।

—জমতেই পারে। ওটা পরেই তো যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করতে। এধারকার গ্রামগুলোয় বড্ড ধুলো, কি বল?

—গ্রাম তো ধুলোরই রাজত্ব মাশা।

—তা বটে।

উইলি চলে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে লিঙ্কন বললেন, কোটটা ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে এস। আমি এখুনি একবার মিঃ এডওয়ার্ডসের বাড়ী যাব ভাবছি।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে উইলি থামল।

—কি হল?

—প্যাণ্ট বদলাবেন কি?

—পরনে যেটা আছে তার চেয়ে ভাল প্যাণ্ট তো আমার নেই। শোন উইলি, একটা কথা তোমায় বলা হয়নি, সমস্ত ব্যাপারটা যদি ঠিক ঠিক এগোয় তাহলে বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি আমি বিয়ে করছি।

—বড় খুশী হলাম মাশা। তবে শেষ পর্যন্ত করবেন তো?

লিঙ্কন হেসে ফেললেন।

—এ সন্দেহ তোমার মনে জাগতেই পারে। তবে আর কোন গোলমাল হবে না। আমি মনোস্থির করে ফেলেছি। আর দেরী করো না, কোটটা নিয়ে এস গিয়ে।

মহা খুশী হয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল উইলি।

মেরী অনেকক্ষণ ধরে ড্রইংরুমে বসে বইএর পাতা উল্টাচ্ছিল। আজকাল কোন ব্যাপারেই সে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করতে পারে

না। চেহারায় কোন পরিবর্তন না এলেও, মনের দিক থেকে সর্বদা তাকে কিছুটা বিষণ্ণ বলেই সকলের ধারণা হয়।

বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর সে নিদারুণ অপমানিত বোধ করেছিল কিনা অনুমান করা দুষ্কর। তবে মিঃ এডওয়ার্ডসের ধারণা, আঘাত পেয়েছিল ঠিকই—অপমানিত বোধ করেনি। কারণ লিঙ্কনের জন্য তার মনে স্থায়ী আসন পাতা রয়েছে।

এলিজাবেথ কিন্তু অস্বস্তি বোধ নিয়েই রয়েছেন। বরং আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে চাইলে বলতে হবে, বোনের একগুঁয়েমিতে তিনি বেশ বিরক্তই। এ কি ধরনের ব্যাপার-স্যাপার—সমাজের উপযুক্ত তরুণরা দুবছর ধরে আসা-যাওয়া করছে—তাদের মধ্যে কাউকে পছন্দ হল না! বাকি জীবন বিয়ে না করেই কাটিয়ে দেবে নাকি?

অনেক হয়েছে আর নয়। এলিজাবেথ আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে চান। কয়েকবারই ড্রইংরুমে এসেছেন আবার বেরিয়ে গেছেন। বলি বলি করেও বলা হয়নি। এবার বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে বসলেন মেরীর সামনে। মেরী বই মুড়ে এক পাশে রাখল। তাকাল দিদির গম্ভীর মুখের দিকে।

—আমি তোমায় কিছু বলতে চাই।

—বল?

—কোন হাল্কা কথা নয়। আমি তোমার মুখ থেকে পরিষ্কার ভাবে আজ সমস্ত কিছু জানতে চাই।

—কোন বিষয়ে?

—তুমি মিথ্যা ভান করছো। আমি কি জানতে চেয়েছি, বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই। আমাদের উদ্বেগের কোন মূল্যই কি তুমি দেবে না?

—এ তোমার অন্যায় অভিযোগ দিদি। তবে সত্যি যদি আমি তোমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়ে থাকি তবে আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

দ্রুত গলায় এলিজাবেথ বললেন আমি সে কথা বলিনি। নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কি স্থির করেছো আমি জানতে চাই। তুমি যদি কুমারীই থেকে যেতে চাও তাওতো আমার জানা দরকার।

মৃদু হেসে মেরী বলল, আমি কুমারী থাকব এ কথা তোমার মনে এল কেন ?

—তবে এত সময় নষ্ট করার কারণ কি ?

—যাকে তাকে তো আর বিয়ে করা যায় না। উপযুক্ত লোকের অপেক্ষায় রয়েছি।

—উপযুক্ত তুমি কাউকে দেখতে পাচ্ছ না। তোমার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মেরী। এত ভাল ভাল ছেলে আসা-যাওয়া করছে—তাদের মধ্যে কাউকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না।

—তোমাকে বোধহয় আগে একবার বলেছি, ভাল লাগার মাপকাঠি সকলের একরকম হতে পারে না! তুমি যাকে ভাল বলছো, আমার তাকে ভাল লাগবে তার কি মানে আছে ?

এলিজাবেথ কিছু বলার আগেই পরিচারিকা ঘরে এল।

—মিঃ লিঙ্কন এসেছেন।

মিঃ লিঙ্কন!!!

বিস্ময় থিতিয়ে আসতে কয়েক মিনিট সময় লাগল।

মেরী বলল, তাঁকে এখানে নিয়ে এস!

তীক্ষ্ণ গলায় এলিজাবেথ বললেন, ব্যাপার কি ? তিনি আবার এখানে—

—আসতেই পারেন। তিনি গৃহকর্তার বন্ধু। তবে বহু দিন পরে এলেন এই যা—।

—তুমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলবে ?

—নিশ্চয়।

আর কিছু না বলে গম্ভীর মুখে এলিজাবেথ উঠে গেলেন। লিঙ্কন ঘরে প্রবেশ করলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। চেষ্টা করেও যে সঙ্কোচ

সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন নি, তাঁর ভাবভঙ্গী দেখেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। পোশাক-আশাকে পারিপাট্য আজ লক্ষ্যনীয়। চুল আঁচড়ে এসেছেন বেশ ভাল ভাবেই।

মেরী আবেগ দমন করতে করতে বলল, আসুন মিঃ লিঙ্কন। বসুন। অনেক দিন পরে দেখা হল।

—প্রায় দুবছর পরে। ভাল আছো তো?

—হ্যাঁ। আপনার সংবাদ জোস্যুয়া স্পীড অবশ্য আমাদের দিয়ে থাকেন। চমৎকার মানুষ তিনি।

—হ্যাঁ। চমৎকার মানুষ মিঃ স্পীড। মেরী আজ তুমি আমাকে এখানে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাচ্ছ?

—এ বাড়ীতে তো আপনি যখন তখনই আসতে পারেন।

—তা পারি। তবুও এত দিনের মধ্যে পারিনি। সঙ্কোচ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন যে ব্যবহার আমি তোমার সঙ্গে করেছিলাম তার চেয়ে বিশ্রী আর কিছু হতে পারে না।

—আপনি সে দিন অসুস্থ ছিলেন।

—হয়তো।

—এখন নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনি আবার নির্বাচন প্রার্থী হবেন এই আমরা দেখতে চাই।

—আবার নির্বাচনে দাঁড়াব কিনা এখনও স্থির করিনি। আসল কথা হল, কি যে আমার করা উচিত আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। ও কথা এখন থাক। আমাদের যে দিন বিয়ে হবার কথা ছিল, সেদিন আমি তোমায় এমন অনেক কথা বলেছি যা আমার বলা ঠিক হয়নি। তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পার না মেরী?

—এ আপনি কি বলছেন? দোষ তো আমারই। আমি চেয়েছিলাম—

—দোষ তোমার?

এতক্ষণে মেরী নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

সে সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ, আমার।

এরপর মেরীর গলা প্রায় বুজে এল।

—আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল আপনিও আমাকে ভালবাসতে পারবেন। দুজনে এক হয়ে যাওয়ার পর আপনার মনে অসম্ভব দৃঢ়তা আসবে। আপনি মানুষের মত মানুষ হবেন—আপনার সফল নেতৃত্ব দেশকে নতুন আলো দেখাবে। আমার দুর্ভাগ্য আপনি এসমস্ত চাইলেন না। আপনি যা হতে পারেন তা থেকে দূরে সরে যাবার এমন প্রবণতা যে আপনার মধ্যে আছে আমি কল্পনাই করতে পারিনি। এই কল্পনা করতে না পারাটা আমার দোষ ছাড়া আর কি বলুন ?

লিঙ্কন অভিভূত হয়ে পড়লেন। মেরী যে এমন পরিষ্কার ভাষায় নিজের মনের কথা বলবে তিনি ভাবতে পারেন নি। সত্যি কথা বলতে কি এখন আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে দারুণ কুণ্ঠা জাগছে।

—আবার আমায় স্বীকার করে নিতে হচ্ছে সেদিনকার ব্যবহারের জন্য নিদারুণ লজ্জিত। আমাকে তুমি যেভাবে চিনেছো তার তুলনা খুঁজে পাচ্ছি না। এই ভাবে যে চলতে পারে না আমি তা অনুভব করেছি। আমি বড় হতে চাই এবং বলতে বাধা নেই, তোমার পথই এখন আমার পথ।

মেরীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

তবুও সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত মানুষটির দিকে।

লিঙ্কন গলায় আবেগ মিশিয়ে বললেন, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তুমি কি আমার স্ত্রী হতে রাজী আছ মেরী ?

—আমি—

—হ্যাঁ। তুমি। আমি জানি লোকে তোমায় উপহাস করবে। তারা মনে রেখেছে, একবার আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

—তাতে কিছু যায় আসে না। কে কি ভাবছে তা নিয়ে

আমরা মাথা ঘামাব না। যে পথ ধরে এগুলে জয়লাভ করা যায়, আমরা এগুতে থাকব সেই পথ ধরে।

—মেরী—

—এব—

—তোমার কি এখন আর কিছু বলার নেই ?

—তুমি আবার পিছিয়ে যাবে না তো ?

—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর—যা কিছু ভাল, যা কিছু ন্যায়, যা কিছু সুন্দর—বাকী জীবন আমি তাতেই উৎসর্গ করব।

সঙ্গে সঙ্গে মেরী কিছু বলল না।

সরে এল লিঙ্কনের খুব কাছে।

মৃদু গলায় বলল তারপর, আমি তোমার স্ত্রী হব। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকব তোমার পাশে পাশেই। আমি তোমায় ভালবাসি। এব, তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি।

কথা শেষ করেই মেরী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। রুদ্ধ আবেগ এতদিন পরে কূল ছাপিয়ে চলল। অপরাধীর দৃষ্টিতে মেরীর দিকে তাকালেন লিঙ্কন, তারপর তার কাঁধে হাত রাখলেন।

দিন গড়িয়ে চলল।

একে একে তিনটি পুত্র সন্তানের জনক হলেন লিঙ্কন। মেরীকে বিয়ে করার সময় বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবশ্য করতে পারেন নি, তবে সেই অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। এবং পরে ঘনিষ্ঠরা সকলেই স্বীকার করেছেন, দাম্পত্য জীবন এমন চমৎকার বোঝাপড়া আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে না।

আট বছর প্রাদেশিক রাজনীতিতে থাকবার পর লিঙ্কন মার্কিন

সিনেটে নির্বাচিত হয়েছেন। দাস-প্রথা বিলোপের উপর তাঁর বক্তৃতাগুলি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বলা বাহুল্য এখানেও ষ্টিফ ডাগলাস তাঁর বিরোধিতা করছেন। অসম্ভব সুবিধাবাদী এই লোকটি উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী হয়েও দক্ষিণাঞ্চলের মনোভাবকে সমর্থন করেন।

দক্ষিণের অধিবাসীরা নিগ্রো দাস যদি রাখতে চায় রাখুক—এই তাঁর বক্তব্য। ডাগলাস ভালভাবেই জানেন, দেশের প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন সফল করতে গেলে, দাসপ্রথার সমর্থকদের তোয়াজ করে যেতে হবে। কারণ মার্কিন প্রশাসনের উপর তাদের আধিপত্যই বেশী।

দেখতে দেখতে ১৮৬০ সাল এসে গেল।

লিঙ্কনের জীবনে এটি স্মরণীয় বছর।

এই বছরই দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

সারা দেশে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ষ্টিফ ডাগলাস এতদিন ধরে যে চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন তাতে কিছুটা সফল হলেন। অর্থাৎ ডেমক্র্যাট পার্টির মনোনয়ন পেলেন তিনি। অবশ্য ওই দলের কিছু সমর্থকের সমর্থন পেয়ে আরো দুজন প্রার্থী আসরে নামলেন। তাঁরা দুজন হলেন, জন ব্রেকিনরিজ আর জন বেল।

সমস্যার মুখোমুখি হতে হল রিপাব্লিক্যান দলকে।

এই দলের অধিকাংশ পাণ্ডা দাস-প্রথা বিরোধী। তাঁরা এমন একজনকে মনোনয়ন দিতে চান যাঁর পক্ষে দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। অনেক নামই উঠল কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল না। ওদিকে ডেমক্র্যাট দল নির্বাচনী প্রচারে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে।

এই রকম যখন অবস্থা তখনই লিঙ্কনের কথা মনে পড়ল অনেকের। নিউইয়র্কে কিছুদিন আগে রিপাব্লিক্যান পার্টির যে

কনভেনশন হয়ে গেল তাতে তিনি বিশেষ ভাবে আহুত হয়েছিলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। সেদিন লিঙ্কনের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সকলেরই মনে রেখাপাত করেছিল।

উত্তরের এই সরল মানুষটি লুকিয়ে-ছাপিয়ে কিছু বলেন না। যা বলেন তা অকপটে বলেন—যা সত্য, যা ন্যায় তার পক্ষে থেকে সংগ্রাম করার জন্য নিজের শেষ বিন্দু রক্ত ব্যয় করতেও পশ্চাৎপদ হবেন না। লিঙ্কনকে মনোনয়ন দেওয়া যায় কিনা তার জন্য গভীর গবেষণা এবার আরম্ভ হল।

ওদিকে—

লিঙ্কন কিন্তু কিছুই জানেন না। তিনি স্প্রিংফিল্ডের অন্যতম বিচারপতি এখন। নিনিয়ান এডওয়ার্ডস তাঁকে নিজের বাড়ীর একাংশ ছেড়ে দিয়েছেন—সেখানেই সপরিবারে থাকেন লিঙ্কন। এবং বলতে গেলে একরকম সুখেই আছেন। মেরীর মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। সে ভাবছে, সময় নষ্ট হয়ে চলেছে—লিঙ্কনের উপরে ওঠার দিন ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

এই রকম শান্ত এবং নিরুদ্বেগ অবস্থার মধ্যে যখন লিঙ্কন রয়েছেন তখনই সংবাদ পেলেন, দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষ থেকে তিন ব্যক্তি আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য তাঁর কাছে আসছেন।

সেদিন বসন্তকালের এক চমৎকার বিকেল।

লিঙ্কন নিজের তিন ছেলের সঙ্গে বসে গল্প-গুজোব করছিলেন। মেরীও রয়েছে সেখানে। বয়স বেড়েছে, তবুও এখনও তাকে সুন্দরী বলেই মনে হয়। পুরান দিনের অনেক কথা ছেলেদের বলে আনন্দ পান লিঙ্কন। আজও তাদের সেই সমস্ত গল্প শোনাচ্ছেন।

জোস্যুয়া স্পাড ঘরে প্রবেশ করলেন।

বসতে বসতে বললেন, প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। ভদ্রলোকদের আসবার সময় এবার হয়ে এল।

লিঙ্কন সচকিতভাবে বললেন,তাইতো! আমি তাঁদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে।

মেরী প্রশ্ন করল, কাঁরা আসছেন?

স্পীড বললেন, রাজনৈতিক নেতা মিঃ ক্রিমিন, বোষ্টনের ধর্মযাজক ডাঃ ব্যারিক। আর হেনরী স্টার্ভেসন।

—তিনি একজন শিল্পপতি।

মেরী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

—বলকি, মিঃ স্টার্ভেসনের মত শিল্পপতিও আসছেন! তাঁরা আসছেন কেন তাতো বললে না।

লিঙ্কন বললেন, জোর দিয়ে কিছু বলতে পাচ্ছিনা। তবে মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হবার মত যোগ্যতা আমার আছে কিনা তাই ভাল ভাবে দেখে শুনে নেবার জন্যই তাঁরা আসছেন।

—এত ভাল সংবাদ তুমি আমাকে আগে মোটেই বলনি?

—বলিনি···মানে···ভুলে গিয়েছিলাম মেরী।

তীব্র অভিমান বোধ মেরীকে সাপটে ধরল। শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। মুখের রং লোহিত থেকে গাড় লোহিত হয়ে চলল। কাজটা যে ভাল করেন নি লিঙ্কন ভাল ভাবেই বুঝলেন।

আবেগ দমন করে শেষে মেরী বলল, এই রকম একটা দিনের জন্য আমি কি ভাবে অপেক্ষা করছি তুমি কি তা জান না। স্প্রিংফিল্ডের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে তুমি ওয়াশিংটনের প্রেসিডেণ্ট ভবনে অধিষ্ঠিত হবে এই ইচ্ছা নিয়ে আমি কি আকুলভাবে অপেক্ষা করে আছি তাও কি তোমার অজানা? সেইরকম এক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসছেন তোমার কাছে। একথা সবাই জানে, শুধু জানিনা আমি! এমন আঘাত আমি আর কখনও পাইনি।

—মেরী—

—আমি জানতে চাই এব, আমি তোমার স্ত্রী—মঙ্গলাকাঙ্খিনী সঙ্গিনী, না তোমার ক্রীতদাসী ?

—তুমি আমার শুধু স্ত্রী নও, তার চেয়ে অনেক বড় কিছু। তোমাকে বাদ দিয়ে এখন আমি নিজেকে কল্পনাই করতে পারিনা।

—তবে আমাকে অতিথিদের কথা আগে বলনি কেন ?

—কোন বিশেষ কারনে যে বলিনি তা নয়। আসলে ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। আমি রিপাব্লিক্যান পার্টির হয়ে প্রেসিডেন্টের পদের জন্য লড়ব—কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে না ? তবুও তোমাকে তাঁদের এখানে আসার কথা বলা উচিত ছিল। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর মেরী।

স্পীড বললেন, এরপর আর কথা চলে না। এব ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। এর মানেই ব্যাপারটা চুকে গেল। তুমি এবার অতিথিদের জন্য তৈরি হও। ওরা এসেই কফি খেতে চাইতে পারেন।

একটু চুপ করে থেকে মেরী বলল, অতিথিরা এলেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারব মিঃ স্পীড।

এবার সে লিঙ্কনের দিকে ফিরল।

—ভাল স্যুটটা তুমি এখন পরতে পার না ?

—পারি।

—জুতোর কি অবস্থা হয়েছে! গণ্যমান্য লোকেরা বাড়ীতে আসছেন—তাঁদের সামনে তুমি এই সমস্ত পরে বসে থাকবে ? যাও, জুতো আর স্যুট পালটে এস।

—এখুনি যাচ্ছি।

লিঙ্কন সুবোধ বালকের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্বামীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে মেরী হাসল। মমতা মাখান হাসি। জোস্যুয়া স্পাডও হাসলেন।

—আপনি বসুন মিঃ স্পাড, আমি রান্না ঘর থেকে ঘুরে আসছি।

—ঠিক আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লিঙ্কন পোশাক বদলে ফিরে এলেন।

—এখন আমাকে ভালই দেখাচ্ছে কি বলেন?

—চমৎকার দেখাচ্ছে।

—একটা ভয় কিন্তু ক্রমেই আমার উপর চেপে বসছে মিঃ স্পীড। ভুল করে ওঁরা যদি আমাকেই মনোনীত করে বসেন তখন কি হবে?

—কি আর হবে। তুমি ডাগলাস এবং আরো দুজনের বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে নেমে পড়বে।

উইলি এই সময় অতিথি তিনজনকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। তাঁরা বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক নজর দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আলাপ পরিচয়, করমর্দন ও কুশল বিনিময় হল অতি দ্রুত। এরপর সময় নষ্ট না করে কাজের কথা আরম্ভ করলেন অতিথিরা।

ডাঃ ব্যারিক বললেন, আমরা কেন এসেছি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

মৃদু হেসে লিঙ্কন বললেন, আমার মত জংলির পক্ষে রাজনীতিজ্ঞ হয়ে ওঠা সম্ভব কি না তাই বোধহয় বাজিয়ে দেখতে চান।

স্টার্ভেসন বললেন, আমরা একজন প্রার্থী চাই। সেই প্রার্থী এমন হবেন যিনি, রক্ষণশীল এবং চতুর। আগামী নির্বাচনে যে সমস্ত ঘোরাল প্রশ্ন উঠবে—যিনি তার সঠিক উত্তর নিশ্চিতভাবে দিতে পারবেন।

—আমি নিজের সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি, পঁচিশ বছর আগে আমি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করি তখন অন্তরঙ্গদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি একজন রক্ষণশীল। এতদিন পরে আজও সকলে আমাকে রক্ষণশীল বলেই জানে।

ক্রিমিন বললেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা যাঁকে খুঁজছি, আপনিই সেই ব্যক্তি।

—এসম্পর্কে আমার নিজের মুখে কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবে—

—বলুন— ?

—আপনারা জানেন বোধহয় আমি দাসপ্রথার বিরোধী।

—নিশ্চয় জানি। সত্যি কথা বলতে কি আপনার এই মনোভাবের জন্য আমরা গর্বিত না হয়ে পারি না।

অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। ডাঃ ব্যারিক, ক্রিমিন আর স্টার্ভেসন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করে লিঙ্কনের মনের কথা জেনে নিলেন। এবং তাঁরা যে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাও বুঝতে পারা গেল। এই সঙ্গে জোস্‌য়া স্পাডও বুঝলেন, রিপাব্লিক্যান দলের মনোনয়ন লিঙ্কন পাচ্ছেন।

সত্যি লিঙ্কন মনোনয়ন পেলেন।

এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

চাকচিক্যহীন, অতি সাদামাটা মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কন—যাঁর বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, স্কুল বা কলেজের কোন ডিগ্রী নেই, বংশ মর্যদা নেই, অর্থের কৌলিন্য নেই, সম্ভ্রান্ত সমাজে মেলামেশা করার সুযোগ পর্যন্ত নেই, যাঁর চেহারায় লালিত্য নেই যে শুধু তাই নয়, অদ্ভুত বলতে যা বোঝায় তাই—এমন একজন ব্যক্তিকে রিপাব্লিক্যান দল প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমেবিকার ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

বলা বাহুল্য তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ষ্টিফ ডাগলাস। তিনি ধনী ও মানী ব্যক্তি। তাঁর সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী। দেশের দক্ষিণের প্রতিটি রাজ্য তাঁকে নিশ্চিতভাবে সমর্থন করবে। কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন দাসপ্রথার সমর্থকরা কখনই লিঙ্কনকে সমর্থন করবে না। সুতরাং এই মনোভাবের পুরোপুরি সুযোগই তাঁকে নিতে হবে।

ডাগলাস নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়লেন।

দামী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে তিনি সভায় যান। সঙ্গে থাকেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। কথার জালে সাধারণ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ কিভাবে করে রাখতে হয় তিনি ভালই জানেন। শ্রোতারা বাহবা দেয়। ভাবে নেতার মত নেতা বটে।

লিঙ্কনও হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন না।

তিনিও নামলেন প্রচারে।

পায়ে হেঁটে তাঁকে দূর দূরান্তরের সভায় যেতে হয়। সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ও উইলি থাকে। কথার ফুলঝুরি তিনি ছড়াতে পারেন না। সাদামাটা ভাষায়, নানা উপমা সহযোগে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন সকলের সামনে। তাঁর সারল্য মানুষের মনকে সাড়া দেয়।

কোন কোন সভায় দুজনে মুখোমুখি হন।

যুক্তি দিয়ে দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিজেদের বক্তব্যের সারবর্ত্তা শ্রোতাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত আক্রমণও চলে। এ ব্যাপারে ডাগলাসই অগ্রণী। তখন বাধ্য হয়েই লিঙ্কনকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়। সরস ভাষায় তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণের উত্তর দেন।

এই রকম এক সভায় ডাগলাস বক্তৃতা করতে উঠেছেন।

তিনি বলছিলেন—

> ······মিঃ লিঙ্কন তাঁর রসিকতায় আপনাদের হাসান। পরক্ষণেই আবার দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাসদের দুর্দশার ছবি এঁকে আপনাদের কাঁদান। সব সময় নিপুন-ভাবে তিনি সত্যের দরজা পর্যন্ত আপনাদের নিয়ে যান, কিন্তু যেই ভিতরে প্রবেশ করার উপক্রম করবেন, অমনি তিনি আপনাদের মনোযোগকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন অন্যত্র।······

এই ধরনের আরো বহু কিছু বলার পর শেষে তিনি বললেন,

> মিঃ লিঙ্কনের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি মুদির দোকান চালাচ্ছেন। সেখানে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে মদও পাওয়া যেত। খদ্দেরদের মদ পরিবেশনের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

এবার লিঙ্কনের পালা।

নিজের দীর্ঘ বক্তৃতায় মূল বক্তব্যগুলি তুলে ধরার পর তিনি মুখে হাসি টেনে বললেন,

> আমার একটি মুদির দোকান ছিল তা আমি অস্বীকার করি না। এখন মনে পড়ছে মিঃ ডাগলাস ছিলেন আমার দোকানের সেরা খদ্দের। কাউন্টারের এপাশ থেকে ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁকে হুইস্কি বিক্রী করেছি। কিন্তু এখন আমাদের দুজনের তফাৎ এই যে, আমি কাউন্টারের এধারটা ছেড়ে দিয়েছি—কিন্তু কাউন্টারের ওধারে দাঁড়িয়ে মিঃ ডাগলাস এখনও আগের মতই নিজের ব্যাপারটা জোর চালিয়ে যাচ্ছেন।

নির্দিষ্ট দিনেই নির্বাচন শেষ হল।

লিঙ্কনের আচার আচরণে কোন উত্তেজনা প্রকাশ পেল না। তিনি আগেকার মত স্বাভাবিকই রইলেন। মিঃ স্পীড আর এডওয়ার্ডস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন ফলাফলের। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হল মেরীর। তার আবাল্যের মনবাসনা কি পূর্ণ হবে?

সেদিন ১৮৬০ সালের ৬ই নভেম্বর।

ইলিনয় স্টেট হাউসের প্রচার কক্ষটি বেশ বড়। দেওয়ালে দেশের তেত্রিশটি রাজ্যের কার কত নির্বাচনী ভোট তার তালিকা টাঙ্গান রয়েছে। পাশের খালি জায়গায়—কে কোন রাজ্যে কত ভোট পাচ্ছে তা লেখার ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রও

টাঙ্গানি রয়েছে দেওয়ালের অন্য ধারে। নানা রং-এর তারকা দিয়ে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

টেবিলের একধারে বসে লিঙ্কন খবরের কাগজ পড়ছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মেরী। তাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে ঘন ঘন বিভিন্ন রাজ্যের মানচিত্রর দিকে চোখ তুলছে।

জোস্যুয়া স্পাড ও নিনিয়ান এডওয়ার্ডসও ঘরে রয়েছেন। তাঁরা নিজেদের বিচলিতভাব কোন রকমে চেপে রেখেছেন। উইলি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক দরজার মুখে। পাশের ঘরেই টেলিগ্রাফ যন্ত্র বসান রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে কে কত ভোটে এগুচ্ছে বা পেছুচ্ছে তার সংবাদ আসছে ঘন ঘন। অপরেটার সংবাদ পাওয়া মাত্রই এঘরে এসে ভোটের সংখ্যা অদল-বদল করে যাচ্ছে। উত্তেজিতভাবে হার্ণডানও আসা যাওয়া করছে।

বাড়ীর বাইরে জনতা অপেক্ষা করে রয়েছে।

তাদের মধ্যে চলেছে উত্তেজিত আলোচনা। আগামী চার বছরের জন্য দেশের প্রেসিডেণ্ট কে হতে চলেছেন অবশ্যই আলোচনার বিষয় বস্তু তাই। কেউ কেউ আবার ব্যাণ্ড বাজাতে আরম্ভ করেছেন। এক কথায় বলা চলে, চতুর্দিকে কি হয় কি হয় ভাব।

এডওয়ার্ডস বললেন, অবস্থার এখনও বিশেষ হের-ফের হয়নি। ইলিনয়ে লিঙ্কন আর ডাগলাসের ভোটের সংখ্যা প্রায় একই।

স্পীড বললেন, তাইতো দেখছি। মেরীল্যাণ্ডে অবশ্য লিঙ্কনের কোন আশা নেই। ওখানকার মানুষ ব্রেকনরীজ ও বেলকেই ভোট দিয়েছে।

মেরী সরে এল লিঙ্কনের কাছ থেকে।

প্রশ্ন করল কাঁপা গলায়, নিউইয়র্কের কি অবস্থা ?

—এখনও ডাগলাস কয়েক হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছে।

—নিউইয়র্কেও আমরা পিছিয়ে রয়েছি। তবে তো—

—হতাশ হবার মত অবস্থা এখনও আসেনি মেরী।—মিঃ স্পীড

বললেন, নিউইয়র্ক হল ডাগলাসের বড় ঘাঁটি। ওখানে যদি সে বেশী ভোট না পায় তাহলেই অস্বাভাবিক বলতে হবে।

লিঙ্কন এতক্ষণ চুপচাপই কাগজ পড়ছিলেন। এবার মুখ তুলে বললেন, নিউইয়র্ক হ্যারল্ড আমার সম্পর্কে কি লিখেছে তোমরা শোন। লিখেছে, কদর্য শরীরের মধ্যে আমার একটি কপট আত্মা আছে।

মেরী ওকথায় কান না দিয়ে ভ্রূ-কুঁচকে বলল, পেনসিলভানিয়ার অবস্থা কি রকম বুঝছো নিনিয়ান? ওখানে কি আমরা এগুচ্ছি?

এডওয়ার্ডস বললেন, ও রাজ্যটি সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এব ওখানে নিশ্চয় জিতবে।

—তোমরা তো তখন থেকে বলছো, এব এখানে ওখানে জীতবে। আমি তো দেখছি ডাগলাস সমস্ত জায়গায় এগিয়ে রয়েছে।

এডওয়ার্ডস কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই লিঙ্কন বললেন, শিকাগো টাইমস আমার সম্পর্কে চমৎকার কথা লিখেছে। লিখেছে, লিঙ্কনের হৃদয় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রসনাও বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। পা দুটোও। সব বিষয়ে অকৃতকার্য সে। জনসাধারণ কখনই তাকে সমর্থন করবে না। তারা তাকে দেখে হাসতে থাকে। ডাগলাসের জয় সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই।

নিদারুণ অস্থির মেরী ভেজা গলায় বলল, তুমি চুপ কর। আমার আব ও সমস্ত ভাল লাগছে না। আমি যে—

—তুমি ভীষণ ছটফট করছো। আমার মনে হয় এখন তোমার বাড়ী চলে যাওয়াই উচিৎ।

—বাড়ী!

—তোমার পক্ষে তাই ভাল। একলা থাকলে মনকে শান্ত করতে পারবে। ভেবে আর কি করবে। যা হবার তাতো হবেই।

মেরী স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। তার দু' চোখে জল ছাপিয়ে

উঠেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই তো তার স্বপ্ন এমন দিন আসবে যেদিন তার স্বামী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হবেন। সুযোগ এসেছে--কিন্তু ভাগ্য দূরে দাঁড়িয়ে মনে হয় উপহাসের হাসি হাসতে আরম্ভ করেছে।

লিঙ্কন স্ত্রীর মনের অবস্থা ভাল ভাবেই অনুভব করছেন।

তিনি আবার বললেন, এখানকার অবস্থা ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তোমার পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। আবার বলছি বাড়ী যাও।

—তুমি—

—আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি।

মেরী আর কিছু না বলে মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলে সহানুভূতির দৃষ্টিতে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হার্ণডান একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সময় ফিরে এল।

—কয়েকজন সাংবাদিক আপনার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে স্যার।

—কি চায় তারা?

—তারা জানতে চাইছে, আপনি নির্বাচিত হলে প্রথম কাজ কি করবেন?

—স্থির করেছি দাড়ি রাখব।

লিঙ্কনের কথা শুনে সকলে অবাক।

স্পাড বললেন, কেমন গোলমেলে শোনাচ্ছে। দাড়ি রাখবে কিরকম?

—একটি ছোট্ট মেয়ে কয়েকদিন আগে চিঠি লিখেছে। তার মতে, আমার মুখ বেশ সরু। দাড়ি না রাখলে নাকি আমাকে কখনই ভারিক্কি দেখাবে না। যদি নির্বাচিত হই—দাড়ি আমি রাখব।

—কি মনে হয়, তুমি নির্বাচিত হবে?

—ওসমস্ত নিয়ে মোটেই এখন ভাবছি না।

উইলি তখন থেকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল একই ভাবে। দুশ্চিন্তার ঝড় তার মনের মধ্যেও বইছে। এবার এগিয়ে এল।

—মাশা, কফি করে এনে দেব?

—না, উইলি—ধন্যবাদ।

এডওয়ার্ডস বললেন, মুখে যাই বল এব তুমিও ক্রমে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছো বুঝতে পাচ্ছি।

—বিশ্বাস কর, আমি ঠিক আছি। তবে একেবারেই যে কিছু ভাবছি না তা নয়। ভাবছি মেরীর কথা। যদি জীততে না পারি তবে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।

লিঙ্কন চেয়ার ছেড়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্য-মনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ইতিমধ্যে ভোটের আরো সংবাদ ক্রমাগত টেলিগ্রাফ মারফৎ এসে পৌঁছচ্ছে। দক্ষিণ অঞ্চলের স্টেটগুলি ছাড়া সর্বত্র লিঙ্কনের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। বিশেষে নিউইয়র্কে তিনি ডাগলাসকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা নিউইয়র্কের ভোটেই শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হবে।

বাইরে অপেক্ষমান জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা।

ডাগলাস না লিঙ্কন—পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে, এই প্রশ্নই এখন সকলের মনে। রিপাব্লিক্যান দলের অন্যতম স্তম্ভ ক্রিমিন এই সময় ঘরে এলেন। লিঙ্কনকে দলের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অবদান বিরাট। এই সময় তাঁকে স্প্রিংফিল্ডে আশা করা যায় না। তিনি অন্যত্র ছিলেন। বলতে গেলে নির্বাচনী প্রচারের ব্যাপারে তিনি সারা দেশ চষে বেড়িয়েছেন।

ক্রিমিনকে এখন বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। দলের জয়লাভ সম্পর্কে তিনি এক রকম নিশ্চিত এই রকম একটা ভাব। স্বচ্ছন্দভঙ্গীতে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি এসে চেয়ার অধিকার করলেন।

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে ক্রিমিন বললেন, শিকাগো থেকে আসছি। যে যাই বলুক, ওখানে আমাদের অবস্থা বেশ ভাল।

মিঃ লিঙ্কন, আপনার মনের অবস্থা এখন কিরকম ?

লিঙ্কন জানালার কাছ থেকে সরে এলেন।

—মন্দ নয়।

—আমরা প্রাণপণ লড়েছি—আপনি দেখবেন, শেষ পর্যন্ত আমরা জিতব।

—লড়েছি যে তাতে আর সন্দেহ কি ? রাজনীতির ইতিহাসে এমন জঘন্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধহয় আর হয়নি। সত্যিই যদি জিতে যাই তাহলে আমার অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। আমার নাম করে দেশবাসীকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—তা ভাল মন্দ যাই হোক না কেন, আমায় পূরণ করতেই হবে।

এডওয়ার্ডস বললেন, এখন আর ওসমস্ত ভেবে কি লাভ ?

—চমৎকার বলেছো।—তোমরা বস, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ভীষণ একঘেয়ে লাগছে এখানে।

লিঙ্কন ক্লান্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

উইলি গেল তাঁর পিছু পিছু।

ক্রিমিন আর সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে উনি যেন জিততে চাইছেন না।

স্পীড বললেন, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

—আমার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এর কারণ কি ?

—শান্তিপ্রিয় মানুষ এব বুঝতে পেরেছে সে জিতলেই দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। দাস-প্রথার সমর্থকরা কখনই এই জয়কে বরদাস্ত করবে না। আজকের সংবাদপত্রে দেখেন নি, দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গভর্নর কি ঘোষণা করেছেন ?

—দেখেছি। তিনি বলেছেন, মিঃ লিঙ্কনের যদি জয় হয় তাহলে দক্ষিণ ক্যারোলাইনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য স্টেটগুলিও ওই পথ অনুসরণ করবে।

—এর অর্থই হল গৃহযুদ্ধ। এব-এর মত মানুষের পক্ষে এরকম

অবস্থার মুখোমুখি হওয়া হবে এক বিশ্রী ব্যাপার। বারংবার এই সমস্ত কথা সে ভাবছে আর মন মরা হয়ে পড়ছে।

কথাবার্তা চলতে থাকল।

সময় গড়িয়ে চলেছে। নানা স্টেট থেকে ভোটের ফলাফল সম্পর্কে অবিরাম সংবাদ আসছে। লিঙ্কনের অবস্থা ক্রমেই ভালর দিকে। এখন একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে—নিউইয়র্কের উপরই ভারসাম্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ওখানকার ভোট গণনা শেষ হলেই জানা যাবে বিজয়লক্ষ্মী কার কাছে গেলেন।

সকলেই দারুন উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন।

ঘড়িতে তখন রাত দশটা ত্রিশ।.

বহু প্রতীক্ষিত সেই সংবাদ এসে পৌঁছল। লিঙ্কন জয়লাভ করেছেন। আগামী চার বছরের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি দেশের শাসনভার গ্রহন করবেন। তিনি ভোট পেয়েছেন, আঠারো লক্ষ ছেসট্টি হাজার তিনশ বাহান্নটি, ডাগলাস পেয়েছেন, তের লক্ষ পাঁচাত্তর হাজার একশ সাতান্নটি। ইলেকটোর‍্যাল কলেজের তিনশ তিনটি ভোটের মধ্যে লিঙ্কন একশ আশি, ডাগলাস মাত্র বারটি।

শুভ সংবাদ পাওয়া মাত্র আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন লিঙ্কনের অন্তরঙ্গরা। বাইরে অপেক্ষমান জনতাও হর্ষধ্বনী করে উঠল। তারপর সাদামাটা মানুষটিকে নিয়ে যে গান বাঁধান হয়েছিল তাই গাইতে আরম্ভ করল। হার্ণডান ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, অল্প পরেই ফিরে এল লিঙ্কনকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি আগেকার মতই স্থির অথচ চিন্তিত।

এডওয়ার্ডস সকলের আগে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—তুমিই হোয়াইট হাউসে যাচ্ছ এব।

ম্লান হেসে লিঙ্কন বললেন, শুনলাম।

আর সকলে অভিনন্দন জানাল।

উইলি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল হাটু মুড়ে বসে। তার কুচকুচে কালো মুখে আবিস্তীর্ণ হাসি। কিন্তু ছুচোখে জল চকচক করছে।

—তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। তোমরা আমার জন্য অনেক করেছো। এ জয় আমার নয়, তোমাদের।

এই সময় একজন সৈনিক পুরুষ ঘরে প্রবেশ করলেন।

ক্রিমিন পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি ক্যাপ্টেন ক্যাভানাগ। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন থেকে এঁর।

ক্যাপ্টেন সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, মিঃ প্রেসিডেণ্ট আমার উপর আদেশ আছে সব সময় আপনার সঙ্গে থাকার।

—আমি কৃতজ্ঞ ক্যাপ্টেন। কিন্তু দেহরক্ষীর প্রয়োজন আমার হবে না।

ক্ষমা করবেন মিঃ প্রেসিডেণ্ট। ইতিমধ্যে আপনাকে ভয় দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাকে নিতেই হবে।

লিঙ্কন আর কিছু বললেন না। দরজার দিকে এগুলেন।

স্পীড বললেন, এখন তোমার প্রথম কাজ কি এব ?

—প্রথম কাজ ?

দরজার মুখে গিয়ে থামলেন।

—এখন আমার প্রথম কাজ হল, মেরীকে গিয়ে এই সংবাদ দেওয়া। সে নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে।

কথা শেষ করে লিঙ্কন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

## ॥ ৬ ॥

গভীর সঙ্কট ঘনিয়ে এল।

সাউথ ক্যারোলাইনা প্রথম সম্পর্কচ্ছেদ করল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। লিঙ্কন প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করার পর একে একে আলবাসা, জর্জিয়া, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি ও টেক্সাস কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্বের বাইরে চলে গেল। ওই সঙ্গে আরো কয়েকটি দক্ষিণাঞ্চলের স্টেট। তারা একটি স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলল। এবং নিজেদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করল জেফারসন ডেভিসকে।

এই সমস্ত কাণ্ড কারখানায় লিঙ্কন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও রক্ষণশীল মানুষ। যা কিছু ভাল সব সময় সেই দিকেই থাকবার চেষ্টা করেছেন। অথচ আজ তাঁকেই কেন্দ্র করে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছিলেন অধিকাংশ আমেরিকান হতাশয়ে ভুগতে আরম্ভ করেছে। আক্ষেপের সঙ্গে তারা ভাবছে, লিঙ্কনকে যদি নির্বাচিত না করা হত তাহলে দেশ এইভাবে চুরমার হয়ে যেত না।

লিঙ্কনের যে আরো একটি সত্বা আছে তা কারুর জানা ছিল না।

সেই সত্বার বহিপ্রকাশ এবার দেখা গেল।

তিনি জাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> ভগবান একজন আছেন এবং তিনি অন্যায়কে ঘৃণা করেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ভীষণ একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু তাঁর কাছে আমার যদি কোন স্থান নির্দিষ্ট থাকে এবং তিনি যদি আমাকে দিয়ে কিছু করতে চান, তবে আমি প্রস্তুত আছি।

অর্থাৎ ঝঞ্ঝা শঙ্কুল যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর মুখোমুখি হতে

তিনি প্রস্তুত আছেন। কিছু একরোখা মানুষের হঠকারিতাকে কখনই বরদাস্ত করা যায় না—দেশের অখণ্ডতাকে তিনি কঠোর হাতেই রক্ষা করবেন।

তাঁর এই সতর্কবাণী সকলের কাছে মূল্যহীন মনে হয়েছিল।

এমন কি অন্তরঙ্গরাও তাঁর উপর মনে মনে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। গৃহযুদ্ধকে আর কোন মতেই এড়ান যাবেনা। অথচ যুদ্ধনীতিসম্পর্কে ঘোর অনভিজ্ঞ লিঙ্কন। যে সমস্ত স্টেট আলাদা হয়ে গেছে—সেখানে আছেন অনেক সমরবিষারদ। তাঁদের ঘাটাতে যাওয়ার অর্থই হল দারুন ভাবে নাজেহাল হওয়া।

কিন্তু লিঙ্কন সকলকে হতবাক করে যুদ্ধে নেমে পড়লেন।

১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লমটন শহরের অদূরে কামান গর্জে উঠল। আরম্ভ হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ। কিন্তু লিঙ্কন অচিরেই বুঝতে পারলেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চল যে সৈন্যদল গঠন করেছে প্রকৃতই তারা অস্ত্রচালনায় সিদ্ধহস্ত। তাদের অধিনায়ক লি'র মত শৌর্য্যবান জেনারেল একটিও নেই কেন্দ্রীয় সরকারী বাহিনীতে।

পদে পদে বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে লাগলেন লিঙ্কন। দেশের চরম দুর্দিন ডেকে আনার জন্য দায়ী যে তিনিই এসম্পর্কে অনেকে এক মত হলেন। অনেকে আক্ষেপ করতে লাগলেন, এমন একজন একগুঁয়ে, অপরিণামদর্শী ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে বরণ করে নেবার জন্য। দেশের কিছু অঞ্চলের লোক যদি নিগ্রোদাস রাখতে চায়—রাখুক। এতে তো বৃহত্তর স্বার্থের কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

লিঙ্কন কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল। বৃহত্তর স্বার্থের হানি নিশ্চয় ঘটছে। সকলের অধিকার সমান এই তিনি বোঝেন। কয়েক বছর আগে একটি জনসভায় তিনি যা বলেছিলেন—আজও সেই মত দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন—

ক যদি প্রমাণ করতে পারে খ-কে ক্রীতদাস করে

> রাখার অধিকার তার আছে, তাহলে খ-ই বা ঠিক সেই যুক্তি দেখিয়ে কেন প্রমাণ করতে পারবে না যে তারও ক-কে ক্রীতদাস করে রাখার অধিকার আছে?
>
> তুমি বলবে ক সাদা আর খ কালো। ব্যাপারটা নির্ভর করছে তাহলে রঙ-এর উপর। যার গায়ের রঙ পাতলা তারই অধিকার আছে যার গায়ের রঙ গাঢ় তাকে ক্রীতদাস করে রাখার? খুব সাবধান। এই নিয়ম যদি বলবৎ থাকে তাহলে তোমার চাইতে যার গায়ের রঙ ফরসা তুমি তার ক্রীতদাস হবে।

গৃহযুদ্ধ ক্রমে ঘোরাল হয়ে উঠল।

লিঙ্কনের বাহিনী কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য কোথাও লাভ করতে পারল না। দক্ষিণাঞ্চলের সাফল্য একটানা ভাবে চলেছে। তাদের সুবিধাও অনেক। অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়ী ওই পক্ষে। অর্থের অভাব নেই। সমুদ্র-পথে তারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র আনিয়ে নিতে পারছে। ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মত দেশ পূর্ণ সমর্থন জানাবে কিনা বিবেচনা করছে।

পূর্ণোদ্যমে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকল।

দিকে দিকে পরাজিত হচ্ছেন লিঙ্কন, তবুও অবিচল আছেন। দেখতে দেখতে ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী এসে গেল। এই দিন তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করলেন। যার মূল কথা হল—

> আমি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন আদেশ দিচ্ছি এবং ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলিতে ( দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি ) ক্রীতদাস হিসাবে যারা বন্দী রয়েছে, তারা এখন থেকে মুক্ত—স্বাধীন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কার্য-নির্বাহক বিভাগ তার সামরিক এবং নৌ-বিভাগ এই ব্যক্তিদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

অর্থাৎ সমস্ত দেশে আইন করে দাসপ্রথা তুলে দেওয়া হল। এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করার পর লিঙ্কন বলেছিলেন,

> আমার নাম যদি কোনদিন ইতিহাসে স্থান পায় তাহলে এই কাজটির জন্যই পাবে। এতে আমি আমার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়েছি।

এই বছরই তিনি তিনজন যোগ্য সেনাপতির সন্ধান পেলেন। তারা হলেন, গ্রাণ্ট, শেরম্যান এবং ফ্যারাগাট। নৌবহরের দায়িত্ব নিয়ে ফ্যারাগাট দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরগুলি শুধু অবরোধ করলেন না, তছনচ করে দিতে লাগলেন। ভীষণ বিপাকে পড়ে গেল বিপক্ষ দল। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। দাসপ্রথা রহিতের আদেশ প্রচারিত হবার পর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে এগিয়ে এল না। কারণ ওই দুই দেশের প্রবল জনমত তখন লিঙ্কনের দিকে।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল।

গ্রাণ্ট আর শেরম্যান প্রতি রণক্ষেত্রে ঘূর্ণি ঝড় বইয়ে দিলেন। গেটিসবার্গের যুদ্ধে বড় রকম হার হল দক্ষিণাঞ্চল বাহিনীর। এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে লিঙ্কন মৃত সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে অনেক কিছু বলার পর বললেন,

> আমরা যারা জীবিত আছি, যদি তাঁদের অসম্পূর্ণ ব্রত সম্পূর্ণ করতে পারি, যদি আমাদের এই সাধনা কোনদিন এই মহা আকাঙ্খাকে পূর্ণ করে, সেদিন নতুন এক শাসনতন্ত্র জগতে জেগে উঠবে। সেই শাসনতন্ত্রের মূলমন্ত্র হবে—the Government of the people, by the people, for the people.

১৮৬৪ সালে লিঙ্কন দ্বিতীয়বার দেশের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। যুদ্ধ তখনও চলেছে। তবে গতি তাঁরই অনুকূলে। এখন

আর দেশের মানুষের তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব নেই। দেশের মানুষ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, ওই দীর্ঘকায় মানুষটি প্রকৃত পক্ষেই আবাহমান ন্যায়ের দিকে আছেন। এই সঙ্গে আরো সকলে দেখেছেন নিদারুণ এই সঙ্কটের দিনে তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। তাঁর অনন্য প্রত্যয়, তাঁর লৌহ কঠিন দৃঢ়তা তুলনা রহিত।

১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল গৃহযুদ্ধ শেষ হল।

বারংবার পর্যুদস্ত দক্ষিণাঞ্চল বাহিনী আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। ৯ই এপ্রিল বিপক্ষদলের প্রধান সেনাপতি রবার্ট ইলী ভার্জিনীয়ায় গ্রাণ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন লিঙ্কন। দেশের অখণ্ডতা তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছেন। অবশ্য তখন তিনি কিভাবেই বা জানবেন এই সাফল্যের কি মর্মন্তুদ পুরস্কার তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

অনেকদিন পরে লিঙ্কন হেসেছেন।

হেসেছেন প্রাণ খুলে। আগেকার মত সরস কথাবার্তা বলে, চারপাশের আর সকলকে হাসিয়েছেন। মনে হয়েছে শঙ্কা জড়িত রাত্রি সত্যি এবার শেষ হল, সুখানুভূতির নিটোল দিন সামনে সুবিস্তৃত।

সেদিন গুডফ্রাইডে।

১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল।

লিঙ্কনের আজকের কর্মসূচী হল :

* সকাল আটটা পর্যন্ত সরকারী কাগজ পত্র দেখে নেওয়া। প্রাতরাশের পর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা।
* বেলা এগারোটায় ক্যাবিনেট মিটিং।
* লাঞ্চ

* আবার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা।

* বিকেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অল্পক্ষণের জন্য বেড়াতে যাওয়া।

* ইলিনয় থেকে আসা কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে বেসরকারী আলাপ আলোচনা।

* সমর পরিষদের অফিসে গিয়ে কাজকর্ম দেখে আসা।

* একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার।

* ডিনার।

* ফোর্ড থিয়েটারে নাটক দেখতে যাওয়া। সঙ্গে থাকবেন মিসেস লিঙ্কন এবং সস্ত্রীক সেনাপতি গ্রাণ্ট।

কার্য্যসূচী দেখে লিঙ্কন খুশীই হলেন। ঠাস কাজকর্মই তাঁর পছন্দ। অন্তরঙ্গ সহকর্মী ওয়ার্ড লেমন কিন্তু জানেন, তাঁকে হাসি-খুশী দেখালেও তিনি মনে মনে কিছুটা উদ্বিগ্নই আছেন।

এই উদ্বিগ্নতার কারণ একটি স্বপ্ন।

লিঙ্কন বিশ্বাস করেন স্বপ্ন কখনও নিরর্থক হয় না। প্রতিটি স্বপ্নই মানুষের জীবনে দারুন অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়। বছর কয়েক আগে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন—স্প্রিংফিল্ডে নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আয়নায় কিন্তু একটি নয়, দুটি মুখ দেখা যাচ্ছে। দুটিই তাঁর নিজের। একটি মুখ হাসিখুশী, স্বাভাবিক। অন্যটি মলিন, দু চোখ বন্ধ করা।

এই স্বপ্নের কথা মেরীকে লিঙ্কন বলেছিলেন। এর অর্থও তিনি খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁর মতে, আমি দুবার প্রেসিডেণ্ট হব। কিন্তু দ্বিতীয়বার পুরো সময়ের জন্য ওই পদে আমার পক্ষে থাকা কখনই সম্ভব হবে না।

সেদিন মেরী ও অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। গৃহযুদ্ধের গোলমালে সব কিছু হওয়াই

সম্ভব। লিঙ্কনকে পথ থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র বিদ্রোহীরা তো করছে একটি গুলিই তো তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

এতদিন পরে আবার ওই ধরনের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন।

এবারকার স্বপ্ন আবার আরো ভীতিপ্রদ।

স্বপ্নে তিনি দেখলেন, গুমরে ওঠা কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলেন বিছানায়। হোয়াইট হাউসে গভীর রাত্রে কে আবার কাঁদছে? এমন তো হওয়া উচিত নয়। বিছানা থেকে নেমে তিনি কান্নার উৎস সন্ধান করতে লাগলেন। এঘর-ওঘরে গেলেন—কোথাও কিছু নেই। কাছাকাছি নয়, কোন দূরের ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। হোয়াইট হাউস তো আর কোন ছোট বাড়ী নয়।

শেষে তিনি ইষ্টরুমে পৌঁছালেন। কান্নার আওয়াজ এই ঘর থেকেই আসছিল। ওখানে গিয়ে দেখলেন, একটি মৃতদেহ সযত্নে শোয়ান। মুখ ঢাকা দেওয়া রয়েছে কাপড় দিয়ে। মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। কে আবার মারা গেল এখানে। লিঙ্কন কৌতূহলী হলেন, আবার ভাবিতও।

প্রশ্ন করলেন, কে মারা গেছে?

—প্রেসিডেণ্ট—একজন বলে উঠল, আমাদের প্রেসিডেণ্ট আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

এরপরই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মন খারাপ হয়ে গেল লিঙ্কনের। এই সমস্ত স্বপ্নে সত্যিই কি তাঁর ভবিষ্যতের ছবি ফুটে উঠছে? পরের দিনই মেরীকে স্বপ্নের কথা বললেন। অবশ্য বললেন হাল্কা সুরে হাসতে হাসতে। মেরীর পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সহকারী ওয়ার্ড লিমনও স্বপ্নের কথা শুনেছিলেন। তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

ভয় পাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। যদিও গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে—তবুও চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। যারা হেরে গেছে, তারা পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেও, লিঙ্কনের নিগ্রো প্রীতি মনে-প্রাণে

মেনে নিতে পারে না। পথের কাঁটা সরাবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র এধার ওধার চলেছে নিশ্চিত। বলতে গেলে প্রতিদিনই প্রেসিডেন্ট প্রাণের ভয় দেখান চিঠি কয়েকখানা করে পাচ্ছেন। এই সময় ওই ধরনের স্বপ্ন আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দিতে বাধ্য।

আর থাকতে না পেরে ওয়ার্ড বললেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার একটা অনুরোধ আছে। রাখবেন কি ?

—বলুন ?

—আপনি সকলের সঙ্গে দেখা করা কমিয়ে দিন। এখানে ওখানে যাওয়াটাও আপনাকে বন্ধ করতে হবে। কিছু লোক নিশ্চিত ভাবে চেষ্টায় রয়েছে আপনার ক্ষতি করার।

মৃদু হেসে লিঙ্কন বললেন,

—আপনি কি মনে করেন আমি জানি না ? জানি। কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামালে যে আর সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিতে হয়।

ওয়ার্ড আর কিছু বললেন না।

একরোখা মানুষটিকে তিনি ভালই চেনেন।

গুডফ্রাইডের সকালে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছেন লিঙ্কন। ক্রমে প্রাতরাশের সময় এসে গেল। বড় ছেলে রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রাতরাশে বসলেন। রবার্ট যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সে বাবাকে শোনাতে লাগল যুদ্ধক্ষেত্রের নানা বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্তের কথা।

এরপর সাক্ষাতের পালা।

দেখা করতে এলেন স্পাকার কোলফ্যাক্স। তারপর এলেন সিনেট ও কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা কেন্দ্রীভূত রইল। লিঙ্কন বার বার সকলকে জানালেন, এখন বিদ্বেষের ভাব মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। অপরাধ যারা

করেছে, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে যারা—প্রতিহিংসা-পরায়ণ না হয়ে তাদের ক্ষমা করাই ভাল। দেশের মঙ্গল এতেই নিহিত আছে।

সকলে চলে যাবার পর ক্রসওয়েল এলেন।

মেরীল্যাণ্ড থেকে তিনি সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। লিঙ্কনের একজন ঘনিষ্টতম বন্ধু। অন্তরঙ্গ পরিবেশে দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ গল্প হল।

শেষে—

ক্রসওয়েল বললেন, আমার একজন ভালমানুষ বন্ধু আছে। সে বেকায়দায় পড়ে বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

লিঙ্কন বললেন, তোমার কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। নদী পেরিয়ে একদল ছেলে-মেয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল। ফেরার সময় দেখা গেল মাঝি নৌকা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আর কোন উপায় না থাকায় স্থির হল, প্রত্যেক ছেলে নিজের পছন্দ মত একটি মেয়েকে নিজের পিঠে চাপিয়ে সাঁতরে নদী পার হবে। সেইমত কাজ হল। শেষে কিন্তু দেখা গেল, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নদী পার হতে পারেনি। কারণ আর কিছুই নয়, ছেলেটি অসম্ভব রোগা আর মেয়েটি বেশ মোটাসোটা।—ক্রসওয়েল, এখানেও ব্যাপারটা সেই রকম। যে যার পছন্দ মত বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকব কি আমি আর জেফারসন ডেভিস (ডেভিস বিচ্ছেদকামী দক্ষিণাঞ্চলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন —একথা আগেই বলা হয়েছে)। আমার মনে হয় তার চেয়ে সকলকে মুক্ত করে দেওয়াই হবে বিবেচনার কাজ।

এরপর তিনি মন্ত্রী সভার বৈঠকে যোগ দিলেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই আলাপ আলোচনা হল সেখানে। লিঙ্কনের অভিমত হল, বিদ্রোহ ব্যার্থ হলেও দক্ষিণাঞ্চলের

রাজ্যগুলি সম্পর্কে এখন সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। অবশ্য প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা তিনি পছন্দ করেন না। দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন ভাবে চিহ্নিত লোককেও ফাঁসিতে লটকাবার দরকার নেই। বন্দী করে রাখাও অর্থহীন। বরং তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক যাতে তারা অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারে।

ক্যাবিনেট মিটিং-এর পর লিঙ্কন লাঞ্চ সারলেন। আবার দেখা-সাক্ষাতের পালা আরম্ভ হল। লাঞ্চের সময় ভাইস প্রেসিডেণ্ট অ্যাণ্ড্রু, জনসন উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেণ্টকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আগামী কাল নতুন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত পরিচয় পত্র পেশ করবেন। অনুষ্ঠান হবে ব্লু-রুমে।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুবার সময় হয়ে গেল।

মেরী প্রশ্ন করল, সঙ্গে আর কেউ যাবে কি?

লিঙ্কন বললেন, না আর কেউ নয়। শুধু আমি আর তুমি।

তখন তাঁকে বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। ঘোড়ার গাড়ী চড়ে দুজনে বেরুলেন। কোচম্যানের পাশে বসল উইলি। এখন সে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি এবং দুটি সন্তানের জনক। গাড়ী এগিয়ে চলল। ওয়াশিংটনের জল হাওয়া এই সময় ভালই থাকে।

লিঙ্কন বললেন, খুব হাল্কা লাগছে নিজেকে। এত ভাল আমি বহু দিন থাকিনি মনে হচ্ছে।

মেরী আশ্চর্য হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

কাঁপা গলায় বলল তারপর, আমার কিন্তু চারিধারের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ ভয় করছে।

লিঙ্কন হাসলেন।

গত রাত্রের দেখা স্বপ্নের কথা তুললেন আবার। এই প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে ভাল লাগছিল না। মনে ভীষণ অস্বস্তি দেখা দেয়। ক্রমে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এক সময় ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্পর্কে কথা তুললেন লিঙ্কন।

—এই শেষ। তৃতীয়বার আর প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য দাঁড়াব না। আর কয়েক বছরের মধ্যেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছি বলতে পার।

—তারপর কি করবে?

—ইউরোপ ঘুরে আসব কিছুদিন। তারপর স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করব গিয়ে স্প্রিংফিল্ডে। আইন ব্যবসায় একটু ভাল ভাবে মন দিতে হবে। খেত-খামার নিয়েও কিছু সময় কাটবে।

অসংলগ্ন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়েই বেড়ান শেষ হল। পূর্বব্যবস্থা মত কয়েকজন তখন অপেক্ষা করছিলেন। হোয়াইট হাউসে ফিরেই তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন লিঙ্কন। এরা সকলেই এসেছেন তাঁর নিজের রাজ্য ইলিনয় থেকে।

এই সাক্ষাৎকারের পর লিঙ্কন সমর পরিষদের কার্য্যালয় পরিদর্শন করতে চললেন। মোটর গাড়ীর চল তখনও হয়নি। ঘোড়ার গাড়ীতেই চলেছেন যথা নিয়মে। রাস্তায় কয়েকজনকে হৈ হল্লা করতে দেখলেন। মদ খাওয়ার দরুনই ওরা বোধহয় ওরকম করছে।

সেই দিকেই তাকিয়ে দেহরক্ষীকে অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমার কি মনে হয় জান ক্রুক, কিছু লোক আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

বিস্মিত ক্রুক তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

—শেষ পর্যন্ত তারা আমায় নিশ্চয় মেরে ফেলবে।

—মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমরা যতক্ষণ পাশে আছি আপনার ক্ষতি করার সাধ্য কারুর হবে না।

—তোমাদের উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। তোমরা যে আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপাত করবে তাতে আর সন্দেহ কি। তবে কথাটা কি জান, একরোখা আততায়ী সামাল দেওয়া সহজ-সাধ্য কাজ নয়।

সমর পরিষদে কাজ সেরে এলেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই।

ক্রুককে বিদায় দেবার সময় বললেন, আজ আবার থিয়েটার

দেখতে যেতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এ সমস্ত আমার ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় কি? সংবাদপত্রে ফলাও করে এই কথা ছাপা হয়েছে। না গেলে অনেকে দুঃখীত হবে। সেটা ভাল নয়।

ডিনার সেরে নিলেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য আরো কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। মেরীকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার মুখেই শিকাগোর বিশিষ্ট নাগরিক আইজাক আরনল্ড এসে উপস্থিত হলেন। মনে হল লিঙ্কন একটু অপ্রস্তুত হয়েছেন।

মুখে হাসি টেনে আরনল্ডকে বললেন, কাল সকালে কথা হবে। আসতে ভুলনা যেন। এখন একটু ব্যস্ত আছি। থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি আর কি।

ফোর্ড থিয়েটার খ্যাতিমান রঙ্গালয়।

এই প্রতিষ্ঠানের অভিনয়ের ঐতিহ্য বহুদিনের। আজ আবার বিশেষ ভাবে সাজান হয়েছে থিয়েটার গৃহটিকে। এই প্রথমবার বর্তমান প্রেসিডেণ্ট এখানে অভিনয় দেখতে আসছেন। এবং তাঁকে রাজী করানো হয়েছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবার পরই। আরো একটু ভালভাবে বলতে গেলে, মিসেস লিঙ্কনের সহযোগীতা না পাওয়া গেলে কখনই তাঁকে রাজী করান যেত না।

আজকের তারিখে প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড থিয়েটারে আসছেন এ প্রচার এত বেশী হয়েছে যে, ওয়াশিংটনের কারুরই অজানা নেই একথা।

গণ্যমান্য দর্শকে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। কখন এখানে সস্ত্রীক প্রেসিডেণ্ট এসে পড়েন তার জন্য দর্শককুল উৎসুক হয়ে রয়েছেন। যে সুসজ্জিত বক্স তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেখানে তিনি যখন এসে বসবেন তখন অবশ্য অধিকাংশ দর্শকই তাঁকে দেখতে পাবেন না।

আরো একজন চরম অধীরতা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সে দর্শক নয়।

সে উইলকিস বুথ।

এই থিয়েটারের একজন অভিনেতা।

অতি সাধারণ দর্শন এই লোকটিকে দেখে কখনই মনে হয় না যে, সে এক নিষ্ঠুর পরিকল্পনার প্রণেতা। এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

বুথ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সে টেক্সাসের মানুষ। সেই টেক্সাস—যেখানে কম করেও দশজন নিগ্রোদাস না রাখলে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় না। যেখানকার প্রধান আনন্দ হল কালো মানুষদের পিঠে অবিরাম চাবুক চালান। সেই অন্ধ বর্ণ-বিদ্বেষী পরিপূর্ণ টেক্সাস থেকে আগত মধ্যম শ্রেণীর অভিনেতা এই উইলকিস বুথ।

লিঙ্কনের অতি মাত্রায় নিগ্রো প্রীতি তার ভাল লাগে নি। অসম্ভব বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। যদি কেউ নিগ্রোদের বাজার থেকে কিনে এনে আসল দাস হিসাবে রাখতে চায় রাখুক—তাতে অন্যের নাক গলাবার কি থাকতে পারে? তিনি বিশিষ্ট নেতা বা দেশের প্রেসিডেণ্ট যেই হোন না কেন। যে প্রথা কয়েকদিন নয়, দু'শতাব্দীর বেশী সময় থেকে চলে আসছে তা রদ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বুথ এই সমস্ত কথা ভেবেছে আর গুমরেছে।

গৃহযুদ্ধ বেধে গেল।

বুথ নিশ্চিত ছিল, এই যুদ্ধে লিঙ্কনের বাহিনী পরাজিত হবে। দক্ষিণাঞ্চল স্বাধীন দেশ হিসাবে চিহ্নিত হবে সারা পৃথিবীতে। নিগ্রোদের নিয়ে ফলাও কারবার চলতে থাকবে অবাধে। বাস্তবে তা ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন লিঙ্কন। শুধু তাই নয়, আইন করে তুলে দিয়েছেন দাসপ্রথা নিগ্রোদের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এ সমস্ত সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বুথের পক্ষে।

তীব্র রাগ থিতিয়ে আসার পরই সে স্থির করে ফেলে, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে আর দুনিয়ায় থাকতে দেওয়া চলতে পারে না। ওই লোকই সমস্ত কিছুর মূলে। জীবনের মায়া তাঁকে কাটাতেই হবে। লিঙ্কন প্রাণের ভয় দেখিয়ে যে সমস্ত চিঠি পেতেন, বেনামীতে তার মধ্যে একখানাও বুথ লিখেছিল কিনা তা অবশ্য আজও প্রমানিত হয়নি।

বুথ মনের মধ্যে নানা পরিকল্পনা ভাঁজতে লাগল।

কিন্তু আশার আলো চোখে পড়ল না।

কাউকে খুন করতে গেলে তার কাছাকাছি পৌঁছাতে হবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রাম শ্যাম যদু নন--কাজেই তাঁর কাছাকাছি পৌঁছানটাই হল সমস্যা। অবশ্য ভাবী হত্যাকারীর অসীম ধৈর্য্য ছিল। সে বিশ্বাস করতো এমন একটা সুযোগ একদিন না একদিন আসবেই, যখন ওই দীর্ঘকায় কদাকার লোকটিকে সে ধরাধাম থেকে বিদায় করে দিতে পারবে।

দিন গড়িয়ে চলল।

হঠাৎ একদিন সে শুনল, লিঙ্কন ১৪ই এপ্রিল তাদের রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে আসছেন। আনন্দে বুথের প্রাণ নেচে উঠল। ধৈর্য্যের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে এতদিন পরে। ভাগ্য চমৎকার সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা এখন সাহসিকতার সঙ্গে করে ফেলার অপেক্ষায় রয়েছে।

ফোর্ড থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, সেই বক্সটিকে বিশেষভাবে সাজাবার ব্যবস্থা করলেন যাতে লিঙ্কন ও তাঁর সঙ্গীরা এসে বসবেন। এই বক্সে ঢোকার দুটি দরজা। একটি পাশে ও একটি পিছন দিকে। পাশের দরজার কোন ব্যবহার হবে না, ওতে তালা দেওয়া থাকবে। পিছনের দরজার মুখে কার্পেট বিছান করিডর। করিডর শেষ হয়েছে আরো একটি দরজার সামনে। এখানেই প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষীর জন্য চেয়ার পাতা থাকবে।

এই থিয়েটারেরই একজন কর্মী উইলকিস বুথ-এর পক্ষে সমস্ত

ব্যবস্থা ভালভাবে দেখে নিতে কোন অসুবিধা হল না। কিভাবে কাজ শেষ করবে তাও সে মনে মনে ছকে নিল। সকলের অলক্ষ্যে পাশের দরজার গায়ে ছোট একটা ফুটো করে রাখল। যাতে কাজে নামবার আগে ওই ফুটোতে চোখ লাগিয়ে প্রেসিডেন্টের গতিবিধি দেখে নেওয়া যায়।

এবার আমেরিকা সরকারের দূরদৃষ্টির অভাবের কথায় আসা যাক। লিঙ্কনের প্রাণের আশঙ্কা যে রয়েছে একথা নানা ভাবেই কিছুদিন ধরে জানা যাচ্ছিল। হুমকি দেওয়া বেনামী চিঠিগুলি যে সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, তাও অনুভব করেছিলেন কেউ কেউ। তবুও সরকারের যে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। এই গাফিলতি ইচ্ছাকৃত না, প্রশাসনিক অকর্মন্যতা, সে রহস্য আজও পরিষ্কার হয়নি।

পরে কি হত বলা যায় না। সতর্কতা অবলম্বন করলে সেদিন—১৪ই এপ্রিলে অন্ততঃ লিঙ্কন বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়তেন না। সতর্কতার জন্য বিশেষ মাথা ঘামাতে হত তাও নয়। শুধু প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী জন পার্কার না হয়ে অন্য কেউ হলেই সব দিক রক্ষা পেত।

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ এই জন পার্কার

কাজে গাফিলতি, আদেশ অমান্য করার ব্যাপারেই যে শুধু পারদর্শী ছিল তাই নয়, মদ খেয়ে রাস্তায় হুল্লোড় করা, পতিতালয়ে গিয়ে বেলেল্লাপনার চূড়ান্তে পৌছান ইত্যাদিতেও সে বিশেষ পারদর্শী ছিল। এই ধরনের স্বভাবের জন্য তাকে বহুবার বিভাগীয় শাস্তি পেতে হয়েছে।

অবশ্য আজ একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগা স্বাভাবিক, এ হেন চরিত্রের জন পার্কারকে কেন চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়নি? কেন লিঙ্কনের অন্যতম দেহরক্ষী হিসাবে তাকে কাজে বহাল রাখা হয়েছিল? যেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনেক শত্রু—তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। তেমন বিপদ দেখা দিলে এমন

একজন অপদার্থ দেহরক্ষী যে তাঁকে বাঁচাতে পারবে না এই সহজ সত্যটা প্রশাসনের তো কখনই অজানা থাকবার কথা ছিল না।

তবে কেন চাকরীতে বহাল ছিল পার্কার?

বুঝতে হবে তার মুরুব্বির জোর ছিল। এবং এই সঙ্গে অনুমান করে নেওয়াটা অন্যায় হবে না যে, সেই সমস্ত মুরুব্বিরা মনে প্রাণে চেয়েছিল, লিঙ্কনের দেহরক্ষী পার্কারের মত একজন অপদার্থ থাকলেই হত্যাকারীর সুবিধা। বলা বাহুল্য তখনও প্রশাসনে এমন অনেক মাতব্বর ছিলেন যাঁরা লিঙ্কনের উগ্র নিগ্রো প্রীতি মনে মনে পছন্দ করতেন না।

মূল ঘটনায় আবার ফিরে আসা যাক।

কাঁটায় কাঁটায় তখন নটা।

লিঙ্কন ফোর্ড থিয়েটারের সামনে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী থেকে নামলেন। প্রেসিডেন্ট এসে পৌঁছেছেন সংবাদ পেয়ে বহু দর্শক হল থেকে বেরিয়ে এলেন। আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান হল তাঁকে। সময়োচিত শিষ্টাচার বজায় রেখে লিঙ্কন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বক্সে চলে গেলেন। জেনারেল গ্র্যান্ট বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় এই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টকে সঙ্গদান করতে পারলেন না। তাঁদের পরিবর্তে এসেছেন মিলিটারি অ্যাটাশে মেজর র‍্যাথবোন এবং তাঁর ভাবী পত্নী ক্লারা।

অভিনয় আরম্ভ হল।

প্রেসিডেন্টের বক্স থেকে যে করিডর বেরিয়েছে তারই মুখে দেহরক্ষী জন পার্কারের বসবার কথা। এখানে বসে পাহারা দিলেই কারুর পক্ষে বক্সের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট নিরাপদ থাকবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কিন্তু পার্কার বিশেষ মাথা ঘামাল না। সে প্রথমেই অনুভব করল এখানে বসে পাহারা দিলে থিয়েটার দেখার কোন সুবিধা নেই।

করিডরের মুখ ছেড়ে পার্কার হলের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর

ব্যালকনির একটা চেয়ারে বসে নির্বিকার মুখে থিয়েটার দেখতে লাগল। অর্থাৎ সকলের অলক্ষ্যে হত্যাকারীর প্রেসিডেন্টের বক্সে প্রবেশ করার আর কোন অসুবিধা রইল না। পার্কার কিন্তু বেশীক্ষণ অভিনয়ও দেখল না। কিছুক্ষণ পরে হল থেকে বেরিয়ে বারে গেল হুইস্কির সন্ধানে।

অভিনয় চলেছে।

লিঙ্কনের চোখ স্টেজের উপরই নিবদ্ধ। একমনে তিনি অভিনয় দেখছেন। মর্মন্তুদ মৃত্যু যে দ্রুত এগিয়ে আসছে তা জানতে পারার সুযোগ তাঁর কোথায়? উইলকিস বুথ সতর্ক পায়ে করিডরের সামনে দাঁড়াল। এধার ওধার তাকিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকে করিডরের দরজার পাল্লা দুটো চেপে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বাইরের দিক থেকে আর আশঙ্কার সম্ভাবনা রইল না।

এগিয়ে এসে এবার বুথ বক্সের দরজার সামনে দাঁড়াল। ফুটো আগেই করে রাখা হয়েছিল। তাতে চোখ লাগিয়ে সে দেখল, বক্সের মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে যে যার চেয়ারে বসে অভিনয় দেখছেন। লিঙ্কন দীর্ঘ পুরুষ—চেয়ারের ব্যাক ছাড়িয়ে তাঁর মাথা অনেকটা উপরের দিকে উঠে রয়েছে।

ডেরিনজার পিস্তলটা বুথ পকেট থেকে বার করল। তার বাঁ হাত কিন্তু খালি নেই—লম্বা এবং ভারী ছোরা সে হাতে ধরা। দরজা সরিয়ে বুথ অতি সন্তর্পণে ভেতরে এল। একজন যে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়েছে, মেরী কি ক্লারা লিঙ্কন কি র‍্যাথবোন--কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বুথ মাথা লক্ষ্য করে নিজের পিস্তলের ঘোড়ায় চাপ দিল। অব্যর্থ নিশানা। বুলেট লিঙ্কনের মাথা ভেদ করে তাঁর ডান চোখের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। কিছু বুঝতে পারার আগেই তিনি এলিয়ে পড়লেন। প্রবল রক্তপাত তাঁকে জ্ঞানের সীমার বাইরে নিয়ে গেল।

রাত্তি তখন ঠিক সওয়া দশটা।

গুলির শব্দ শুনে চমকে মুখ ফিরিয়ে ছিল মেরী। বুঝতে আর বাকী থাকেনি কি সর্বনাশ তার ঘটে গেছে। অর্থহীন চিৎকার করে উঠল প্রথমে। তারপরই বিলাপ—আমার স্বামী খুন হয়েছেন…… তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না……মেজর র‍্যাথবোন চেয়ার থেকে উঠেই ঘুরে দাঁড়ালেন। নিজের স্তম্ভিত অবস্থাকে মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে দ্রুত এগুলেন বুথের পালাবার পথ বন্ধ করার জন্য। কিন্তু বুথ অনেক বেশী ক্ষীপ্র। সে এক পাশে সরে গিয়ে মেজরকে আঘাত করল ছোরা দিয়ে।

গুরুতর আহত অবস্থায় র‍্যাথবোন পড়ে গেলেন। বুথ আর সময় নষ্ট না করে লাফিয়ে বক্সের রেলিং-এর উপর উঠল। স্টেজ এখান থেকে বেশ কিছুটা নীচে হলেও, আড়াআড়ি দূরত্ব খুব বেশী নয়। স্টেজে একবার লাফিয়ে পড়তে পারলে গা ঢাকা দিতে অসুবিধা হবে না।

লাফাবার মুখেই কিন্তু বুথ বেকায়দায় পড়ে গেল। বক্সের সঙ্গে যে বিরাট জাতীয় পতাকা লাগান ছিল—তাতেই একটা পা লেপটে গেল তার। তবুও সে ভাগ্যক্রমে দর্শকদের মধ্যে না পড়ে, স্টেজের উপর গিয়ে পড়ল। দারুন লাগল। মনে হল পা মচকে গেছে।

হতভম্ব দর্শকরা এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখলেন।

প্রকৃত কি ঘটেছে তখনও তাঁরা জানেন না। গুলির আওয়াজ কারুর কারুর কানে গিয়েছিল—তাই বলে সেই গুলি যে প্রেসিডেণ্টের দেহভেদ করেছে এ কথা কল্পনা করাও কষ্টকর। তবে কোথা থেকে গুলির শব্দ এলো এই চিন্তায় অনেককেই উতলা করে তুলেছিল।

ওদিকে—

দর্শক ও স্টেজে উপস্থিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের হতভম্ব অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নিল বুথ। প্রচণ্ড পায়ের ব্যথা উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। তাঁর পর উইংসের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দর্শকদের যখন সম্বিত ফিরে এল তখন আর কিছু করার নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল এক দেড় মিনিটের মধ্যেই।

এর পরই কি ভাবে যেন প্রচারিত হয়ে গেল প্রেসিডেণ্ট গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আশঙ্কা আর উত্তেজনায় দর্শকরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। দর্শকদের মধ্যে কোন চিকিৎসক আছেন কিনা তার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়ে গেছে। তরুণ চিকিৎসক ডাঃ লীল অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। চাপ চাপ রক্তের মধ্যে লিঙ্কন তখনও একই ভাবে পড়ে আছেন। এখনও বেঁচে আছেন কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

লীল দ্রুত চিকিৎসা আরম্ভ করলেন।

আপাতদৃষ্টিতে জীবনের কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও লিঙ্কন বেঁচে ছিলেন তখনও। কৃত্রিম উপায়ে তাঁর দেহে তাপ সঞ্চারের চেষ্টা করলেন ডাঃ লীল। তারপর সহজেই অনুভূত হল, বক্সের এই স্বল্পপরিসর জায়গায় দীর্ঘদেহী প্রেসিডেণ্টকে ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু এখান থেকে হোয়াইট হাউসের দূরত্ব অনেক। ঘোড়ার গাড়ীতে দেহ চাপিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে অনেক ধকল সহ্য করতে হবে তাঁকে। জীবনের আশা যেটুকু এখনও আছে তাও তিরোহিত হবে।

দিকে দিকে দমকা হাওয়ার মতই এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারী কর্মচারীরা দ্রুত ছুটে আসছেন ঘটনাস্থলের দিকে। দর্শক ছাড়াও, হাজার হাজার মানুষ মনের মধ্যে চরম হাহাকার নিয়ে জড় হয়ে চলেছেন ফোর্ড থিয়েটারের চতুর্দিকে।

অনেকে চাপা গলায় বুথের সেই উক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন। বক্স থেকে স্টেজে লাফিয়ে পড়ার আগে বুথ সদম্ভে বলেছিল, অত্যাচারীর পতন ঘটেছে। দক্ষিণ প্রতিশোধ নিল।

গৃহযুদ্ধ কি আবার লাগবে?

বুথের উক্তি যে অসার দম্ভ নয়, প্রেসিডেণ্ট গুলিবিদ্ধ হওয়ায় তা প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাস প্রথার সমর্থকরা এখন

সক্রিয় রয়েছে সন্দেহ নেই—এই ধরণের আলোচনা মুখে মুখে ফিরতে লাগল। শতাব্দীর কুখ্যাত জল্লাদ উইলকিস বুথ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচতে পারে নি। স্টেজের বাইরে ঘোড়া তৈরী ছিল। তাতে চড়ে তখনকার মত সরে পড়লেও, তার সন্ধান পাওয়া গেল ২৬শে এপ্রিল কেনটাকির কাছাকাছি এক জায়গায়। এবার তাকে সৈন্যদের গুলি পেতে নিতে হল বুকে।

মূল ঘটনায় আবার ফিরে আসা যাক।

গার্ডরা ধরাধরি করে লিঙ্কনের দেহ ফোর্ড থিয়েটারের সামনেকার একটি বাড়ীর দরজার কাছে নিয়ে এল। ডাকাডাকি করেও দরজা খোলান গেল না। মনে হয় ওখানে কেউ ছিল না। ঠিক পাশেরটি হল টেনথ ষ্ট্রীটের ৪৫৩ নম্বর বাড়ী। ওখানে অনেক ভাড়াটের বাস। তাদেরই মধ্যে একজন হলেন উইলিয়াম ক্লার্ক। তিনি এগিয়ে এসে অনুরোধ জানালেন, তাঁর ঘরে আহত প্রেসিডেন্টকে আনা হোক।

তাই করা হল।

৪৫৩ নম্বর টেনথ ষ্ট্রীটকে ঘিরে ফেলল সৈন্যরা। জনতার চাপ ক্রমেই বাড়ছে। কত রকম গুজোবের সৃষ্টি যে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্লার্কের বিছানায় বহু কর্মকাণ্ডের সফল নায়ক লিঙ্কন। নিশ্চলভাবে শুয়ে রয়েছেন। সেই বিছানা ঘিরে মুহ্যমান গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নিকট আত্মীয়রা।

আরো কয়েকজন চিকিৎসক এসে পড়েছেন।

প্রেসিডেন্টকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন সারারাত। আজকের মত সেদিন চিকিৎসাবিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। থাকলে হয়তো ডাঃ লীল আর তাঁর সহযোগীরা সাফল্য লাভ করতে পারতেন। রাত ভোর হয়ে গেল।

ক্যালেণ্ডারের পাতায় তখন ১৫ই এপ্রিল, ১৮৬৫ সাল।

গুলিবিদ্ধ হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত এত চেষ্টা করেও জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ঘড়ির কাঁটা নিজের খেয়ালে এগিয়ে

চলেছে। তখন সকাল সাতটা বেজে একুশ মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড —শেষবারের মত নিঃশ্বাস ফেলে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবদরদী অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন জীবনের পরপারে চলে গেলেন। সত্য ও সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী কোন পাপের ফলস্বরূপ এই মর্মন্তুদ শেষ বিচারের মুখোমুখি হলেন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

মৃত্যুর ছায়া কিন্তু লিঙ্কনের মুখের উপর পড়েনি।

তিনি যেন হাসছেন।

কেঁদে উঠল মেরী।

আমেরিকান প্রশাসনের তাবৎ অধিকর্তাদের চোখ শুকনো রইল না। সৈনিক পুরুষদের দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন—জনতা হাহাকারের স্বীকার। উইলি কাঁদছে, ওই সঙ্গে কাঁদছে লক্ষ লক্ষ অবিচারের ভারে নুয়ে পড়া নিগ্রো—যাদের গায়ের রং কালো হলেও, আর কোটি কোটি সাদা মানুষের মত রক্ত লালই।

তারা কাঁদছে, আর কাঁদছে।

সে কান্নার শেষ আজও হয়নি।

…………আমি বই মুড়ে রাখলাম। মন ভারী হয়ে উঠল। জেফ্রির পিতামহ ঠিকই লিখেছেন যে কান্নার শেষ আজও হয়নি। লোয়াঙ্গার উত্তরপুরুষরা যে শুধু কেঁদে কেঁদে ফিরছে তাই নয়—লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের বংশধররা দুর্নিবার পরিশ্রমের ঘাম আর বুকভরা কান্না নিয়েই আজকে প্রগতিশীল আমেরিকার মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

## ॥ তিন ॥

দিন পনেরো কেটে গেছে।

অবসর সময়ে আমি লস অ্যানজালসের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। বিলাস বহুল পরিচ্ছন্ন শহর। যেদিকেই তাকিয়েছি চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। গতকাল শহর সংলগ্ন চায়না টাউনে গিয়েছিলাম। দেখে শুনে একটি মাঝারি ধরনের চীনা রেঁস্তরায় ঢুকতে যাব—কয়েক জোড়া কুৎকুতে চোখের দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করল।

অস্বস্তি বোধ করায় ঢুকিনি রেঁস্তরায়।

এখানকার চীনারা কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। তারা চিয়াং কাইশেকের সমর্থক। চিয়াং কাইশেকের সমর্থক বলেই তাদের আমেরিকায় জায়গা হয়েছে। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে লাল চীনের উপর দুর্বলতা পোষণ করে কিনা অনুমান করা কঠিন।

আমার দিকে রেঁস্তরার চীনাগুলো সন্দেহজনক ভাবে তাকাল কেন? প্রাচ্য দেশীয় খাবারের স্বাদ মাথায় তুলে আমি আবার ফুটপাথে ফিরে এলাম। হাত নেড়ে চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে চড়ে পড়লাম তাতে। নিগ্রো ড্রাইভার জানতে চাইল আমি কোথায় যেতে চাই।

আমি নিজের অ্যাপার্টমেণ্টের ঠিকানা বললাম।

নির্দিষ্ট পথ ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল।

—তুমি কতদিন গাড়ী চালাচ্ছ?

মুখ না ফিরিয়েই ড্রাইভার বলল, বছর সাতেক হলে।

—গাড়ীটা তোমার?

—গাড়ী কেনার পয়সা আমি কোথা থেকে পাব স্যার। বার্ণাড

অ্যাণ্ড হ্যারিসের অনেক ট্যাক্সি আছে। এই গাড়ীটা সেই কম্পানীর। এবার আমি চীনা রেঁস্তরায় ঢোকার মুখে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, সেই কথা বলাতে ড্রাইভার হেসে ফেলল। তারপর এমন ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল যাতে মনে হয় ও এমন কোন ব্যাপারই নয়।

—ওরা আপনাকে নিগ্রো ভেবেছিল।

আশ্চর্য হলাম।

—নিগ্রো—

—হ্যাঁ। এখানকার অধিকাংশ রেঁস্তরা বা হোটেলে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার নেই কিনা।

—আমি তো ভারতীয়—

—অনেক সময় ভারতীয়দের নিগ্রো বলে মনে করে এরা।

আমি বুঝে উঠতে পারলাম না আমাকে নিগ্রো ভাবার কারণটা কি? রং অবশ্য আমার ফরসা নয়, আবার কুচকুচে কালোও নয়। আমেরিকান ভাষায় যাকে ট্যান কালার বলা হয়, তাই—তবে?

তাছাড়া—

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে এখনও বহু হোটেল, রেঁস্তরা, মোটেল, বাস, এমন কি সিনেমা হল বা ট্রেনের কামরায় নিগ্রোদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, একথা আমি শুনেছিলাম। সাদা আমেরিকানদের জেদেই এই সমস্ত বাধার প্রাচীর খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু চীনেরা এই অমানবিক নিয়ম মেনে চলবে কেন? তারা তো এশিয়াবাসী। তাদের নিগ্রোদের প্রতি সহানুভূতি হবারই কথা।

ড্রাইভার আমার মনের ভাব আঁচ করে নিয়েছিল।

গাড়ার গতি একই রকম রেখে সে বলল, চীনেরা ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না স্যার। জমিয়ে ব্যবসা করতে গেলে সাদাদের মন জুগিয়ে চলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

—আশ্চর্য তো!

—আশ্চর্য হবার মত এতে কিছু নেই। এই দেশে চোখ বুঁজে

থাকলেও, দুটি বিষয় আপনার মনকে নাড়া দেবেই—গুছিয়ে নেওয়ার প্রবৃত্তি আর চূড়ান্তভাবে নিপীড়ন চালিয়ে বাহাদুরী নেওয়া।

আর কোন কথা হল না।

আমি অবাক হয়ে নিগ্রো ড্রাইভারের কথা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম। এক সময় ট্যাক্সি আমার ঠিকানায় পৌঁছাল। নেমে আমি ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। কিছু টিপস দিতে ড্রাইভার ধন্যবাদ জানাল। এই সময় লক্ষ্য করলাম, তার বাঁ হাতের কব্জির কিছু উপরে প্রায় শুকিয়ে আসা ক্ষত রয়েছে। দগদগে অবস্থায় এর আকার যে মারাত্মক ছিল এখন স্বচ্ছন্দে তা অনুমান করে নেওয়া যায়।

—কি দেখছেন?

—তোমার হাতের ওই ক্ষতটা—

নির্বিকার মুখে ড্রাইভার বলল, 'কুক্লাক্স ক্যান দলের' কয়েকজন আমাকে পাকড়াও করেছিল। মরতে মরতে কোন রকমে ফিরে এসেছি বলতে পারেন।

আমি চমকে উঠলাম।

—কুক্লাক্স ক্যান সেতো—

—দাঙ্গা বাধিয়ে বা আড়ালে আবডালে নিগ্রোদের পেলেই খুন করা যাদের কাজ। আমরা ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ছি স্যার। মার্টিন লুথার কিং-এর মত মানুষকেও ওরা খুন করেছে। আমাদের হয়ে আর কে বলবে বলুন।

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না সে। আমিও বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলাম। ছায়াচ্ছন্ন মনে দাঁড়ালাম গিয়ে লিফটের দরজার সামনে। ২৬শে এপ্রিল—মাত্র মাস দেড়েক আগে বিখ্যাত নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিংকে হত্যা করা হয়েছে—এই সংবাদ প্রচারিত হবার পরই সারা পৃথিবীতে আলোড়ন এসেছিল। আমি বম্বেতে বসে তখন তাঁর নির্মম মৃত্যু সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম।

তিনি ছিলেন অহিংসাবাদী। মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা অনুসরণ করে চলবার চেষ্টাই করে গেছেন।

লিফটের দরজা খুলে গেল।

কয়েকজনের সঙ্গে বেরিয়ে এল হিল্ডা। হাস্যময়ী, সুরূপা হিল্ডা ডেভিসা সে তার সঙ্গী পুরুষটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাবার মুখেই আমাকে দেখতে পেল। এক ঝলক হাসি তার মুখ লাল করে তুলল।

—এই যে মিঃ ব্যানার্জী—ফোনে আপনার সঙ্গে দুবার যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছি। কোথায় থাকেন?

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, হারিয়ে যেতে পারি কিনা দেখার জন্য লস অ্যানজালসের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম।

—বেশ ভাল ভাবেই ফিরে আসতে পেরেছেন দেখা যাচ্ছে। ভাল কথা, কাল সকালে রেডি থাকবেন। আটটার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

—কোথায়?

—বাঃ, আপনি তো চমৎকার মানুষ। একেবারে ভুলে গেছেন। কাল আমাদের 'ডিজান ল্যাণ্ডে' যাবার কথা নয়?

—তাই তো! সত্যি আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সকালে আমি নিশ্চয় তৈরী থাকব।

হিল্ডা ভ্রূভঙ্গী করে বলল, দেখেছেন, আমিও কম ভুলো নই। চ্যাপেলের সঙ্গে আপনার আলাপই করিয়ে দিইনি।

হিল্ডার সঙ্গীটির সঙ্গে আলাপ হল। ওল্টার চ্যাপেলের বয়স চল্লিশের নীচেই। পোরটরিকোর মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের যে অফিস আছে, সেখানে মোটা মাইনের চাকরী করেন। ছুটিতে এসেছেন। সপ্তাহ খানেক পরেই আবার ফিরে যাবেন কর্মস্থলে। অতি সম্প্রতি হিল্ডার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে। তিনিও আগামীকাল আমাদের সঙ্গে ডিজানল্যাণ্ড দেখতে যাচ্ছেন।

লিফটে উপরে উঠতে উঠতে হিল্ডার কথাই ভাবছিলাম।

আপাত দৃষ্টিতে তাকে যে রকম মনে হয় আসলে কিন্তু সে তা নয়। সহকর্মীদের কাছ থেকে তার সম্পর্কে অনেক রসাল কাহিনী শুনেছি। হিল্ডা হল সেই জাতের মেয়ে যারা নিত্য নূতন পুরুষ সঙ্গীর কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিতে ভালবাসে। এমন কি কম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের বড় কর্তাদের সঙ্গেও তার কিছুদিন ঢলাঢলি চলেছে।

নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে জামাকাপড় বদলে ফেললাম। সোফায় বসে টেলিভিসনের নব ঘোরাবার জন্য হাত বাড়িয়েও আবার সরিয়ে নিলাম। লক্ষ্য করেছি, এই সময় দেখার মত ভাল প্রোগ্রাম থাকে না। সিগারেট ধরিয়ে, ঘনঘন কয়েকবার টান দেবার পর বাড়ীর কথা ভাবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি, তখনই মার্টিন লুথার কিং এর কথা মনে এল।

অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব।

অথচ এই অহিংসার পূজারীকে গুলিতে প্রাণ দিতে হল!

তাঁর অপরাধ হল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী দুকোটি বিশ লক্ষর বেশী নিগ্রো সংবিধানের সমস্ত অধিকার যাতে ভোগ করতে পারে—এই দাবীতে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। হানাহানির পথ তিনি গ্রহণ করেননি, অহিংস উপায়ে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

অথচ—

জর্জিয়ার আটলাণ্টা সহরে এক ধর্মযাজক পরিবারে মার্টিন লুথার কিং জন্মগ্রহণ করেন। নিগ্রো হলেও, ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত বলে এই পরিবারকে সকলে ক্ষমা ঘেন্না করে চলতো। স্কুলে যেদিন তিনি প্রথম পা দিলেন, শিশু মনে একটি জিজ্ঞাসা বড় আকারে দেখা দিল। সাদা রং-এর সহপাঠীরা তাঁকে এড়িয়ে চলছে কেন?

তিনি যে অতি উপেক্ষিত এক নিগ্রো, এই দেশে ভাল কোন কিছু

পাবার অধিকার তাঁদের নেই—এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা প্রথম হল এক জুতোর দোকানে। তখন কিং স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই আছেন।

সেদিন বাবার সঙ্গে জুতো কিনতে গেছেন।

কয়েক সারি চেয়ার পাতা ক্রেতাদের জন্য। কিং-এর বাবা ছেলেকে নিয়ে বসলেন, প্রথম সারির দুটি চেয়ারে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ক্রেতাও রয়েছেন। তাঁদের ভ্রূকুঁচকে উঠল। এই সময় এগিয়ে এল দোকানের একজন কর্মচারী।

—আপনাদের এখান থেকে উঠতে হবে।

—কেন?

—এগুলি শ্বেতাঙ্গদের বসবার চেয়ার। কালোরা বসবে পিছনের সারিতে। আপনারা ওখানে যান।

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন কিং-এর বাবা। তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। কর্মচারীটি রূঢ় ভাষায় শুধু নয়, ভঙ্গিতেও এবার তাঁদের উঠে যেতে বলল। দোকানের হাওয়া তখন বেশ গরম।

বাবা বললেন, জুতো যদি আমায় কিনতে হয় তবে এই চেয়ারে বসেই আমি কিনতে চাই। নয়তো থাক।

—থাক তাহলে। ওই চেয়ারে বসে কোন দিনই আপনি এই দোকান থেকে জুতো কিনতে পারবেন না।

তিনি অপমানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ গলায় ছেলেকে বললেন, এই অমানুষিক অবস্থার মধ্যে আমাকে কতদিন বাঁচতে হবে জানি না, তবু আমি ভীত নই। অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি শেষ দিন পর্যন্ত করে যাব।

বালক কিং সেই দিনই বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন, আজ থেকে তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন নিগ্রো, এবং নিগ্রো বলেই সমস্ত সুখ-সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তবে—এই অবিচার কি চিরদিন মুখ বুঁজে সহ্য করবেন তিনি? বালক কিং হয়তো সেই

দিনই স্থির করে ফেলেছিলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন প্রতিবাদ করবেন—ফেটে পড়বেন প্রতিবাদে।

লেখা পড়ায় কিং ভালই ছিলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি আটলাণ্টার মোর হাউজ কলেজ থেকে স্নাতক হলেন। এরপর তাঁকে পাঠান হল ধর্মযাজকের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য পেনসিলভেনিয়ার চেষ্টারে। ক্রোজার থিওজফিক্যাল সেমিনারিতে ভর্তি হলেন তিনি। যথা সময়ে এখানকার পাঠও যোগ্যতার সঙ্গে শেষ করলেন।

এবার ডক্টরেট পাবার পালা।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর গবেষণা করবেন স্থির করে রেখেছিলেন। গবেষণার জন্য তাঁকে বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হল। এখানেই আলাপ হয়ে গেল করেটা স্কটের সঙ্গে। সুদর্শনা করেটা তখন বোষ্টন কলেজের নামকরা ছাত্রী। পরিচয় গভীর প্রণয়ের রূপ নিতে খুব বেশী সময় নেয়নি। অচিরেই দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে করেটা বারবার প্রমাণ করেছেন কিং-এর তিনি প্রকৃতই যোগ্য সঙ্গিণী।

প্রসঙ্গক্রমে একবার কৃতজ্ঞ স্বামী বলেছিলেন, সর্বোপরি আমি ঋণী আমার স্ত্রী করেটার কাছে, যাঁর ভালবাসা, ত্যাগ ও অনুগত্য ছাড়া আমার জীবনের কোন কাজই সিদ্ধ হতে পারত না। দুঃসময়ে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন, আর দিয়েছেন আন্তরিক গৃহকোণ—যেখানে খৃষ্টের প্রেম বাস্তব রূপ নিয়েছে।

রাজনীতিতে প্রবেশ করে কিং সিনেট বা কংগ্রেসে প্রবেশ করার জন্য লালাইত হলেন না। তিনি সংগ্রামে নামলেন অহিংসার পথ ধরে। তাঁর লক্ষ্য হল প্রতিটি ক্ষেত্রে নিগ্রোদের সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। কৃষ্ণকায়দের জাতীয় সমিতির তখন তিনি সদস্য। নীরবে কাজকর্ম করে চলেছেন। এই সময় মণ্টগোমারীর ঘটনা বলতে গেলে রাতারাতি তাঁকে সারা দেশে পরিচিতি এনে দিল। নির্ভীক নিগ্রো নেতা হিসাবে তিনি চিহ্নিত হলেন।

মণ্টগোমারীর ঘটনাটি নিম্নরূপ—

১৯৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর।

মাণ্টগোমারীর ক্লীভল্যাণ্ড এভিনিউ-এর উপর দিয়ে বাস চলেছে। যথা নিয়মেই বাসেও দুরকম বসার ব্যবস্থা। শ্বেতাঙ্গরা বসবে সংরক্ষিত আসনে, আর পিছনের কয়েক সারিতে বসবে নিগ্রোরা। বাস এক জায়গায় থামতেই কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ উঠল। তাদের বসার মত একটি সিটও খালি নেই। কণ্ডাক্টার ইঙ্গিত করতেই কয়েকজন নিগ্রো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের সিট খালি করে দিল।

প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, অসংরক্ষিত আসনেও নিগ্রোরা ততক্ষণই বসে থাকতে পারে যতক্ষণ না, সাদা চামড়ার প্রতিটি মানুষ বসার জায়গা পেয়েছে। নয়তো আশি বছরের বৃদ্ধকেও উঠে দাঁড়িয়ে ছোকরা শ্বেতাঙ্গর জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। দেশ প্রগতিশীল, অথচ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কি নক্কারজনক।

যাহোক—

কয়েকজন নিগ্রো উঠে গেলেও আরো সিটের দরকার ছিল। কণ্ডাক্টার রোজাপার্কাস-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে সিট খালি করে দিতে বলল। এই নিগ্রো মহিলা কাজকর্ম সেরে প্রতিদিনই এই বাসে বাড়ী ফেরেন। এই অপমানকর প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন না। বসে রইলেন নিজের সিটে।

এ এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

এবার তাঁকে রূঢ় ভাষায় বলা হল।

তিনি উঠলেন না।

বাস থেমে গেল। একজন নিগারের এত স্পর্ধা—শ্বেতাঙ্গদের উত্তেজনা তখন দেখবার মত। থানায় সংবাদ পৌছাতে বিলম্ব হল না। পুলিশ এসে রোজাপার্কসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। দেখতে দেখতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শহরে। নিগ্রো সমাজের পক্ষে এই

ব্যাপাব ভাল চোখে দেখা সম্ভব হল না। অবিলম্বে কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয় সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হল।

আরো অনেকের সঙ্গে মার্টিন লুথার কিং ওই সভায় যোগ দিলেন। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল, হিংসার পথ বেছে নেওয়া হবে না। শান্তিপূর্ণ উপায়েই এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করতে হবে। শ্বেতাঙ্গ কম্পানীর বাস বয়কট চলবে। আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তকে সাধারণ মনে হলেও, এর গুরুত্ব ছিল অনেক। কারণ আমেরিকার অধিকাংশ শহরে নিগ্রোরাই হল বাসের প্রধান যাত্রী। তারা যদি চড়তে না চায় তাহলে ছোট শহরগুলিতে বাসের ব্যবসা চালান প্রায় অসম্ভব।

বয়কট কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন কিং। দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েই তিনি কাজে নেমে পড়লেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিগ্রোরা যে একতার পরিচয় দিল তা অভূতপূর্ব। মাসের পর মাস গড়িয়ে চলল—কেউ আর বাসে চড়ে না। দূর দূর থেকে নিগ্রোরা পায়ে হেঁটে কাজেকর্মে যায়। কোন বিরক্তি বা আক্ষেপ নেই।

এর জন্য কিংকে সাদা সমাজের কাছ থেকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল না। এমন কি বোমা মেরে তাঁর বাড়ী বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করা হল। এবার ধৈর্য হারাল নিগ্রোরা। তারা কাতারে কাতারে জমা হল কিং-এর বাড়ীর সামনে এবং আওয়াজ তুলল আর তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

'কিং ক্রুদ্ধ জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা আইন ও শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করি। আমরা হিংসার সমর্থন করি না। আমরা আমাদের শত্রুদের ভালবাসতে চাই। আমি চাই আপনারাও শত্রুদের ভাল-বাসুন। আমাকে যদি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলেও কাজ বন্ধ হবে না, কারণ আমরা যা করেছি সেটাই উচিত, আমরা যা করেছি তা নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত ; সুতরাং ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।

একবছর ধরে চলল এই বয়কট।

বাস ব্যবসা উঠে যাবার উপক্রম হল। এই সময় আবার সুপ্রিম

কোর্ট থেকে রায় বেরুল, বাসে বর্ণ বৈষম্য অমানবিক এবং বেআইনী। এই জয়লাভের পরই মার্টিন লুথার কিং যে নিগ্রো সমাজকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারেন তা আমেরিকানরা হৃদয়ঙ্গম করল। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

এরপর কিং নিগ্রো আন্দোলনকে চারটি ভাগে ভাগ করেন—

প্রত্যক্ষ অহিংস কাজ
আইনগত প্রতিকার
নির্বাচন
এবং অর্থনৈতিক বয়কট।

নিগ্রো বিদ্বেষীরা কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তারা নানাভাবে অত্যাচার ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে চলেছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলিতে নিগ্রো ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গরা যত্রতত্র কালোদের পিঠে বেত চালিয়ে আনন্দ পেতে লাগল। হত্যা, ধর্ষণ এবং লুণ্ঠনও চলল নির্বিচারে।

এরপর এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আজকের সভ্য সমাজে (অবশ্য বাংলা দেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা বাদ দিয়ে—) এরকম হৃদয়বিদারক ঘটনা যে ঘটতে পারে তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। বিশেষ করে, সুসভ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সন্তানসম্ভবা নিগ্রো তরুণী মেরী টার্নারকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর ছুরি দিয়ে পেট কেটে ফেলতেই, বাচ্চাটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। জুতোর তলায় ফেলে বাচ্চাকে থেঁতলে দেওয়া হল।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা কি এর চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল?

হায় সুসভ্য আমেরিকা—সারা দুনিয়ার দুঃখ মোচন করার জন্য তুমি আকুলি বিকুলি করে বেড়াচ্ছ, ডলারের স্রোত আমেজানের স্রোতের মতই বয়ে চলেছে দিকে দিকে! আফ্রিকান নিগ্রোদের জন্য সমবেদনা ও দাক্ষিণ্যের সীমা নেই, অথচ নিজের দেশের কালো

মানুষদের দাবিয়ে রাখার কি গভীর চক্রান্ত—সচেতন মানুষ মাত্রই এই মনোভাব, এই বৈষম্যের কারণ খুঁজে পাবেন না।

মার্টিন লুথার কিং বিরামহীনভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে যেতে লাগলেন। অর্থনৈতিক বয়কট চলল এখানে ওখানে। আদালতে অসংখ্য মামলা দায়ের হল নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ভাগ্যক্রমে সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি যিনি লিঙ্কনের আদর্শ পুরোপুরি মেনে চলেন। এই শতাব্দীতে হোয়াইট হাউসে অবস্থানকারীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র নিগ্রোদের বন্ধু।

ঘনঘন দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নানা অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে কেনেডি বিশেষ বিচলিত হলেন। তিনি সিভিল রাইটস বিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কংগ্রেসে উপস্থিত করার জন্য তৎপর হলেন। এই সময় কেনেডিকে আরো উৎকণ্ঠিত করে তুলল একটি ব্যাপার।

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূচনা মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে। জেমস-মেরিডিথ নামে একজন নিগ্রো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হওয়া নিয়েই এই গোলমাল। তাকে কিছুতেই ওখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এমন কি মিসিসিপির গভর্ণর রস বার্ণেট পর্যন্ত আইনকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে উস্কানির কাজে লেগে পড়লেন।

নিগ্রো নির্যাতন চরমে উঠল।

কেনেডি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রথমে আদেশ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করলেন। তাতে যখন কাজ হল না তখন সৈন্য বাহিনী তলব করা হল। গ্রেপ্তার হলেন মিসিসিপির গভর্ণর রস বার্ণেট। তাঁকে দশ হাজার ডলার জরিমানা করার ব্যবস্থা রাখা হল, এবং দাঙ্গার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে জেমস মেরিডিথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করা হল।

কেনেডির এই মহানুভবতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কিং।

পরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন, আজ আফ্রিকা বা আমেরিকা, কালো মানুষ বা সাদা মানুষ, নূতন এবং পুরাতন—সমস্ত জাতি এক

হয়ে গেছে। আজ বহু বড় বড় সমস্যা রয়েছে, সেগুলির সমাধান সম্মিলিতভাবে করাই আমাদের কর্তব্য, এবং একযোগে কাজ করেই আমরা চরম সাফল্য লাভ করতে পারি—আবহমান পারব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহান হৃদয়ের অধিকারী এই মানুষটি ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর টেক্সাসের ডালাস শহরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। মার্কিন সরকার পরে নানা ভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন এই হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। যাই বলা হোক না কেন, আজ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার—কেনেডির নিগ্রো প্রীতি উগ্রপন্থা শ্বেতাঙ্গদের ভাল লাগেনি, তাঁকে তাই প্রাণ দিতে হয়েছে। ঠিক এই কারণেই প্রায় একশ বছর আগে মহান অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

মার্টিন লুথার কিং কিন্তু বিরামহীন ভাবেই নিজের জাতির স্বপক্ষে কাজ করে চলেছেন। লাঞ্ছনা, কারাবরণ কিছুতেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। শান্তির পথ বেয়ে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছাবেন এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। উগ্রপন্থী বা একরোখা মার্কিন শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে বুঝতে না চাইলেও, তিনি যে প্রকৃতই শান্তি-পথের পথিক তা প্রমাণিত হয়ে গেল তাঁকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়ায়।

সপরিবার কিং পুরস্কার নিতে ইউরোপ এলেন।

সেদিন ১৯৬৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর।

পুরস্কার গ্রহণ করার পর, নোবেল কমিটি ও আমন্ত্রিত বহু বিদগ্ধ পুরুষের সামনে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিং গম্ভীর অথচ সংযত গলায় বললেন,

> …আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'কোটি কুড়ি লক্ষ নিগ্রো মুক্তির আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। বর্ণ বিদ্বেষের দীর্ঘ অন্ধকার পাশ কাটিয়ে তারা নূতন পথের সন্ধানে চলেছে। আমি সেই আন্দোলনের স্বার্থেই এই পুরস্কার গ্রহণ করলাম। ব্যক্তিগত আনন্দের

পরিবর্তে আমি সমষ্টিগত আনন্দই অনুভব করছি—কারণ নিগ্রোজাতির একজন প্রতিনিধি হিসাবেই গ্রহণ করেছি এই পুরস্কার।

…আপনারা জেনে রাখুন, আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নিগ্রো মুক্তির স্বাদ পায়নি আজও। নাগরিক অধিকার কাকে বলে তারা তা জানে না। এই অধিকার আদায়ের জন্যই চলেছে অহিংস আন্দোলন। হাজার হাজার কর্মীর প্রাণ ঢালা পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য দাবী আদায় করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত কর্মীরা আবহমানই সকলের চোখের আড়ালে থেকে যাবেন—তাঁদের নাম কখনই সংবাদ-পত্রের হেডিং হবে না।

…তবু আমি বিশ্বাস করি, এই সভ্যতার ধারা আগামী দিনে আরো উজ্জ্বলতর হবে, আরো সংবেদন-শীল হবেন ভাবী বংশধরেরা। তাঁরা সেদিন নিশ্চয় অনুভব করবেন, এই মহত্তর সভ্যতায় সমান অধিকার পাবার মূলে এমন সমস্ত অজ্ঞাত পুরুষরা আছেন, যাঁরা জীবন ভোর নিদারুণ কষ্টের শিকার ছিলেন।

তরুণতম নোবেল লরিয়েট মার্টিন লুথার কিং আমেরিকায় ফিরে এসে আবার নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। অহিংস উপায়ে যতদূর সম্ভব দাবী আদায় করে নেওয়া যায়—এই হল তাঁর কাজ, ব্রত বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়।

কিন্তু এরপর চার বছরের বেশী তিনি নিজের কাজে একাগ্র থাকতে পারেন নি। জীবনের উপর যবনিকা অতর্কিতেই নেমে এল। স্বাভাবিক নিয়মে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেননি। মৃত্যু এল বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক আবরণে মুখ লুকিয়ে।

সেদিন ১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

কিং মের্মাফস শহরে গিয়েছিলেন সংগঠনের কাজেই। হোটেলের বারান্দায় তাঁকে গুলি করে ম্যারা হল। শান্তির পূজারী চিরদিনের মত মূক হয়ে গেলেন। তখন তাঁর কতই বা বয়স—চল্লিশের কোঠাও পার হতে পারেননি। কত মহান প্রাণ যে এই ভাবে অস্ত্রের মুখে বিলীন হয়ে গেছে তার হিসাব একমাত্র ইতিহাসই রেখে চলেছে।

হাসপাতালের বিশেষ এক শয্যায় শুয়ে আছেন মার্টিন লুথার কিং। শরীর রক্তাক্ত, দুচোখ মুদিত। মুদিত চোখ দুটি আর কখনও খুলবে না। মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর হিসাব চুকিয়ে চলে গেছেন। প্রিয়তমা করেটা শোকে মুহ্যমানা। এতক্ষণ স্বামীর শয্যার পাশেই ছিলেন, এবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে অসম্ভব—সব হাসি, সব আনন্দ শেষ হয়ে গেছে।

কাঁধের উপর হাতের স্পর্শ পেয়ে মুখ ফেরালেন করেটা।

রবার্ট কেনেডি এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

দাদা মৃত—জন কেনেডির মত তিনিও নিগ্রোদের বন্ধু। আগামী নির্বাচনে ডেমক্রাট দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। এখন তাঁর মুখ থমথম করছে। কিং-এর মৃতদেহ স্পর্শ করেছিলেন নিশ্চয়, হাতে রক্ত লেগে রয়েছে। কি ভাষায় এখন করেটাকে সান্ত্বনা জানাবেন ভেবে পাচ্ছেন না—তাই রক্তমাখা হাত দিয়েই শোকে জর জর নারীর কাঁধে মৃদু মৃদু চাপ দিচ্ছেন।

……সিগারেট পুড়তে পুড়তে অসম্ভব ছোট হয়ে গিয়ে আঙ্গুলের চামড়ায় ছ্যাঁকা দিতেই আমার চটকা ভাঙল। নিজের কাছেই কেমন লজ্জিত হয়ে পড়েছি। আমেরিকায় এসে অসম্ভব ভাব-প্রবণ হয়ে পড়েছি। একটুতেই তলিয়ে যাচ্ছি চিন্তার সমুদ্রে।

সোফা ছেড়ে উঠে বিশাল জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভারী পর্দা সরাতেই বহু নীচে কর্মব্যস্ত লস অ্যানজালসের কিছু অংশ চোখে পড়ল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সরে এলাম ওখান থেকে। মনে পড়ে গেল, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে

গাড়ীতে চিঠি দেওয়া হয়নি। হাতে সময় রয়েছে। আমি চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ডিজনি ল্যাণ্ডের দূরত্ব লস অ্যানজালস থেকে ত্রিশ মাইলের মত। তিনশ একর জমির উপর এই বিস্ময়কর জগতের প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন অনন্যকর্মা ওয়াল্ট ডিজনি। সেই ডিজনি ল্যাণ্ড দেখতে যাওয়ার কথা আজ আমাদের।

আটটা বেজে যাবার পর আমি নীচে নেমে এলাম।

সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারধার। বলতে গেলে ক্ষণিক বিরতির পরই লস অ্যানজালস আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। মানুষ আর গাড়ীর স্রোত চলেছে পথের উপর দিয়ে। ফুটপাথের ধার ঘেঁসেই দাঁড়িয়েছিল, গাঢ় লাল রং-এর কনভাটেবল শেভ্রলে। কম্পানীর এই গাড়ীই ব্যবহার করে হিল্ডা। আমি ফুটপাথে পা দেবার পরই সে হাত নাড়ল।

গাড়ীর কাছে পৌঁছে দেখলাম, ওল্টার চ্যাপেলও উপস্থিত রয়েছেন। পিছনের সিটে হেলে বসে সিগারেট টেনে চলেছেন তিনি। মাথার চুল অবিন্যস্ত। বেশ-বিন্যাসও তেমন পরিপাটি নয়। মনে হয় গত রাতে ঘুমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি। হিল্ডার অবস্থাও তথৈবচ।

আমার দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হাসল।

—কি দেখছেন ?

—গত রাতে আপনাদের ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে ?

—ঠিক ধরেছেন।

—কোথাও গিয়েছিলেন নাকি ?

—না। নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই ছিলাম। চ্যাপের কাণ্ড কার-

খানা দেখলে আপনি অবাক হতেন। সারা রাত আমাকে ঘুমতে দেয়নি।

কথা শেষ করেই হিল্ডা হাসল।

আমি অবশ্য আমেরিকায় আসার পর থেকে ক্রমেই অবাক হতে ভুলে যাচ্ছি। কিছুই যেন নয়, এমনই ভঙ্গীতে এরা নিজেদের কেচ্ছা প্রকাশ করে থাকে। শুনেছি, যে মেয়ের পুরুষ বন্ধু নেই—যে মেয়ে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে নিভৃতে সময় কাটিয়ে আসে না, সেই মেয়ের মা প্রতিবেশীদের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না!

বললাম, আপনারা ক্লান্ত। আজ থাক না। পরে বরং—

—এমন কিছু ক্লান্ত নই—চ্যাপেল বললেন, পরে আবার আমার অসুবিধা হবে। কালই আমি কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছি।

—তাহলে তো—

—সঙ্কোচের কোন কারণ নেই মিঃ ব্যানার্জী। আমিও ঠিক আছি। চ্যাপ, সামনে গিয়ে বস। গাড়ী তোমাকেই চালাতে হবে।

হিল্ডা, আমি আর চ্যাপেল সামনের দিকেই বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হাইওয়ের উপর এসে পড়লাম। ইতিমধ্যে অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি চ্যাপেল একজন দক্ষ চালক। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এই মোটর ট্রিপ আমার ভালই লাগছে।

এক সময় হিল্ডা বলল, মিঃ ব্যানার্জী, ওয়াল্ট ডিজনি সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

—তেমন কিছু নয়।

—চ্যাপ, তুমি—

—না জানারই মধ্যে ধরে নিতে পার।

—ডিজনি ল্যাণ্ড যখন দেখতে চলেছি তখন এই বিস্ময়কর জগতের স্রষ্টা সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেওয়াটা বোধহয় ভাল।

বললাম, নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের জানাচ্ছে কে?

হিল্ডা মুখ নীচু করে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, কেন—আমি ওঁর সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর রাখি।

—তবে আর দেরী করো না। বলতে আরম্ভ কর। চ্যাপেল বললেন, শুনতে শুনতেই আমরা বাকী পথটা পার করে দেব। আপনি কি বলেন ?

—আমারও ওই মত।

হিল্ডা বলতে আরম্ভ করল।

গুছিয়ে অবশ্য বলতে পারল না। খাপছাড়া ভাবে যা বলল, তার সারাংশ দাঁড়ায় এই রকম—অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে ডিজনি ১৯০১ সালে শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের মধ্যেই কৈশোর কাটে ক্যানসাস সিটিতে। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। তখন তাঁর বয়স বেশী নয়। তবুও বাধ্য হয়ে চাকরী নিতে হল রেডক্রসে। ফ্রান্সে তিনি অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী চালাতেন।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ডিজনি একটি সিনেমা স্লাইড কম্পানীতে কাজ পেলেন। এখানে তাঁকে কাঁচের উপর মজার মজার ছবি আঁকতে হত। কলেজ দূরের কথা, স্কুলেই তিনি ভালভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। কাজেই হাতে কলমে অঙ্কন শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি। ওই ক্ষমতা তাঁর ঈশ্বরদত্ত।

এখানে কাজ করতে করতে অন্য এক পরিকল্পনা মাথায় দানা বাঁধল। ডিজনির যে কোন ব্যাপারের গভীরে পৌঁছাবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। অনেকে তুচ্ছ বলে যা উপেক্ষা করে তিনি তারই মধ্যে বিশেষত্ব লক্ষ্য করতেন। এই জ্ঞানই পরবর্তীকালে তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল।

পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে আহামরি কিছু না হলেও, তাঁর মত লোকের কাছে তখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর্থিক সঙ্গতি নেই, তবুও তিনি স্থির করে ফেললেন সিনেমা জগতে প্রবেশ করবেন। তাঁর সচ্ছল ভবিষ্যতের বুনিয়াদ নিশ্চিতভাবে ওখানে গড়ে উঠবে। ১৯২৩

সালে ভাই রয়-এর সহযোগিতায় কম্পানী প্রতিষ্ঠিত হল। ছবি হবে রূপকথার গল্প নিয়ে। বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি প্রথম ছবি অ্যালিম ইন কারটুন ল্যাণ্ড শেষ করলেন।

ক্যানসাস সিটিতে যখন ডিজনি থাকতেন তখন তাঁর মাথা গোঁজবার জায়গায় ছোট্ট একটি ইঁদুরের যাতায়াত ছিল। এই ইঁদুরটির হাবভাব খুঁটিয়ে দেখেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে স্থির করলেন, ইঁদুরকে নায়ক করে হাসির ছবি তুলবেন। ১৯২৮ সালে সিনেমার পর্দায় মিকি মাউসের জন্ম হল। মিকি হিট হয়ে গেল। শুধু আমেরিকায় নয়; সারা পৃথিবীর দর্শকের হৃদয় জয় করে নিল সে।

১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মিকি মাউস পর্যায়ের ছবি তুলেছেন। তারপর পূর্ণ দীর্ঘ চিত্রে হাত দেন। এখানেও তাঁর সাফল্য অবিস্মরণীয়। মাত্র চল্লিশ ডলার মূলধন নিয়ে তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেছিলেন —পরবর্তীকালে প্রতিভা আর ভাগ্যের জোরে কোটি কোটি ডলার আয় করে গেছেন দীর্ঘ চার দশকের সামান্য কিছু বেশী সময় পর্যন্ত। ডিজনি সিনেমা শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এর মধ্যে উনচল্লিশটি অস্কার আট শতাধিক অন্যান্য পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯৫৪ সালের শেষের দিকে তিনি টেলিভিশনের পর্দায় দেখা দিলেন। এখানেও অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর প্রোগ্রামের জন্য দর্শক আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত। কোন কিছু সৃষ্টি করার ব্যাপারে তিনি যে সাবলীলতার পরিচয় দিতেন তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

ওয়াল্ট ডিজনির শেষ কৃতিত্ব হল ডিজনিল্যাণ্ড। কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে তিনি এই আশ্চর্যজনক দর্শনীয় স্থানটি সৃষ্টি করেছেন। এখানে এমন সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে যা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ডিজনিল্যাণ্ডের মত এমন কেন্দ্র পৃথিবীতে আর নেই। ফ্লোরিডায় সাতাশ হাজার একর জমি কিনে বিরাট এক প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। ডিজনি ওয়ারল্ড গড়ে তোলার

ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু কাজ শেষ হল না।
হিমালয় ওয়াল্ট ডিজনি মারা গেলেন।

অর্থ আর খ্যাতির উচ্চ শিখরে বিরাজ করতে থাকলেও, মানুষ হিসাবে ডিজনি ছিলেন অতি সাধারণ। ভাড়া করা গাড়ীতে এখানে ওখানে যাওয়া-আসা করতেন। কোন বড় পার্টিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কুণ্ঠা ছিল। কোন নাম করা দর্জির শেলাই করা পোষাক তাঁকে কখন পরতে দেখা যায়নি। রেডিমেড জামা-কাপড় ব্যবহার করতেন।

ডিজনির দাম্পত্য জীবন ছিল খুব সুখের। প্রথম জীবনেই নিজের এক সহকর্মিণীকে বিয়ে করেছিলেন। ছেলে হয়নি। দুটি মাত্র মেয়ে আর ছটি নাতি-নাতনী। এই প্রতিভাধরের অবসর সময় কাটাত নাতি-নাতনীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে খেলা করে।

ওয়াল্ট ডিজনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

> আমি হচ্ছি মৌমাছির মত। মৌমাছি যেমন এক ফুল থেকে আরেক ফুলে, আবার অন্য ফুলে বসে মধু আহরণ করে, আমিও তেমনি। আমি মধুভাণ্ডে মধু জমিয়ে যাই।

হিল্ডার বলা শেষ হলে চ্যাপেল বললেন, সব তো বুঝলাম। কিন্তু ডিজনি এতগুলো বছর শুধু নিজের বৌকে নিয়েই সন্তুষ্ট রইলেন। ভদ্রলোক প্রতিভাধর হতে পারেন, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি একেবারেই ছিল না। হিল্ডা তুমি কি বল?

—ঠিক তাই। পুরুষ মানুষের দুচারটে মেয়ে বন্ধু থাকবে না, এ যেন বড় বাজে ব্যাপার। কাজ পাগল অনেকেই হয়, তাই বলে—

হিল্ডা কথা শেষ করল না।

আমি বললাম, কিছু মনে করবেন না। আজ নয় কাল বিয়ে নিশ্চয় করবেন। তখন আপনার স্বামী বান্ধবীদের নিয়ে যদি বাড়াবাড়ি করেন—আপনার ভাল লাগবে?

—এতে খারাপ লাগবার কি আছে? আমারও তো কয়েকজন পুরুষ বন্ধু থাকবে। আমিও তো তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশব।

এবার কি বলব ভেবে পেলাম না। আমেরিকার সমাজ-জীবন দ্রুত তালে যে পথ ধরে চলেছে তার শেষ কোথায় কে জানে। হয়তো এখানে একদিন বিয়ে বলে কিছু থাকবে না। মানুষ সব দিক দিয়ে সভ্যতার চরম বিন্দুর দিকে যত এগিয়ে চলেছে, আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে তত বেশী করে।

চ্যাপেল একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, দেশ থেকে তো অনেক দূরে চলে এসেছেন, বান্ধবীদের কথা ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয় মনে পড়ছে?

—আমার স্ত্রী আছেন, বান্ধবী নেই। স্ত্রীর কথা, বাচ্চার কথা মাঝে মাঝে নিশ্চয় মনে পড়েছে।

—বান্ধবী নেই কেন?

— আমাদের দেশের ব্যাপার-স্যাপার একটু অন্য রকমের।

—কি রকম?

একটু থেমে বললাম, আসল কথাটা কি জানেন, আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন ছেলে-মেয়ে বিয়ের পর স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রেম করতে আরম্ভ করে। তার আগে সুযোগ-সুবিধা বিশেষ হয়ে ওঠে না।

অবাক হয়ে হিল্ডা বলল, বাকি জীবন একজন একজনের প্রতি একাগ্র থেকেই কাটিয়ে দেয়?

—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই।

তারপর একটু হেসে বললাম, কয়েক হাজার বছর ধরে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তারই উত্তরাধিকারী আমরা। রাতারাতি আপনাদের মত প্রগতিশীল ভারতীয়রা কিভাবে হয়ে উঠবে বলুন?

—আশ্চর্য—

এই প্রসঙ্গে আরো কথাবার্তা হয়তো হত, কিন্তু দেখা গেল

ডিজনিল্যাণ্ডের প্রধান তোরণের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি। অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে একধারে। নানা রং-এর পোশাকে সজ্জিত মানুষ দলে দলে এসেছে এখানে কয়েক ঘণ্টা হতবাক হয়ে থাকবার জন্য।

অনেক খুঁজে পেতে আমরা কনভার্টেবল শেভ্রলেকে একটা জায়গায় পার্ক করতে পারলাম। তারপর আমরা টিকিট কেটে ঢুকলাম ডিজনিল্যাণ্ডের মধ্যে। প্রতি বছর ষাট সত্তর লক্ষ লোক দেখতে আসে এই বিস্ময়কর জগৎ। তাদের খুশী করার জন্য এখানে চার হাজার কর্মী নিযুক্ত রয়েছে।

ভেতরে ঢুকেই আমরা আর বিংশ শতাব্দীতে রইলাম না। পৌঁছে গেলাম সপ্তদশ শতাব্দীর আমেরিকায়। এতটুকু খুঁত নেই কোথাও। সেই ধরনের দোকান-পাট, রাস্তা-ঘাট যে সমস্ত লোকজন যাওয়া-আসা করছে, তাদের ভাবভঙ্গীও পোশাক-আসাকও হুবহু সেকেলে।

অনেকগুলি বিভাগ আছে। যেমন—অ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ড, ফ্রন্টিয়ার-ল্যাণ্ড টুমরোল্যাণ্ড, ফ্যানটাসিল্যাণ্ড, টিকিরুম প্রভৃতি। একদিনে—আট দশ ঘণ্টা ঘুরলেও একজনের পক্ষে সমস্ত কিছু দেখা সম্ভব হয় না। সুবিধার জন্য আমরা সঙ্গে একজন গাইড নিয়ে নিয়েছিলাম।

পুরানো আমেরিকা থেকে বেরিয়ে আমরা ডিজনিল্যাণ্ড রেল রোড স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। চড়ে বসবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম জানালার মধ্যে দিয়ে আমেরিকার বিশেষ প্রাকৃতিক আকর্ষণগুলি একে একে দেখতে পাচ্ছি। কখনও গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান পার হচ্ছি, কখনও মরুভূমির পাশ দিয়ে চলেছি, কখনও রেড ইণ্ডিয়ানদের পল্লী পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি—অথচ কিছুই নকল বলে মনে হচ্ছে না।

ট্রেন থামল এক সময়।

অনেকের সঙ্গে আমরাও নেমে পড়লাম।

অ্যাডভেঞ্চার ল্যাণ্ডে পৌঁছে আমাদের চক্ষুস্থির। জঙ্গলের মধ্যে

দিয়ে কিছুদূর এগুবার পর নদীর সাক্ষাৎ পেলাম। খরস্রোতা নদী। ডিজেল চালিত বোট অপেক্ষা করছিল। আমরা উঠে বসতেই বোট এগুতে আরম্ভ করল। এরপরই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জঙ্গলের সাক্ষাৎ পেতে লাগলাম। অর্থাৎ আমাদের বোট কখনও বেলজিয়াম কঙ্গোর মধ্যে দিয়ে, কখনও পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে দিয়ে আবার কখনও ব্রাজিলের ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে। বিশাল বিশাল হাতি দেখতে পাচ্ছি। জলে হিপোপটেমাসরা রয়েছে। তারা আবার তাল করছে বোট উল্টে ফেলার। যাত্রীরা ভয়ে কেঁপে উঠেছেন।

এই সময় আবার দারুণ ব্যাপার ঘটল।

একদল নিগ্রো নদীর ধারে নাচ গান নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মূর্তিমান মৃত্যুর মত এক গণ্ডার এসে উপস্থিত হল সেখানে। তারপর তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাদের। আমরা বোটের যাত্রীরা আতঙ্কিতভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম পরিণতি দেখবার জন্য। ইলেক্ট্রোকের কারসাজিতে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে জানা থাকলেও, সমস্ত কিছু এত নিখুঁত যে বাস্তব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পাচ্ছিলাম না।

এরপর আমরা নবীন পৃথিবীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, ঘুরে বেড়াত বিশাল বিশাল সমস্ত জীবজন্তু—সেই সমস্ত ডাইনসরস, ম্যামথ প্রভৃতি জন্তুর কঙ্কাল মিউজিয়ামে দেখা যায়—তাদের সচক্ষে দেখলাম। ভয়ঙ্কর জীবেরা সব চড়ে বেড়াচ্ছে নির্বিবাদে, লড়াই করছে নিজেদের মধ্যে। সেই সঙ্গে দেখলাম সেকালের পৃথিবী কত সবুজ ছিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা সাবমেরিন ঘাঁটিতে এলাম। সাবমেরিনে চড়ে সামান্য কিছু জলে নামতেই মনে হল গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেছি। সেই গভীরে যে কত বিচিত্র রহস্য রয়েছে, কত হিংস্র জীব আর নিরীহ মাছ রয়েছে—দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। অথচ প্রমাণ করার উপায় নেই যে সমস্ত নকল।

আমাদের তিনজনের মুখে কথা নেই। ধারাবাহিক বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আরো কত কি যে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। সেই দেখার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে দশ ফর্মার একটি বইএ সমস্ত কুলবে কিনা সন্দেহ। মাত্র একটি মানুষের চেষ্টায় এই বিশাল ব্যাপার সম্ভব হয়েছে ভাবাই যায় না যেন। আমাদের দেশে ওয়াল্ট ডিজনির মত কেউ জন্মায় না কেন কে জানে।

ডিজনিল্যাণ্ড থেকে যখন বেরিয়ে এলাম বিকেল গড়িয়েছে। ঘণ্টা ছয়েক ধরে ওই বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড দেখেছি। স্যাণ্ডউইচ আর কফি ছাড়া কিছু খাইনি। ভাল করে খাবার কথা মনেই পড়েনি আমাদের। মনে মনে স্থির করলাম আবার একদিন আসব।

—ফিরে চলেছি।

কারুর মুখে কথা নেই।

সকলের মনেই ওয়াল্ট ডিজনি পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজ করছেন।

শেষে নীরবতা ভঙ্গ করলাম আমিই।

—কি রকম বুঝলেন? এত কাণ্ডর মধ্যে জড়িয়ে থাকার পর স্ত্রী ছাড়া আরো গুটি কয়েক বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সময় ডিজনির কি ছিল?

চ্যাপেল শব্দ করে হাসলেন।

হিল্ডা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পনেরো দিন পরের কথা।

লাঞ্চ সেরে সবে নিজের ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছি—খবর পেলাম প্রডাক্সন ম্যানেজার আমায় ডেকেছেন। অবাক না হয়ে পারলাম না। এই অসময়ে ডাক কেন? ঠিক মত প্রগ্রেস হচ্ছে না, তাই কি ডেকেছেন দু'চার কথা শোনাবার জন্য। কল্পনায় রাক্ষস সৃষ্টি করে লাভ নেই। আমি তাঁর ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

আমাদের এই কারখানার আয়তন বিশাল। তবে ভাগ্যক্রমে প্রোডাক্সন ম্যানেজার স্যামুয়েল গ্র্যাণ্টের ঘর আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকে খুব দুরে নয়। স্প্রিং লাগানো পাল্লা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। স্ট্যাণ্ড লাগান নীচু আল্লোর সামনে একটা টেস্ট টিউব তুলে ধরে—তার মধ্যেকার তরল পদার্থ নিরীক্ষণ করছিলেন তিনি। এবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে নিলেন। ইঙ্গিত করলেন বসতে।

গ্র্যাণ্টের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চওড়া কাঁধের উপর যে বিশাল ভারী মুখ বসান রয়েছে তাতে হাসির ছোঁয়াচ কেউ কখন দেখেনি। রগের দুপাশ পাকতে আরম্ভ করেছে। কপালে অজস্র বলি রেখা। এই কাজ পাগল মানুষটির মধ্যে রস কম আছে বলে মনে হয় না। ইনি ছাত্রজীবনে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন বিশেষ ছিলেন।

— কেমন আছো বল ?

প্রতিদিন দশবার করে দেখা হচ্ছে তবুও এই প্রশ্ন কেন বুঝলাম না। ইংরাজদের কথা আলাদা, আমেরিকানরা তো সৌজন্যতার ধার ধারে না।

—ভাল আছি স্যাব।

—কাজে মন বসছে তাহলে। গত বছর দুজন ফ্রেঞ্চ ছোকরা এসেছিল। তাদের মন ছিল না কাজে। ছুঁক ছুঁক করে বেড়াত। সেদিক দিয়ে ভারতীয়রা ভাল।

আমি কিছু বললাম না।

দারুন মোটা এক সিগার বার করে ধরালেন গ্র্যাণ্ট।

বললেন আবার শুনলাম, তুমি আজকাল অফিসার্স ক্যাণ্টিনে না গিয়ে লেবারদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সারছো। যদি ব্যাপারটা সত্যি হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক।

—আপনার কথার সঠিক অর্থ আমি ধরতে পারলাম না স্যার।

খাওয়া-দাওয়া আমি কোথায় করব সে স্বাধীনতা আমার আছে বলেই জানি।

—নিশ্চয়—নিশ্চয় আছে। তবে সম্মানের কথা মনে রেখে সংযত হওয়াই ভাল। একজন অফিসার নিগ্রোদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছে এটা ঠিক নয়। তাছাড়া—

তিনি থামলেন। সিগার নিভে যাওয়ায় ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিরক্তিতে আমার মন তেতো হয়ে উঠল। বৈষম্যকে যেমন তেমন ভাবে বজায় রাখাই কি এদের কাজ!

বললাম, আমার রংও কালো স্যার।

—বাদামি আর কালোর পার্থক্য আমি বুঝি। তাছাড়া তুমি ওদের সঙ্গে একটু বেশী মাত্রায় মেলা-মেশা করছো খবর পেয়েছি। এটা ঠিক নয়। তোমার বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক লোক উত্তেজিত হয়ে পড়ুক আমি তা চাই না।

—আমার বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক লোক উত্তেজিত হবে কেন? কাদের সঙ্গে মেলামেশা করব তা তো সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হওয়া উচিত।

—নিশ্চয়—গ্র্যাণ্ট বললেন, এখানকার হালচাল ক্রমেই বুঝতে পাচ্ছ! কিছু লোক আছে, যারা নিগ্রোদের বা তাদের সমর্থকদের একেবারেই পছন্দ করে না। গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে। আমি অবশ্য ও দলে নেই।

—আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার। আপনি কি এই কথা বলার জন্যই আমাকে ডেকেছেন।

—ঠিক তা নয়। তুমি আগামীকাল সানজুয়ান যাচ্ছ। কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমরা রওয়ানা হব। হপ্তা খানেক থাকতে হবে ওখানে। সেই ভাবে তৈরী হয়ে নিও।

—ওখানে আমরা কেন যাচ্ছি জানতে পারি কি?

—নিশ্চয় জানবে। সানজুয়ানে আমাদের ফ্যাক্টরির একটা

ব্রাঞ্চ হবে স্থিব হয়ে গেছে। সেই সম্পর্কেই আমাদের যেতে হচ্ছে।

উত্তর কেমন বেখাপ্পা শোনাল। আনি এখানে এসেছি হায়ার ট্রেনিং নিতে। ফ্যাক্টরী ব্রাঞ্চ কোথায় হবে তা নিয়ে আমার কিছু করাব থাকতে পারে না। তবে উদ্দেশ্য ছাড়া যে কিছু হচ্ছে না তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?

গ্র্যাণ্ট আবার বললেন, আর কিছুক্ষণেব মধ্যেই তোমার কাছে কাগজপত্র পৌঁছে যাবে। দেখে রেখো। এখন যেতে পার।

আমি চিন্তিত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সানজুয়ান জায়গাটা কোথায় তাও আমার জানা নেই।

আমেরিকার মধ্যেই নিশ্চয়।

কারখানা থেকে বেরুবার আগেই মুখ আঁটা একটা খাম আমাব হাতে এসে পড়ল। খাম পকেটে ফেলে অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এলাম। সানজুয়ান সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। খামের মধ্যে যে কাগজ-পত্র আছে তা পড়ে নিশ্চয় বুঝতে পারা যাবে।

কাপড় বদলে সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে আয়েশে কয়েকবার টান দিলাম। কালচে হলদে ধোঁয়া উপরে উঠে যেতে যেতে ক্রমে সিগারেট ছোট হয়ে এল। টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দেবার পর, খামের মুখ ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল এক চিলতে কাগজ। সানজুয়ানে আমায় কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারই বিবরণ।

ঘোরপ্যাঁচের কোন ব্যাপার নয়। প্রথম শ্রেণীর ব্যবসাদারবা ব্যবসার খাতিরে যে কোন সাহায্য যে কোন লোকের কাছ থেকে নিয়ে থাকেন—এখানেও পরিস্থিতি সেইরকম। সানজুয়ানে যে জায়গা বাছা হয়েছে, সেখানে ফ্যাক্টরী করার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।

এই অনুমতি দেওয়ার অধিকারী ওখানকার স্টেট ডিপার্টমেণ্টেব

সেক্রেটারী তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিন পুরুষ ওখানে আছেন —দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবু ভারত এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে দুর্বলতা এখনও বর্তমান। আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাই। আমি অনুরোধ জানালে তিনি হয়তো রাজী হয়ে যেতে পারেন।

রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেল। তবে এটুকু বুঝলাম সানজুয়ান আর যেখানেই হোক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নয়। কারণ এখানকার সেক্রেটারী অব স্টেট ভারতীয় বংশোদ্ভূত নন। আগামী সন্ধ্যায় কোন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি না জানতে পেরে মন খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ভেবে চিন্তে শেষে এই বাড়ীর কেয়ারটেকারকে ফোন করলাম।

ভদ্রলোক ফোন ধরতেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। সানজুয়ান কোথায় বলতে পারেন?

—পোরটরিকোয়।

—ওখানকার—

—রাজধানী। আপনি কি পোরটরিকো সম্পর্কে কিছু জানতে চান?

—তেমন কোন তথ্য পেলে ভাল হয়। আপনার কাছে ওখানকার কোন বুকলেট আছে নাকি?

—বুকলেট নেই। সাইক্লোপিডিয়া আছে। পি'ভলিউম পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওতে পেয়ে যাবেন।

—ধন্যবাদ। পাঠাতে হবে না। ডিনারের পর আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব বইটা।

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

পোরটরিকো দেশটির সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকলেও, আগে নাম শুনেছি। এমন কি হিল্ডার নবতম বন্ধু ওয়াল্টার চ্যাপেল ওখানেই কাজ করেন। বিচিত্র কাকতালীয় ব্যাপার।

টেলিভিশন দেখে কিছুক্ষণ সময় কাটল।

ডিনার সারলাম আটটার সময়।

দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা করতে এখন আর কোন অসুবিধা হয় না। চিকান, হ্যাম, বিফ ষ্টেক ইত্যাদি ফ্রিজে কিনে এনে রেখেছি। খাবার সময় গরম করে বা ভেজে নিলেই হল। এছাড়া স্লাইস ব্রেড, বাটার, চিজ, কয়েক রকমের চাটনি তো আছেই। ডিম সিদ্ধও করে নেওয়া যায়। কয়েক বোতল পানীয়ও কিনে রেখেছি।

কেয়ারটেকারের কাছ থেকে সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে আসতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগল না। বই খুলে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পোরটরিকো পাওয়া গেল। বিশদভাবে কিছু লেখা নেই। যেটুকু আছে তাতেই আমার কাজ হবে।

ডোমিনিকান রিপাব্লিক ও কিউবার পরই এই দেশের অবস্থান। টুরিষ্ট প্যারাডাইস বলতে যা বোঝায় তাই। পোরটরিকো দৈর্ঘ্যে একশ মাইল আর প্রস্থে পঁয়ত্রিশ মাইল—লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষর মত। আজকের আমেরিকায় আধুনিক সভ্যতার পদার্পণ ঘটবার আগেই, স্প্যানিয়ার্ডরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বহুদিন ধরে জলদস্যুদের এখানে আধিপত্য ছিল বলা যেতে পারে। অনেক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডর নীরব সাক্ষী এই দেশটি।

১৮৯৮ সালের যুদ্ধে স্পেন হেরে যাওয়ায় পোরটরিকো আমেরিকার দখলে আসে। এখানকার বেশীর ভাগ অধিবাসীই স্প্যানিয়ার্ড এবং রোমান ক্যাথালিক। ইংরাজী ভাষার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই। মাতৃ ভাষাতেই কথাবার্তা বলে। জলদস্যু ও যুদ্ধবাজদের রক্ত তাদের শিরায় বইতে থাকলেও এখন অদ্ভুত শান্ত প্রকৃতির। গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত-খামার নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

রাজধানী সানজুয়ানের লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষর কিছু বেশী। অধিকাংশই আমেরিকান। ছোট থেকে বড় সমস্ত ব্যবসাই তাদের দখলে। কিউবা কমিউনিষ্টদের কবলিত হবার পর, পোরটরিকোই

টুরিষ্টদের মন হরণ করে নিয়েছে। প্রতিবছর এক লক্ষর বেশী মানুষ এখানে বেড়াতে আসে। তাদের মধ্যে নব্বই ভাগ আমেরিকান।

এখানকার শাসনের কাঠামো বিচিত্র। মার্কিন মুদ্রাই এখানকার মুদ্রা। দেশ রক্ষা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করার অধিকার মার্কিন সরকারের। তবুও দেশটি স্বাধীন হিসাবেই চিহ্নিত। এখানে মন্ত্রিসভা, পার্লামেণ্ট ইত্যাদি আছে। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা তাঁরাই পরিচালনা করেন। মার্কিন ডলারের অনুগ্রহে দেশের আর্থিক অবস্থা ভালই।

আমি পড়া শেষ করলাম। পোরটরিকোর মোটামুটি পরিচয় হল এই। স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নয়, এমন বিচিত্র দেশ পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। বুঝলাম, আমেরিকা কোন দিনই পোরটরিকোকে স্বাবলম্বী হতে দেবে না—দেবে না কিউবার জন্যই। কমিউনিজমের প্রসার এই অঞ্চলে যাতে না ঘটে, রাশিয়া যাতে কিউবার কাছাকাছি আর কোন দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তার জন্য খর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটির জন্ম দেওয়া হয়েছে পোরটরিকোয় এই জন্যই।

হাই উঠতে লাগল। আড়ামোড়া ভাঙ্গলাম।

উঠলাম সোফা ছেড়ে। বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বাললাম। শুয়ে পড়লাম। এই সমস্ত একান্ত অবসরে বাড়ীর কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে। মুঙ্গেরে এখন বেলা নটার কাছাকাছি হবে। হয়তো আকাশে ভারী মেঘ—অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে শহর। বাবা বোধ হয় পাপ্পুকে দোতলায় ডেকেছেন। ঠাকুরদাদা আর নাতনীর মধ্যে নানা আলোচনা চলেছে। দুবছর পরে যখন ফিরব তখন আমার সাত বছরের মাজননী নবছরের হয়ে যাবে। দেখতে নিশ্চয় খুব বড়সড় লাগবে।

ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

রাত সাড়ে বারটায় প্লেন ছাড়ল।

ডোমিনিকান রিপাব্লিক ছুঁয়ে সানজুয়ান বিমান বন্দরে পৌঁছাবে সকালে। যাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি ভালই। স্যামুয়েল গ্র্যান্ট চেষ্টনাট কালারের স্যুট পরে এসেছেন। ভ্রুকুঁচকে বসে আছেন। নিজের আসনে। তাঁর পাশেই রয়েছে হিল্ডা ডেভিস। হিল্ডা তাঁর সেক্রেটারী, কাজেই বসের সঙ্গে তাকেও সানজুয়ান যেতে হচ্ছে।

নিশ্চয় মনে মনে খুসী হিল্ডা। বন্ধু ওয়াল্টার চ্যাপেলের সঙ্গে কয়েকদিন ঘনিষ্ঠভাবে কাটাবার অবকাশ পাবে। আমি বসেছি পরের সারিতে। আমার পাশেই রয়েছেন একজন নিগ্রোভদ্রলোক। যৌবন অনতিক্রান্ত শক্ত কাঠামোর মানুষ। প্লেন ছাড়ার পর আলাপ হল। উনিই আলাপের সূত্রপাত করলেন আর কি।

আপনি কি ভারতীয়?

মুখ ফিরিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

—ঠিক ধরেছি তাহলে। ভারতীয় আর পাকিস্তানীদের চেহারা প্রায় একই রকম হওয়ায় গুলিয়ে যায়। আমি জো ব্রান্ত।

নিজের নাম বললাম। কি জন্য আমেরিকায় এসেছি তাও বললাম।

ব্রান্ত বললেন, আমি ক্যালিফোর্নিয়ার লোক। সানজুয়ানের এক তামাক কম্পানীর চার্জম্যান। ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলাম।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুসী হলাম মিঃ ব্রান্ত। পোরটরিকো জায়গাটা কেমন?

—বছর পাঁচেক ওখানে আছি, এখনও পর্যন্ত খারাপ লাগেনি। প্রাচ্য দেশীয় জল হাওয়ার সাক্ষাত পাবেন। চমৎকার সমস্ত দৃশ্য চোখে পড়বে। সমুদ্র স্নানের এমন মনোহর অবস্থা সারা আমেরিকা ঘুরে আর কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ। পকেট যদি আপনার ডলারে কানায় কানায় ভর্তি থাকে, তবে তো কথাই নেই—নিউইয়র্কের মত নাইট লাইফ আপনি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন।

কথা শেষ করে ব্রান্ত হাসলেন।

—তাই ওখানে টুরিষ্টের এত ভীড়।

—আপনিও বেড়াতে চলেছেন নাকি ?

মুখে হাসি টেনে বললাম, আমি গরীব দেশের অধিবাসী। বেড়িয়ে খরচ করার মত অর্থ কোথা থেকে পাব বলুন। সানজুয়ান চলেছি অফিসের কাজে। সঙ্গে বস রয়েছেন।

একটু অন্যমনস্কভাবে ব্রান্ত বললেন, আপনাদের তবু সান্ত্বনা আছে, অনুন্নত দেশ। আমরা অর্থ উপচে পড়ছে এমন দেশের নাগরিক। অথচ দেখুন, আমেরিকার নিগ্রোদের খরচ করার ক্ষমতা নেই। নেই কেন জানেন—?

—জানি—মনে—

—জানা কথা আরেকবার শুনুন। বৈষম্য। আমাদের দাবিয়ে রাখার জন্য বিরাট একটা পার্থক্য সাদারা সব সময় বজায় রাখতে চায়। এর জন্য তারা নীচতার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

প্লেনের এই স্বল্প-পরিসর জায়গায় এই ধরনের আলোচনার পক্ষে প্রশস্ত নয়। যদিও চাপা গলায় কথাবার্তা চলেছে—কিন্তু ব্রান্তর মধ্যে উত্তেজনা যে ভাবে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তিনি গলা চেপে কতক্ষণ কথা বলতে পারবেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া হিল্ডা বার কয়েক মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখে নিয়েছে।

বললাম, আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন।

—স্বাভাবিক।

তারপরই বোধহয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা উপলব্ধি করলেন।

—এখন ও-প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক। আপনার সঙ্গে কথা বলে বড় আনন্দ পাচ্ছি।

সানজুয়ানে দেখা করব। ওখানে কোন হোটেলে উঠছেন ?

—বলতে পারব না। ব্যবস্থা সবই ওঁদের। বুঝতে তো পারছেনই, আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে চলেছি।

—ঠিক আছে। আমি খুঁজে নেব। আপনি বসুন, আমি সিগারেটে দুচার টান দিয়ে আসছি।

ব্রাস্ত উঠে গেলেন।

আমি সিটে আরো একটু হেলে বসলাম।

কিছু যাত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিছু ঢুলছেন। পর্দা সরিয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম, একরাশ নক্ষত্র ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। চোখ সরিয়ে নিতেই হাই উঠল। আলস্যের ঢল নামল শরীরে। আমিও এবার ঘুমের তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম।

নির্দিষ্ট সময়েই সানজুয়ান বিমান বন্দরে পৌঁছালাম।

দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রাস্ত আগেই নেমে গেলেন। মিঃ গ্র্যাণ্টের হচ্ছে হবে ভাবের জন্য আমরা তিনজন নামলাম সব শেষে। রানওয়ে পেরিয়ে, কাস্টামস চেকিং-এর ঝামেলা পার হয়ে সবে লাউঞ্জে পা দিয়েছি—দেখলাম, হাসিমুখে ওয়াল্টার চ্যাপেল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হল না, হিল্ডা আগেই তার করে আগমনবার্তা জানিয়ে রেখেছিল।

চ্যাপেল এগিয়ে এলেন।

হিল্ডা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে। স্যার—

মিঃ গ্র্যাণ্ট সিগার ধরিয়েছিলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

উচ্ছ্বাসপ্রবণতা এঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। যে কোন ব্যাপারে নিরাসক্ত এই পুরুষটি কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। তাই বোধহয় অবসর পর্যন্ত পাননি বিয়ে করার।

—স্যার, মিঃ ওয়াল্টার চ্যাপেল। ইনি আমার—

—বয়ফ্রেণ্ড।

ভরাট গলায় পাদপূরণ করলেন স্যামুয়েল গ্র্যান্ট।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুসী হলাম মিঃ চ্যাপেল। তা এখন কি করতে চান ?

—আপনি যদি অনুমতি করেন—চ্যাপেল বললেন, আমি নিজের গাড়াতে হিল্ডাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে পারি।

—খুব ভাল কথা। আপনারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।

তারপব তিনি আমার দিকে ফিরলেন।

—আমাদের তো আব কেউ রিসিভ করতে আসবে না। অপেক্ষা করে আর লাভ নেই এখানে। ট্যাক্সিতে মালপত্র চাপিয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়াই ভাল।

অন্যান্য শহরের মত বিশাল বন্দর থেকে জনজীবনের কেন্দ্রস্থল বেশ কিছুটা। ঘন্টাখানেক লেগে গেল হোটেলে পৌঁছাতে। পথে নতুন মডেলের অজস্র গাড়ীব ভীড় আমাকে হতবাক করে দিল। সানজুয়ান কোন অভিজাত শহর নয়—তবু টেক্কা দেওয়ার মনোভাব নিয়ে যেন মেতে রয়েছে।

'গোল্ডেন ডোর'।

হোটেলের নামে নতুনত্ব আছে। আভিজাত্যের দিকে অন্যতম, শ্রেষ্ঠ। পরে শুনেছি, বছর দশেক আগে শিকাগোর এক ধনকুবের এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। কি খেয়াল হল, অনেক ডলার ঢেলে এই হোটেলের জন্মটা দিয়ে বসলেন।

'গোল্ডেন ডোরে' পা দিয়েই বুঝলাম, বিলাসবহুল হোটেল বলতে একেই বোঝায়। ম্যানেজার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। তিনটি ঘর আগে থেকেই বুক করে রাখা ছিল। আমরা অবিলম্বে তিন তলায় নিজেদের ঘরে চলে গেলাম। ততক্ষণে হিল্ডাও এসে পড়েছিল। পরে আসবেন কথা দিয়ে চ্যাপেল বিদায় নিয়েছেন।

গ্র্যান্ট আমায় জানিয়ে রেখেছেন, আজ আর কোন কাজ নয়—

পূর্ণ বিশ্রাম। শহরে ঘুরে ফিরে আসতেও বাধা নেই। যার জন্য আসা, সেই কাজে হাত দেওয়া হবে কাল থেকে। ঘরে পৌঁছাবার দশ মিনিট পরেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল।

খিদে পেয়েছিল বেশ। দক্ষিণ হাতের কাজ শেষ করে নিজেকে ঢেলে দিলাম বিছানায়। ঘুম বলতে যা বোঝায় গত রাত্রে ঠিক তা হয়নি। বসা অবস্থায় জুত করে ঘুমান যায় না। এখন চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। স্বচ্ছন্দে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

কিউবা যদি ক্যারাবিয়ান অঞ্চলের রাণী হয় তবে পোরটরিকোকে নিশ্চিতভাবে তার ঘনিষ্ঠ সহচারী বলা যায়। বিস্তৃত নয়নরঞ্জক সিবীচের দিকে তাকিয়ে আমি ওই কথাই ভাবছিলাম।

চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার পর। ঘর সংলগ্ন ব্যালকনিতে বসে সানজুয়ানের চাঞ্চল্য দেখতে দেখতেই লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সময় ডাইনিংরুমে হিল্ডাকে দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়নি, কিন্তু মিঃ গ্র্যান্টকেও দেখতে পেলাম না।

হয়তো তিনি ঘরেই খাওয়া-দাওয়া সারছেন। রসনাকে তৃপ্ত করে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এলাম। বার কাউন্টারের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যানেজার। চওড়া হাসিতে মুখ ভরিয়ে এগিয়ে এলেন।

—আশা করি স্যার খাওয়া-দাওয়া ভালই হয়েছে। দুপুরে বিশ্রাম করার ইচ্ছে আছে না শহর দেখতে বেরুবেন ?

—বিশ্রামের আর দরকার নেই। ভাবছি একটু ঘুরে-ফিরে আসি। কাল থেকে তো আবার কাজের ঝামালা আছে।

—চমৎকার কথা ভাবছেন। আমাদের সানজুয়ানকে প্রাণ ভোরে উপভোগ করুন। পরিচিত ট্যাক্সি ড্রাইভাররা বাইরে অপেক্ষা করছে। কাউকে ঠিক করে দেব কি ?

—এখন নয়। আধঘণ্টা পরে।

ঠিক আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল থেকে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্যই হল সিবীচ। লাখ খানেক টুরিষ্ট যে প্রতিবছর এখানে আসেন—তাঁদের একমাত্র আকর্ষণ ওই সমুদ্র সৈকত। আকাঙ্ক্ষা, বালির উপর প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে থেকে প্রাণ ভরে সূর্যস্নান করা। এদিক-ওদিক ঘুরে সমুদ্রের ধারেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছালাম।

পোরটরিকোয় এখন গরমকাল। তবে আজ বিন্দুমাত্র গরম অনুভূত হচ্ছে না। সারা আকাশ ছেয়ে রয়েছে কালো আর ভারী মেঘ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বৃষ্টি নামল বলে। টুরিষ্ট সমাগম এই সিজিনে বিশেষ হয় না। তবুও দেখলাম, বালুবেলায় নরনারীর প্রচুর ভীড়। কোন কোন দল আবার ডোরাকাটা ছাতার তলায় বসে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছে।

একটা ঢিপির উপর বসে সিগারেট টানতে টানতে এই সমস্ত দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। সমস্যা বলে যেন কিছু নেই, কত স্বচ্ছন্দ এদের জীবন। একসময় মনে হল, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়ে কোন দোকান থেকে একটা তোয়ালে আনিয়ে নিয়ে জলে নেমে পড়ি। বম্বেতে থাকাকালীন সমুদ্রে স্নান মাঝে মাঝে করতাম। আমেরিকায় পা দেবার পর থেকে ও কাজ একেবারেই হয়নি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু স্নান আর করলাম না।

আড়াইটে বেজে যাবার পর উঠে পড়তে হল।

কতক্ষণ আর এখানে বসে থাকব।

বেশ কিছুটা দূরে, যেখানে অসংখ্য গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমার ট্যাক্সিও আছে সেখানে। নতুন লোক আমি, আবার পাব কি পাব না তাই ট্যাক্সি আর ছাড়িনি। এগুতে যাবার মুখেই আমায় থামতে হল বেশ সচকিতভাবেই।

দেখলাম, প্রায় শ'খানিক গজ দূর দিয়ে স্যামুয়েল গ্র্যান্ট চলেছেন। তাঁর বাহু জড়িয়ে ধরে এগুচ্ছে হিল্ডা। কোম বা ওই জাতীয় কোন কিছুর ছোট একটা টুকরো দিয়ে লজ্জার স্থানটুকু শুধু ঢাকা। শরীরে

আবরণ বলতে আর কিছু নেই। চোখ ফেরান আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। তার পিনোন্নত বক্ষদুটি থেকে যেন যৌবন ফেটে বেরুচ্ছে। গ্র্যাণ্ট কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নিজের ঠোঁট বুলিয়ে নিচ্ছেন হিল্ডার মুখের এখানে ওখানে।

ভদ্রলোককে যতটা রসকসহীন মনে করেছিলাম, প্রকৃত পক্ষে তিনি তা নন দেখা যাচ্ছে! সুন্দরী সেক্রেটারীর সঙ্গে আর দশজন আমেরিকান বসের মত ভালমতই ঢলাঢলি করতে পারেন। গ্র্যাণ্ট তুরিয় ভঙ্গীকে আদর করতে করতে এগিয়ে গেলেন। আমাকে দেখতে পেলে তাঁর মুখের ভাব কেমন হত কে জানে। ছায়াচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি এবার ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

শহরের যে অংশ দেখা হয়নি, সেই দিক হয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন চারটে বেজে গেছে। লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল চ্যাপেলের সঙ্গে। তিনি গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে এলেন।

কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, হিল্ডা কোথায় বলতে পারেন?

বলতে বিলক্ষণ পারতাম। কিন্তু সব সত্যি কথা সব সময় বলা যায় না। শালীনতা বলে কিছু আছে। তাছাড়া প্রশ্নকারীর মনের অবস্থার কথা বিবেচনা না করাটাও মানবিকতা নয়।

বললাম, ঠিক বলতে পাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে তো ছিলেন সকালে। তখন নিজের প্রোগ্রামের কথা কিছু বলেন নি?

—কিচ্ছু না।

একটু থেমে চ্যাপেল বললেন, সকালে আমার সম্পর্কে ওর বেশ উৎসাহই ছিল। তারপর কি যে হল—

—কি হল আবার?

—সেটাই তো বুঝতে পাচ্ছি না। সকালে ঠিক হল, মাইল কুড়িক দূরের নির্জন সমুদ্র সৈকতে আমরা দুপুরটা কাটাব। এগারটার

সময় ফোন করে জানাল যেতে পারবে না—শরীর খারাপ। সারাটা দিন নিজের ঘরে শুয়ে কাটিয়ে দেবে। আমি ওকে দেখতে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলাম।

—তখন কি—

—না শুনলাম সে বেরিয়ে গেছে। তখন থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি, এখনও দেখা নেই।

ভদ্রলোকের জন্য সহানুভূতি হতে লাগল। এখন কি বলা উচিত স্থির করতে পারলাম না। অবশ্য চ্যাপেলই আবার কথা বললেন।

—আপনার কি মনে হয় ও আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে?

—এখনই কিছু বলা যায় না।

—হিল্ডাকে আমি বিয়ে করতে চাই মিঃ ব্যানার্জী। স্ত্রীকে সুখে রাখার মত উপার্জন আমি করে থাকি।

—পরিষ্কারভাবে সে কথা মিস ডেভিসকে আপনি বললেই পারেন।

—বলার চেষ্টা তো করেছিলাম, সে শুনতেই চাইছে না। ইতিমধ্যে কি যে ঘটল বুঝতে পারলে ভাল হত। আপনি—

—বলুন?

চ্যাপেল কিছু বলার আগে গ্র্যাণ্টকে দেখা গেল। তাঁর কয়েক হাত পিছনেই হিল্ডা। এখন অবশ্য দুজনের সাজ-পোশাক যথেষ্ট শালিনতার পরিচায়ক। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দুটি মুখে ছেয়ে রয়েছে। গ্র্যাণ্ট হাত নেড়ে লিফটের দিকে চলে গেলেন।

এক ঝলক হেসে হিল্ডা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

—কতক্ষণ এসেছো?

চ্যাপেলের কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল।

—কয়েক ঘণ্টা হল। তোমার শরীর খারাপ শুনে দেখতে এসেছিলাম। অথচ তোমার কিছুই হয়নি! আমাকে মিথ্যে কথা কেন বলেছিলে জানতে চাওয়াটা নিশ্চয় অন্যায় হবে না?

—কি করে বুঝলে আমার শরীর খারাপ নয়—হিল্ডা দ্রুত গলায় বলল, উপায়হীন অবস্থায় পড়ে বেরুতে হয়েছিল। চাকরী করতে গেলে বসের কথা অমান্য করলে চলে না। একজন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। নোট নেবার জন্য আমাকেও যেতে হল।

—ও কথা যাক। তোমার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে। লাউঞ্জে বসে সে সমস্ত বলা চলে না।

—আমি দুঃখিত চ্যাপ। শরীর বইছে না—বিশ্রাম না নিলে মরে যাব। যা বলবার কাল বোলো বরং।

—কাল!

—হ্যাঁ ডার্লিং—কাল। যখন খুসী, যত ইচ্ছে দরকারী কথা বোলো, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনবো। এখন আমি ঘরে যাই—

হিল্ডা মুখে রুমাল ঠেকিয়ে হাই তোলার মত ভঙ্গী করল, তারপর এগিয়ে গেল লিফটের দিকে। আমি মনে মনে ওর অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। এত স্বাভাবিক-ভাবে একের পর এক মিথ্যা কথা বলাটা নিশ্চয় যোগ্যতার পরিচায়ক। চ্যাপেলের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে আবার পিছনে ফিরলেন।

—চলি মিঃ ব্যানার্জী।

—এখুনি যাবেন?

—এখানে আর অপেক্ষা করে কি লাভ?

তিনি চলে গেলেন।

দয়া হচ্ছিল ভদ্রলোকের জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আর তাঁকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি। তবে স্থির করে ফেললাম সময় মত হিল্ডাকে তাঁর স্বপক্ষে মন ভিজিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।

চ্যাপেল তখনও হল-এর প্রধান দরজা অতিক্রম করেননি। প্রায় মুখে পৌঁছেছেন। প্লেনে পরিচয় হয়েছিল যে ভদ্রলোকের সঙ্গে, সেই

জো ব্রান্ত প্রবেশ করলেন। মুখোমুখি হতেই দুজনের মুখের ভাব পালটে গেল। দুজনের ভঙ্গী হয়ে উঠেছে প্রায় ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার মত। প্রায় এক মিনিট এইভাব স্থায়ী রইল। তারপর চ্যাপেল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ব্রান্ত এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

আমার সামনে এসে হাসিমুখে তিনি বললেন, দেখছেন তো আমি আমার কথা রেখেছি।

—ভাবতে পারিনি আপনি আসবেন।

—কথা দিলে আমি সব সময় কথা রাখবার চেষ্টা করি। ভালই হল আপনাকে লাউঞ্জে পাওয়া গেল।

—কি করে বুঝলেন আমি এখানে আছি ?

—ফোনে প্রত্যেক হোটেলে খোঁজ নিয়েছিলাম। 'গোল্ডেন ডোর' থেকে জানাল আপনি এখানে আছেন। ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল।

—চলুন, ঘরে যাওয়া যাক।

—বেশ তো।

আমি ব্রান্তকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে গেলাম। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের মধ্যেই বয় দু'গেলাস বেশী বরফ দেওয়া বিয়ার দিয়ে গেল। আসবার সময় বিয়ার দিয়ে যাবার কথা বলে এসেছিলাম। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল।

এক সময় প্রশ্ন করলাম, আপনি মিঃ চ্যাপেলকে চেনেন নাকি ?

—বলতে পারেন চিনি।

—আপনি কিন্তু ঠিক সোজা উত্তর দিলেন না।

একটু হেসে ব্রান্ত বললেন, আসল কথাটা কি জানেন, আজ পর্যন্ত আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয়নি। তবে মুখ চেনা-চিনি আছে। আমরা দুজনেই সুযোগ খুঁজছি। যে প্রথম সুযোগ পাবে সেই দ্বিতীয় জনকে সরিয়ে দেবে দুনিয়া থেকে।

—সেকি।

আমি অবাক হলাম।

—আলাপ বলতে যা বোঝায় তা আপনাদের মধ্যে নেই, অথচ দুজনে দুজনকে খুন করার সুযোগ খুঁজছেন?

—তাই খুঁজছি আমরা।

—কেন?

ব্রাস্ত এক চুমুকে বাকী পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে গেলাস নামিয়ে রাখতে রাখতে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যার অর্থ খুঁজে পেলাম না। আমার এই প্রশ্নে তিনি কি অস্বস্তি বোধ করছেন?

—আপনার আপত্তি আছে মনে হচ্ছে। আমার এই অহেতুক আগ্রহের জন্য ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা চাইবার মত এতে কিছু নেই। আপনাকে সমস্ত বলতে বাধা কি? ভারতীয়রা নিগ্রোদের প্রতি যে সহানুভূতিসম্পন্ন আমেরিকায় বসেও তা আমরা জানি।

ব্রাস্ত সিগারেট ধরালেন।

তাঁর চওড়া কালো কপালে চিটচিটে ঘাম দেখা দিয়েছে। ঘন কোঁকড়া চুল ঘেঁসে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেতে খেতে উপরে উঠে চলেছে। তিনি নীরবেই ধূমপান করলেন কিছুক্ষণ। শেষে—

—চ্যাপেল কুক্লান ক্লাক্স দলের সদস্য।

—অর্থাৎ—

—এদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়? এই দলের জন্ম হয়েছিল লিঙ্কনের আমলে। নিগ্রোদের খুন করা, তাঁদের সম্পত্তি নষ্ট করাতেই এই দলের সদস্যদের আনন্দ।

—মিঃ চ্যাপেল তাহলে—

—অনেক নিগ্রো খুন করেছে।

—আশ্চর্য। দেখলে কিন্তু বুঝতে পারা যায় না।

—সাদা চামড়ার ওই গুণ। তাদের ছদ্মবেশ ধরার উপায় নেই।

ওরা কি চাইছে জানেন? ওরা চাইছে আমেরিকাকে নিগ্রো শূন্য করতে। শুনে রাখুন, সে ইচ্ছা ওদের কোনদিন পূর্ণ হবে না।

—আপনি কিভাবে বুঝলেন, ওয়াল্টার চ্যাপেল কুক্লান ক্লাক্স দলের সদস্য?

এমনও তো হতে পারে আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

—জো ব্রান্তকে আপনি ভাল করে চেনেন না মিঃ ব্যানার্জী। শুধু মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে সে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। সানজুয়ানে কতজন ওই দলের সদস্য আছে আমি তা ভাল ভাবেই জানি। আর এই জানার পিছনে আছে নিরেট প্রমাণ।

—ওখানকার গোলমালের জের এখানেও চলবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তো পোরটরিকোর কোন সম্পর্ক নেই।

—না থাক। তবু চলবে। জীবিকার সন্ধানে মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক নিগ্রো এখানে এসেছে—তাদেরও তো শেষ করা চাই। চ্যাপেল কিছুদিন থেকে চেষ্টা করছে, ফাঁকা জায়গায় রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে আমাকে পেতে।

—আপনি সতর্ক আছেন তো?

এবার ব্রান্ত জোরে হেসে উঠলেন।

—আমি নিশ্চয় সতর্ক আছি। তবে তাকেও বলবেন সতর্ক থাকতে। বললাম না, সুযোগ আমিও খুঁজছি। ব্যাপারটা কি জানেন, শান্তির দূত মার্টিন লুথার কিংকে যখন ওরা মেরে ফেলেছে তখন নিগ্রোদের আর শান্তির পথ ধরে হাঁটান যাবে না। তারাও চকচকে ছুরি আর গুলি-ভর্তি রিভলভার তুলে নিয়েছে। রক্তের বদলে রক্ত—নতুন কিছু নয়। এতো সার্বোক ব্যাপার।

একটু দ্বিধা করেই প্রশ্ন করলাম, আপনি কাউকে খুন করেছেন?

—কি মনে হয়?

—আপনার কাছ থেকেই জানতে চাইছি।

—কয়েক মাস আগে বোষ্টনে দাঙ্গা বেধে ছিল জানেন কি?

—আমি তখন এখানে ছিলাম না। সংবাদপত্রে নিশ্চয় পড়ে থাকব। এখন মনে পড়ছে না।

—দারুন গোলমাল হয়েছিল ওখানে। প্ররোচনা ছাড়াই সাদারা নিগ্রোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের নামতে হয়। বেশ কয়েকজনকে শেষ করেছি। আমাদের শরীরে আছে বন্য রক্ত। প্রশাসন, আর্মি, পুলিশ—যত সাহায্যই ওদের করুক না কেন, আপনারা দেখবেন শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ওরা পেরে উঠবে না।

কি বলব ভেবে পেলাম না।

ব্রাস্ত নিভন্ত সিগারে বার কয়েক ব্যর্থ টান দিয়ে আবার বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার মনোভাব ক্রমে কি রকম হয়ে উঠছে জানি না। তবু একটা জিনিষ দেখাবার লোভ সামলান কষ্টকর হয়ে উঠছে।

তিনি সিগার অ্যাসট্রের উপর নামিয়ে রেখে, কোটের ভেতরের পকেট থেকে ইঞ্চি আটেক লম্বা, চওড়া ব্লেডের ছুরি বার করলেন। ছুরির ভার বেশী নয় এক নজরেই বুঝতে পারা যায়। ব্লেডের দুপাশে রক্ত কালচে হয়ে শুকিয়ে রয়েছে।

—কি দেখছেন?

—এই ছুরি দিয়ে কি কাউকে—

—খুন করা হয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেকার ঘটনা। কালিফোর্নিয়ার নর্মান প্যাটিককে না মেরে থাকতে পারলাম না। লোকটা দাঙ্গা-হাঙ্গমার মধ্যে যেত না। চাকরীর লোভ দেখিয়ে নিগ্রোদের ডাকত তারপর শেষ করে দিত তাদের। আপনিই বলুন, এমন লোককে কি বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়?

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলাম না।

ব্রাস্ত সযত্নে রক্ত মাখা ছুরিটি আবার পকেটস্থ করলেন।

অ্যাসট্রের উপরকার সিগার ঠোঁটের ফাঁকে উঠে গেল। ধরিয়ে নিয়ে উনি ভ্রুকুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।

—কি ভাবছেন?

—ভাবছি এই হানাহানির শেষ কোথায়?

—অনেক সহ্য করার পর আজ আমরা বেপরোয়া, হানাহানি একটু বাড়বেই। তবে এই সঙ্গে আমরা এক অলিখিত নিয়ম মেনে চলেছি। এই নিয়মের ফলেই সাদা আমেরিকা একদিন কালো হয়ে যাবে—কালো হয়ে যাবে।

—জন্ম নিয়ন্ত্রণের ধার ধারবে না নিগ্রোরা। আবার তাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। এককালে সেখানকার জনসংখ্যার দশভাগ ছিল নিগ্রো, আজ শতকরা চুয়ান্ন ভাগ। বৃদ্ধির এই হার আমাদের উৎসাহিত করছে। প্রতিটি শহরে এই ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শেষে সাদাদের কালোর সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

—এতে তো অনেক সময় লাগবে?

—লাগবে বইকি। তাতে কিছু যায় আসে না। দু চারশো বছর অপেক্ষা করার মত ধৈর্য নিগ্রোদের আছে। কিন্তু বকে বকে গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল মিঃ ব্যানার্জী। আরেক প্রস্থ—

—নিশ্চয়। এখুনি আনাচ্ছি। কি খাবেন, জিন—রাম—

—বিয়ারই আনান।

বিছানার পাশে ফোন ছিল।

আমি ফোন করে নীচে নিজের প্রয়োজনের কথা জানালাম। ব্রাস্ত তখন দক্ষিণ দিকের জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এখান থেকে দেখলে সানজুয়ানকে ভারতীয় শহর বলে মনে হয়। চারিধারে প্রচুর গাছপালা। সবুজের মেলা বসেছে যেন।

পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আঙ্গুল তুলে বললেন, দূরে দেখছেন

ধোঁয়া উঠছে! আমাদের কারখানার চিমনি থেকে ওই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এত ভাল সিগারেট ক্যারাবিয়ানের আর কোন কোম্পানী তৈরি করতে পারে না।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আপনি কিন্তু সিগার ব্যবহার করেন।

—এক বন্ধু বাড়ীতে সিগার তৈরি করে—তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেই হয়।

—আচ্ছা, আপনাদের কোম্পানীটা কি স্প্যানিশ কনসার্ন।

—না। পিওর আমেরিকান। আমাদের ডায়রেক্টার জন বার্লো একজন চমৎকার মানুষ। কথাটা কি জানেন, সাদা চামড়ার প্রত্যেকেই যে খারাপ তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন, সংবেদনশীল মানুষের অভাব নেই।

বিয়ার এসে পড়ল।

আমরা আবার গেলাসে চুমুক দিলাম।

বললাম, আপনাদের নির্বাচন তো এসে গেল। রিপাব্লিক্যান না ডেমোক্র্যাট কোন দলকে সমর্থন করছেন?

—নিগ্রোরা ডেমোক্র্যাট দলকেই ভোট দেবে। জন কেনেডিকে আমরা জিতিয়েছিলাম, এবার রবার্ট কেনেডিকে আমরা জেতাব।

—বিপক্ষে তো রিচার্ড নিক্সান। তিনি লোক কেমন?

—তেমন সুবিধার নয় বলেই শুনেছি। কালোদের ভোট তিনি পাবেন না। আজ পর্যন্ত মাত্র একজন রিপাব্লিকানকে নিগ্রোরা মনে প্রাণে পছন্দ করেছে, তিনি হলেন অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। কিন্তু তাঁর সময় নিগ্রোদের তো আর ভোট দেবার অধিকার ছিল না!

আমরা বিয়ার আসার পর জানলার কাছ থেকে সরে এসে সোফায় আবার বসেছিলাম। কথা শেষ করে ব্রাণ্ড গেলাসের তলানিটুকু গলায় চালান করে উঠে দাঁড়ালেন।

—উঠলেন যে?

—আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি। এবার চলি।

—এখানে আমার সময়ের কোন দাম নেই মিঃ ব্রান্ত। আরো কিছুক্ষণ স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন।

—আজ আর নয়। কয়েক দিন আছেন তো—আবার আসবো। আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে চলি—

আমাকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে, মার্কিনী কায়দায় হাত নেড়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আমি অভিভূত হয়ে বসে রইলাম। বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাবার পরও সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হল না।

নানা কথা তোলপাড় করে চলেছে মনের মধ্যে। যে ছুরি দিয়ে এক সপ্তাহ আগে মানুষ মারা হয়েছে তাতে এখনও রক্ত লেগে রয়েছে কেন? তবে কি ছুরি থেকে কখনই রক্ত মুছে ফেলা হয় না! একটি করে খুনের সংখ্যা বাড়ে আর ছুরির ব্লেডে রক্তের প্রলেপ ঘন হতে থাকে? অজান্তে হয়তো কত হত্যার মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু জ্ঞানত এই প্রথম। আমেরিকার মানুষ ক্রমেই আমাকে বিস্ময়ের অতলান্তে নিয়ে যাচ্ছে। কত সহজ ভাবে সমস্ত কিছু বলে গেলেন জো ব্রান্ত!

পরের দিন বেলা এগারোটার সময় সাদামাটা চেহারার যে বাড়ীর মধ্যে আমি প্রবেশ করলাম—পোরটরিকোর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সদর কার্যালয় ওটাই। হৈ হাল্লা নেই, বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। রিসেপসনিষ্ট মহিলাটি মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকালেন।

তাঁকে জানালাম, লস অ্যানজেলস থেকে এসেছি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। মহিলা স্লিপ বাড়িয়ে দিলেন। নাম লিখে দিতেই সেই স্লিপ চলে গেল সেক্রেটারীর ঘরে। আমি ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিভাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে

কথা আরম্ভ করতে হবে, তা নিয়ে মনের মধ্যে গভীর অস্বস্তি বিরাজ করছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল।

বিরাট এক লম্বা চওড়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়াট টেবিলের ওধারে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, দেখলে কিন্তু মনে হয় না তাঁর শরীরে ভারতীয় রক্ত আছে। গায়ের রং ধপধপে সাদা। ছোট করে আমেরিকান কায়দায় চুল ছাঁটা। স্থূলাঙ্গ। মুখে বুদ্ধির দীপ্তি কিন্তু লক্ষ্যণীয়।

তিনিই প্রথমে কথা বললেন।

—সুপ্রভাত। বসুন। একজন ভারতীয়র সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হচ্ছে।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশী হলাম মিঃ সাপ্রু।

—নিশ্চয় কোন কাজে এসেছেন। কাজের কথা পরে হবে। আগে ভালভাবে আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়টা হয়ে যাক। ভারতের কোন প্রদেশের অধিবাসী আপনি?

—আমি বিহারের অধিবাসী। জাতিতে অবশ্য বাঙ্গালী। কাজ করি বম্বেতে।

নিজের নাম বললাম। কোথায় কাজ করি তাও বললাম। আমেরিকায় কি কারণে এসেছি সেকথা বলতেও ভুললাম না।

উনি বললেন, আমাদের আদি বাড়ী ছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে। ঠাকুর্দা ভাগ্যের সন্ধানে আমেরিকায় এসেছিলেন। ভাগ্য তাঁর সহায় হয়েছিল। আর ফিরে যান নি দেশে। বাবা কাজের সূত্রে পোরটরিকোয় আসেন। সেই থেকে আমরা এখানেই আছি।

—কিছু যদি মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।

—বলুন?

—আপনাকে দেখতে কিন্তু ঠিক ভারতীয়দের মত নয়।

—সে কথা সবাই বলবে। আসল কথা হল, আমার মা আমেরিকান মহিলা ছিলেন।

—ছিলেন মানে···

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে মিঃ সাপ্রু বললেন, আমার বাবা-মা দুজনেই কয়েক বছর হল মারা গেছেন। দেশে যাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। সামনের বছর বোধ হয় যাব।

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের এই প্রসঙ্গে কথাবার্তা হল। আমেরিকান রক্ত শরীরে প্রবেশ করলেও, ভদ্রলোক মনের দিক দিয়ে কেমন যেন ভারতীয় রয়ে গেছেন। আক্ষেপ করলেন, এই দেশে ভারতীয়দের মোটেই আনা-গোনা না থাকায়। আমাকে দেখে যেমন আশ্চর্য হয়েছেন, তেমনই হয়েছেন খুশী।

পোরটরিকোর সম্পর্কেও অনেক কথা বললেন।

সেই সমস্ত রাজনীতির কথা অর্ধেক আমি বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না। পোরটরিকোকে স্বাধীন দেশ বলে যতই প্রচার করা হোক না কেন, আসলে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি মুঠোর মধ্যে। হোয়াইট হাউস থেকে যে নির্দেশ আসবে : এখানকার প্রশাসনকে তাই মেনে চলতে হবে অক্ষরে অক্ষরে।

কফি এল।

আমি এবার কাজের কথা পাড়লাম।

মন দিয়ে সমস্ত কিছু শোনার পর মিঃ সাপ্রু বললেন, আপনাদের কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই অনুরোধ তো আগেই করা হয়েছে ?

—আপনার সম্মতি এখনও পাওয়া যায় নি।

—ওই জায়গাটির জন্য আপনাদের এত আগ্রহ কেন বুঝতে পাচ্ছি না। সানজুয়ানে ফ্যাকট্রি করার মত আরো জায়গা রয়েছে।

বললাম, ওই জায়গাটি সম্পর্কে কোম্পানীর এত আগ্রহ কেন বলতে পারব না। আপনি এটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি এই সমস্ত কাজ করার জন্য আমেরিকায় আসি নি। তবু আমাকে এখানে

পাঠানো হয়েছে। কোম্পানীর ধারণা আমি ভারতীয় বলেই আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন।

মিঃ সাপ্রু পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

—আপনি আমার জায়গায় থাকলে কি করতেন?

—কঠিন প্রশ্ন। ভেতরের ব্যাপার তো কিছুই জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, সম্ভব হলে অনুরোধ রাখতাম।

—অনুরোধ রাখলে আপনার ব্যক্তিগত কোন লাভ হবে?

সচকিত হলাম।

—আমার লাভ?

—হ্যাঁ। আপনার?

—একেবারেই যে হবে না তা বলা যায় না। কাজটা আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারলে ডায়রেক্টাররা অবশ্যই খুশী হবেন। দেশে ফেরার পর হয়তো আমার বিরাট পদোন্নতি ঘটবে।

—আপনার উন্নতি যদি ঘটে তবে আমি রাজী হতে পারি। আপনার সমৃদ্ধি বাড়ুক এই আমি চাই।

আমি এই মানুষটির সহৃদয়তায় কেমন যেন হয়ে গেলাম।

বললাম কোন রকমে, কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না। আপনি যে বিষয়টিকে—

আমাকে থামিয়ে সাপ্রু বললেন, ধন্যবাদের কথা নয়। দূরে থাকি বলে সুযোগ পেয়েও দেশের মানুষের জন্য কিছু করব না তাকি হয়? আপনার সঙ্গে আর কেউ এসেছেন নাকি?

—উৎপাদন বিভাগের বড়কর্তা এসেছেন।

—কাগজপত্র নিয়ে তাঁকে আসতে বলবেন কাল এই সময়। ভাল কথা, আজ বিকেলে আসুন না আমার অ্যাপার্টমেন্টে। আমাব স্ত্রী খুবই খুশী হবেন। তাঁর আবার রান্নার হাত চমৎকার।

নিশ্চয় আসব।

—এটা রাখুন। ঠিকানা লেখা আছে।

মিঃ সাপ্রু কার্ড বাড়িয়ে ধরলেন।
আমি কার্ড পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালাম।
—অনেক সময় নষ্ট আপনার করেছি। এখন চলি।
—বিকেলে আমাদের দেখা হবে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মিঃ সাপ্রুর অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে হোটেলে ফিরলাম। গিয়েছিলাম পাঁচটার সময়। এতক্ষণ জমিয়ে গল্পগুজব হয়েছে। মিসেস সাপ্রু চমৎকার মহিলা। বছর দশেক আগে ম্যাসাচুসেটসে দুজনের পরিচয় হয়। তারপর পরিণয়।

ছেলে মেয়ে হয় নি। স্বামা ঠিকই বলেছিলেন, তাঁর আমেরিকান স্ত্রীর রান্নায় হাত ভাল। প্রচুর খাইয়েছেন। রাত্রে আর ডিনারে বসার কোন প্রশ্ন ওঠে না। নিজেকে কিছুটা ক্লান্ত লাগছিল। ঘরে প্রবেশ করেই সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

কারখানা করার জন্য নির্দিষ্ট জমি যে পাওয়া যাচ্ছে, সে কথা দুপুরেই জানিয়েছি মিঃ গ্র্যাণ্টকে। তিনি দারুণ খুশী হয়েছেন। বারবার আমার পিঠ চাপড়ে সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার করে ডায়রেক্টারদের এই সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আগামীকাল গ্র্যাণ্ট মিঃ সাপ্রুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

মিনিট দশেক পরে আমি স্যুট ছেড়ে স্লিপিং ড্রেস পরে ফেললাম। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে আবার এসে বসলাম সোফায়। আমার হাতে তখন শ'চারেক পাতার একখানা বই। ক্যারাবিয়ান অঞ্চলের ইতিহাস। দুপুরে যখন হোটেলে ফিরে আসি তখন ম্যানেজার এই বইখানি আমায় পড়তে দিয়েছিলেন।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বই-এ মন দিলাম।

ইতিহাস হাতে পেলে আমি আর কিছু চাই না।

সময় নিজের তালে এগিয়ে চলেছে। কতক্ষণ যে পড়েছি খেয়াল

নেই, এক সময় হঠাৎ একাগ্রতায় ছেদ পড়ল। বই মুড়ে রেখে রিষ্টওয়াচের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। এগারোটা পনেরো। সময় কোন দিক দিয়ে কেটে গেছে বুঝতেই পারি নি।

এবার শুয়ে পড়া যেতে পারে।

সবে ড্রেসিং গাউন খুলতে যাচ্ছি, দরজায় মৃদু করাঘাত হল। কে আবার এল এই সময়? বিরক্তবোধ মনের উপর চাপ সৃষ্টি করল। অনিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই অবাক হয়ে দেখলাম বাইরে হিল্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে। একপাশে সরে আসতেই সে ভেতরে প্রবেশ করল।

এখন তার সাজ-পোশাকে তেমন পারিপাট্য নেই। বিছানায় আশ্রয় নেবার আগের মুহূর্তের অবস্থা। স্বচ্ছ নৈশ পোশাক ভেদ করে দেহের অনেক খাঁজ চোখে পড়ছে। ঠোঁটের রং অনেকটা ফিকে। মুখে কিন্তু সেই মনমাতানো হাসি ঠিকই রয়েছে।

হিল্ডা বসে পড়ে বলল, সিগারেট দিন।

প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে বলল, ভীষণ একঘেয়ে লাগছে এখানে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম এল না। অগত্যা অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চলে এলাম।

—ভালই হল। একটা কথা বলবার ছিল। অবশ্য আপনার স্বার্থেই বলা। এই বেলা সে কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

—বলুন?

—আমি মিঃ চ্যাপেল সম্পর্কে—

—চ্যাপ ইনিয়ে বিনিয়ে আপনাকে অনেক কথা বলেছে বুঝি?

আমি গলা ঝেড়ে নিয়ে বললাম, আপনি তাঁকে দারুণ প্রশ্রয় দিয়েছেন। আবার ভীষণ নিরাশ করে তুলছেন। তাঁর পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

—ক্ষুব্ধ!

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল হিল্ডা।

—কেউ যদি বোকার মত মনবিকারে ভোগে তার জন্য আমি কি করতে পারি বলুন ?

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, মনবিকার—

—তাছাড়া আর কিছু নয়। হামবুর্গার খেয়েছেন তো ? চমৎকার খাবার। কিন্তু প্রতিদিন দুবেলা যদি হামবুর্গার খেতে থাকেন, অরুচি ধরতে বাধ্য। এখানেও ঠিক ওই অবস্থা। চ্যাপের প্রতি আমার আর কোন রুচি নেই।

—ভদ্রলোক আপনাকে বিয়ে করতে চান। আপনি কি সুন্দর, সুখী ভবিষ্যত জীবন চান না ?

—আমি তো এখন কম সুখী নই।

—নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে দেখেন নি বলে এ কথা বলছেন। আপনি যাকে সুখ বলে ভাবছেন এখন, আগামী দিনে তার দাম কিন্তু কিছুই নয়।

হিল্ডা সেন্টার পিসের উপর একটা পা তুলে দিল। তার বসার ভঙ্গী এখন মোটেই শোভন নয়। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

—স্বীকার করছি, আপনি আমায় কিছু নতুন কথা শোনালেন। তবু বলব, চ্যাপকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

—কেন জানতে পারি কি ?

—কারণ···

—কারণ বোধ হয় মিঃ গ্র্যান্ট ?

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল হিল্ডা।

তারপরই হেসে ফেলল।

—আপনি আমাদের সমুদ্রের ধারে দেখেছেন তাহলে। যা ভাবছেন তা কিন্তু নয়। বুড়োর রস হঠাৎ উথলে উঠল। হাজার হোক তিনি আমার উপরওয়ালা। অনিচ্ছা থাকলেও তাঁকে অখুশী

করতে পারি না। এখনও গা ঘিন ঘিন করছে। কাল সারাটা রাত বেজন্মা বুড়ো আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না করল।

আমি বোবা হয়ে গেলাম।

কত সহজে এরা এই সমস্ত কথা বলতে পারে!

নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে।

শেষে—

—কি ভাবছেন?

—আপনার কথাই। কিন্তু আর নয়। আপনি এবার শুতে যান। রাত বেড়ে চলেছে।

—আমি এখুনি চলে যাব বলে আসিনি। কি বলছিলেন, আমার কথা ভাবছেন? তবে যতটা সস্তা ভাবছেন, আমি কিন্তু ততটা সস্তা নই। আমার যাকে পছন্দ হয়েছে, শুধু তাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। একমাত্র ভেল্কিবাজ মিঃ গ্র্যাণ্ট ছাড়া।

—আজ পর্যন্ত কতজনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

অনিচ্ছার সঙ্গেও প্রশ্নটা করে ফেললাম।

একটুও ইতস্তত না করে হিল্ডা বলল, গুনে রাখিনি। তবে কুড়ি জনের কম বলো। চ্যাপ তাদেরই মধ্যে একজন। কারুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থেকেছে দশদিন আবার কারুর সঙ্গে দুবছর। সবটাই নির্ভর করেছে, যাকে যত দিন ভাল লাগবে তার উপর।

এই ধরনের মেয়েকে কি বলা হবে? যারা অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রী করে তারা বারবণিতা। যারা ভদ্রপাড়ায় থেকেও গোপনে দেহের ব্যবসা চালায় তারা কলকাতার ভাষায় হাফ গেরস্ত। কিন্তু এরা? হিল্ডার মত মেয়েরা—যারা অর্থের জন্য নয়, শুধু মাত্র ভাল লাগার দোহাই দিয়ে একের পর এক পুরুষের কাছে দেহ পেতে দিচ্ছে—তাদের কি বলা হবে?

এমন মেয়ে আমেরিকায় কত আছে কে জানে?

আমি উঠে পড়লাম।

—উঠলেন যে?

—আমার এবার ঘুম পাচ্ছে।

—আমার পাচ্ছে না।

হিল্ডা আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

—এখনও বুঝতে পারেন নি আজ রাত্রে আমি আপনাকে ঘুমতে দেব না।

—ঘুমতে দেবেন না?

—না। আপনার সারল্য আমাকে অবাক করছে কিন্তু।

হিল্ডা নিজের নাইটির কোমর বন্ধনীর ফাঁস দ্রুত খুলে ফেলল। আমি শঙ্কিত হলাম।

—একি করছেন !!!

—ডিয়ার ব্যানার্জী, বোঝার চেষ্টা কব—আমি তোমাকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছি।

—কিন্তু…আপনি…

—তুমি যেন খুব ঘাবড়ে গেছো ডার্লিং?

—ঘাবড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনি তো জানেন আমি বিবাহিত পুরুষ—

বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে উঠল হিল্ডা।

—কয়েক হাজার মাইল দূরে যে মহিলা রয়েছেন, তাঁর উত্তাপ কি তুমি এখান থেকে অনুভব করতে পারছো? ছেলেমানুষ—পুওর ডার্লিং ছেলে মানুষী তোমার সাজে না।

ও ঝটিতে নিজের গা থেকে নাইটি খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। প্রগাঢ় যৌবনা নারী উলঙ্গ অবস্থায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব অঙ্গসৌষ্টভ। যে কোন পুরুষের লালসাকে দাউ দাউ করে তোলার পক্ষে আর কিছু প্রয়োজন নেই বোধ হয়।

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

—ভাল করে তাকিয়ে দেখ। তোমাকে খুশী করার মত সমস্ত কিছুই কি আমার মধ্যে নেই?

আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। এরকম পরিস্থিতিতে যে পড়তে হবে আগে কি জানতাম? অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্বাস করা শক্ত এমন বেপরোয়া, এমন কামপ্রবণা কেউ হতে পারে।

হিল্ডা আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার সুডৌল দুই বাহু আমার গলা বেষ্টন করেছে। ঘন ঘন তার ঠোঁট নেমে আসছে আমার মুখের এখানে ওখানে। আমার প্রতিটি শিরায় উষ্ণ রক্ত চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি আর মনে জোর খুঁজে পাচ্ছি না। কোন পুরুষের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে দৃঢ় রাখা সম্ভব নয়।

কিন্তু লেখা—

যাকে আমি বিয়ে করেছি। যে এখন বহু—বহুদূরে আমার বাচ্চা পাপ্পুকে হয়তো স্নান করিয়ে দিচ্ছে, তার প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছি নাকি? হিল্ডার উন্মত্ততা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ও চেষ্টা করছে আমাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যাবার জন্য।

একটি রাত বিভোর হয়ে যাবার জন্য উন্মুখ।

ঠিক এই সময়—

চাপা অথচ তীক্ষ্ণ আর্তরব ভেসে এল। তারপর গুরুভার কিছু পতনের শব্দ—এই সঙ্গে মিলিয়ে গেল দ্রুত কার পায়ের আওয়াজ। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে আমার ঘরের সামনেকার করিডরে। হিল্ডাও সচকিত হয়েছিল। সরে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। এক মুহূর্তের জন্য দুজনের বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপরই আমি দৌড়ে দরজার দিকে এগুলাম। করিডরে পা দিতেই এক অভাবনীয় দৃশ্যর মুখোমুখি হতে হল। জো ব্রাস্ত আধ শোওয়া অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্ত ভিজিয়ে চলেছে ফ্লোর।

শক্তিমান পুরুষ। অচিরেই নিজের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি। পারলেন না, পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরলাম। ঘোলাটে চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। কি যেন বললেন বিড় বিড় করে।

ব্রাস্তকে কেউ গুলি করে পালিয়েছে। কিন্তু এই সময় তিনি হোটেলে এসেছিলেন কেন? আমি অসহায় বোধ করতে লাগলাম। এঁর চিকিৎসার আশু প্রয়োজন। কেউ কোথাও নেই। করিডর সম্পূর্ণ ফাঁকা। এই সময় ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁরা নিদ্রিত। আততায়ী সাইলেন্সার লাগান রিভলভার দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল বলে কারুর ঘুম ভাঙ্গেনি।

ওই রঙ্গীন অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে না পড়লে আমিও এতক্ষণ গভীর ঘুমে অচেতন থাকতাম। ভাগ্যক্রমে একজন ওয়েটারকে এই দিকেই আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি এসেই সে থমকে দাঁড়াল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা দূরের কথা, সে এক সেকেণ্ড আর অপেক্ষা করল না। ভয়ে নীল হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্রাস্ত আরো কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছেন।

ক্ষীণ গলায় বললেন, আমাকে ধরুন। এবার দাঁড়াতে পারব।

আমার সাহায্যে টলমল করতে করতে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালেন। বাঁ হাত বেয়ে রক্ত পড়ছে ঝুঁজিয়ে। কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। গুলি তাহলে বুকে বা পিঠে আঘাত করেনি। ব্রাস্ত আমাকে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর বিশাল শরীর সামলে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল।

আমরা ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম।

করিডরের বাঁকে যখন পৌঁছেছি, তখন দেখি ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। ওয়েটার তাঁকে নিশ্চয় খবর দিয়ে থাকবে।

আমাদের হাত কয়েক দূরে এসে তিনি থামলেন। চোখ বড় বড় করে জো ব্রাস্তর রক্ত-রঞ্জিত বুস কোটের দিকে তাকালেন। শিউরে উঠলেন তারপরই।

—অ্যাঁ···এ সমস্ত কি···আপনারা···

আমি তাঁকে থামিয়ে দিলাম।

—এই ভদ্রলোককে কেউ গুলি করে পালিয়ে গেছে। এঁর চিকিৎসার দরকার। হোটেলে ডাক্তার আছেন?

—না, নেই। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এ সমস্তর মধ্যে আমি থাকতে চাই না। এখুনি পুলিশকে জানান দরকার।

—এখনও ব্যাপারটা কেউ জানতে পারেনি। পুলিশকে ডাকলে কিন্তু আপনিও কম ঝামেলায় পড়বেন না। হোটেলের দুর্নাম হবে। এখানে কেউ উঠতে চাইবে না।

ম্যানেজার থতিয়ে গেলেন।

আমার বক্তব্যের গুরুত্ব ধরতে পারলেন বোধ হয়।

শেষে বললেন কোন রকমে, এমন রক্তারক্তি কাণ্ড···

—পরিস্থিতি অন্য ভাবে সামলাতে হবে। আপনি এখুনি কোন পরিচিত ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। নয়তো—

আমাকে বাধা দিয়ে ব্রাস্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। ট্যাক্সিতে চড়িয়ে দিলে আমি জায়গা মত চলে যেতে পারব।

আর বলতে হল না। ম্যানেজার অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। এই পাপ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেল থেকে বিদায় করতে পারলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। জেট প্লেনের মত তিনি উড়ে বেরিয়ে গেলেন কোথায়।

ফিরে এলেন প্রায় পরমুহূর্তে। সঙ্গে দুজন যণ্ডামার্কা অনুচর। তারা ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র অবলীলাক্রমে ব্রাস্তকে তুলে নিয়ে লিফটের দিকে ছুটল। কারুর চোখ বাঁচাবার দরকার ছিল না। বোর্ডাররা

কেঁউ কোথাও নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা গেটের কাছে পৌঁছালাম। সেখানে সত্যিই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল।

দীর্ঘকায় নিগ্রো ড্রাইভার গাড়ী ঠেসান দিয়ে সিগারেট টানছিল। জো ব্রাস্তকে ওই ভাবে আনতে দেখে সে লাফ মেরে এগিয়ে এল। অসংলগ্ন শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

বললাম, এখুনি আমাদের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

ব্রাস্তকে ট্যাক্সির পিছনের সিটে কোন রকমে শুইয়ে দেওয়া হল। এই টানা হেঁচড়া আর রক্তপাতের দরুণ তাঁর শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তিনি আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন। বলা বাহুল্য ম্যানেজার আর তাঁর দুই অনুচর এক মিনিট সময় নষ্ট না করে অদৃশ্য হয়েছে। আমি সামনের দিকে গিয়ে বসলাম।

ড্রাইভার বলল, আপনার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি ঠিক ওঁকে জায়গা মত নিয়ে যেতে পারব।

—আমি ওঁকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। সময় নষ্ট করো না। গাড়ীতে স্টার্ট নাও!

—আমি তো সঙ্গে রয়েছি। আমার পক্ষে—

—কথা বাড়িও না। আমি সঙ্গে যাব।

ড্রাইভার একটু দ্বিধা করল, তারপর স্টার্ট নিল গাড়ীতে। ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে আমরা সত্তর মাইল স্পিডে ছুটে চললাম। এখনও কিছুই জানি না, অথচ এই রক্তারক্তি কাণ্ডর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। অবশ্য সরে পড়বার অবকাশ ছিল—পারলাম না। মনুষ্যত্ব বোধ আছে বলেই পারলাম না।

কয়েকটি প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে।

ব্রাস্ত ওই সময় হোটেলে গিয়েছিলেন কেন? আমার সঙ্গে দেখা করাই কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? কি এমন প্রয়োজন ছিল যার জন্য এত রাত্রে তাঁকে যেতে হয়েছিল? আততায়ী নিশ্চয় তাঁর পরিচিত ব্যক্তি। সে কি অনুসরণ করে হোটেলে এসেছিল?

আমি ঘাড় ফেরালাম। ড্যাসবোর্ডের আলোয় ড্রাইভারের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তার ভাবভঙ্গী কেমন ট্যাক্সি চালকের মত নয়। কোথায় একটা বড় রকমের ফাঁক আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই গোয়েন্দা উপন্যাসের মত দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, তুমি আহত ভদ্রলোককে চেন ?

—হ্যাঁ।

—এত রাত্রে তিনি হোটেলে কেন গিয়েছিলেন বলতে পার ?

—তিনি একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এক বাক্স ভাল তামাক তাঁর হাত দিয়ে মাকে পাঠাতেন।

—ওঁর মা কি—

—লস অ্যানজেলসে থাকেন।

—কাল সকালেও তো দিয়ে আসতে পারতেন ?

—উপায় ছিল না। সকালে তাঁর জামাইকা যাবার কথা ছিল।

—আমরা এখন কোথায় চলেছি ?

—আপনি তো জানেন। ডাক্তারের কাছে।

—ডাক্তার কি……

—আর প্রশ্ন করবেন না। আমরা অপরিচিত কাউকে বেশী প্রশ্নের উত্তর দিই না।

অবাক হলেও আর কিছু বললাম না।

আমি সামনের কাচের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত করলাম। যতদূর দেখা যায় সম্পূর্ণ ফাঁকা। শুধু দূরে দূরে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে নিয়ন আলোর ষ্ট্যাণ্ডগুলি। দিনের বেলা অন্য দৃশ্য। দেখেছি, সানজুয়ানের পথে ওই সময় কি ভীড় আর কি ব্যস্ততা !

ট্যাক্সি এবার মোড় খেয়ে ছোট একটা রাস্তায় ঢুকল। কিছু দূর এগিয়ে আবার মোড় নিয়ে খানিক এগিয়ে থেমে গেল। হোটেল

থেকে যাত্রা করার পর কুড়ি মিনিট সময় কেটে গেছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম, একতলা একটি বাড়ীর সামনে এসে থেমেছি।

ড্রাইভার আমাকে কিছু না বলেই ট্যাক্সি থেকে নেমে দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। আমিও নেমে পড়লাম। এই সময় খেয়াল হল, আমার গায়ে বাইরে বেরুবার মত পোশাক নেই। ড্রেসিং গাউন পরেই চলে এসেছি।

পিছন দিকে উঁকি মেরে দেখলাম, ব্রান্ত একইভাবে পড়ে আছেন। বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন বুঝতে পারার উপায় নেই। একজন প্রকৃতই ভালো লোক এইভাবে যদি মারা গিয়ে থাকেন তবে পরিতাপের বিষয় হবে। আমি গাড়ীর কাছ থেকে কয়েক পা সরে এসে তাকাতে লাগলাম এধার ওধার। এটা কি কোন ডাক্তারের বাড়ী না ব্রান্তর বাসস্থান।

স্ট্রেচার নিয়ে এই সময় দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন সামনেকার বারান্দায়। তাঁকে বিশেষ চিন্তিত দেখাচ্ছে। তিনজনই কিন্তু নিগ্রো। স্ট্রেচারবাহকরা অত্যন্ত সতর্কভাব সঙ্গে ব্রান্তকে বয়ে নিয়ে গেল ভেতরে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাদের অনুসরণ করেছিলেন—দরজা পর্যন্ত পৌঁছে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আপনি আসুন—।

তাঁকে অনুসরণ করে আমি ভেতরে গেলাম।

ঘরটি মোটামুটি ভাবে সাজান। তবে ড্রইংরুম একে বলা চলে না। উপবেশন কক্ষ বলাই ঠিক। ভদ্রলোক ইসারা করে আমায় বসতে বললেন। ব্রান্তকে অবশ্য তখন অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—আপনি কোথায় এসেছেন জানেন ?

গলার আওয়াজ যে এত ভারী হতে পারে জানতাম না।

চমকে উঠেছিলাম।

—আহত মিঃ ব্রান্তকে চিকিৎসা করার জন্য এখানে আনা হয়েছে, এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানি না।

— আপনিই বোধহয় সেই ভারতীয় ভদ্রলোক যাঁর সঙ্গে জো'র পরিচয় হয়েছে? বর্তমানে বোধহয় গোল্ডেন ডোর হোটেলের দুশো সাতচল্লিশ নম্বর ঘরের অধিবাসী?

—আপনার অনুমান যথার্থ। আমারই ঘরের সামনে মিঃ ব্রান্ত আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। আক্রমণকারীকে আমি দেখতে পাইনি।

—আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন। পুলিশী হাঙ্গামায় না জড়িয়ে, জো-কে এখানে নিয়ে আসার ব্যাপারে যে সহযোগিতা করেছেন সে জন্য অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ।

আমি বললাম, আপনার পরিচয়—

—নিশ্চয়। আমি হার্লি শেফার্ড। ব্ল্যাক পান্থার দলের সানজুয়ান শাখার সভাপতি।

ব্ল্যাক পান্থার !!!

এমন কোন দলের নাম আগে শুনিনি। দলের নাম বিশেষ তাৎপর্যময় মনে হয়, উগ্রপন্থী নিগ্রোদের কোন সংস্থা হবে। অবশ্য এ সম্পর্কে বেশী কিছু জানার অবকাশ আমি তখনই পেলাম না। একজন এসে হার্লি শেফার্ডকে ডেকে নিয়ে গেল।

বসে আছি।

সময় দ্রুত গড়িয়ে চলেছে। আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছি। একটু ভয় ভয় যে না করছিল তা নয়। মনের গতি অন্য খাতে বইয়ে দেবার জন্য সিগারেট ধরালাম। হিল্ডার কথা মনে পড়ে গেল। বহুক্ষণ আগেই নিশ্চয় সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে। সব দিক দিয়ে সফল এমন একটি যুবতী কি অদ্ভুতভাবে জীবন নির্বাহ করে চলেছে!

আরো এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হল।

অস্থিরতা চেপে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যে হোটেলের পথ ধরব তার উপায় নেই। এত রাত্রে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। হেঁটে যাবারও উপায় নেই, পথ-ঘাটের কিছুই জানি না। অবশ্য এই সময় দীর্ঘ প্রতীক্ষার উপর যবনিকা পড়ে গেল। হার্লি শেফার্ড দেখা দিলেন।

হাসি হাসি মুখ তাঁর।

বললেন, আর ভয়ের কারণ নেই। জো বিপদ এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

—গুলি বার করা হয়েছে?

—দরকার পড়েনি। ক্ষত গভীর নয়। চামড়া কেটে বুলেট বেরিয়ে যাওয়ায় বড় রকম বিপদ ঘটেনি আর কি।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

হার্লি আবার বললেন, আপনি অনেকক্ষণ একা বসে রয়েছেন সে জন্য আমরা দুঃখিত। আসুন আমার সঙ্গে।

আমি তাঁর পিছু পিছু পাশের ঘরে গেলাম। তারপর আরো কয়েকটি ঘর অতিক্রম করে যেখানে পৌঁছালাম, সেখানে শায়িত অবস্থায় জো ব্রান্তকে দেখা গেল। খালি গায়ে, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তিনি শীর্ণ হাসলেন। আমি খাটের পাশে রাখা চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

—কেমন বোধ করছেন?

—এখন ভালই। মৃত্যু একচুলের জন্য পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। তবে আমার জন্য আপনার কম দুর্ভোগ হল না মিঃ ব্যানার্জী। রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছি।

—না না তেমন কিছু নয়।

—পুলিশী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে দারুণ বিশ্রী ব্যাপার হত। আপনার তৎপরতায় ওই বিপদ এড়িয়ে যেতে পেরেছি। সানজুয়ানের প্রতিটি ব্ল্যাক প্যান্থার আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

জো ব্রাত্ত একটু থেমে বললেন, আমাকে সিগারেট খাওয়াতে পারেন ?

—ডাক্তারের অনুমতি পেয়েছেন ?

—ধূমপানে বাধা নেই।

কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে আটকে দিলাম। একটা হাত সচল আছে কাজেই সিগারেট ধরতে তাঁর অসুবিধা নেই। লাইটার জ্বেলে এগিয়ে ধরতেই তিনি দীর্ঘ টান দিলেন। তৃপ্তির ছায়া সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছিল বলুন তো ?

—আসল ব্যাপারটা কি জানেন, এত অসতর্ক অবস্থায় ওই সময় আমার হোটেলে যাওয়া ঠিক হয়নি। কাল সকালে জামাইকার কিংষ্টনে যাওয়ার কথা ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। দিন সাতেকের আগে ফিরতে পারব না। ভাবলাম, অসময় হলেও আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি আর মা'র জন্য কিছু মিক্সচার পাঠিয়ে দেব আপনার হাত দিয়ে।

জো ব্রাত্ত ঘন ঘন কয়েকবার সিগাঁরেটে টান দিয়ে পরম তৃপ্তিতে ধোঁয়া ছাড়লেন। আমি তাঁর ঘন কালো মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত বড় দুর্ঘটনার পরও তিনি কত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে কথা বলছেন।

—আমি আপনার ঘরের দরজার কাছাকাছি পৌঁছেছি—দেখলাম, ওয়াল্টার·চ্যাপেল মাত্র হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে।

ওয়াল্টার চ্যাপেল !!!

—আপনি ঠিক দেখেছেন ?

—ভুল দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্রাউজারের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু চ্যাপেল প্রস্তুত হয়েই ছিল—রিভলভার বার করার অবকাশ পেলাম না, তার আগেই দুটো গুলি আমার কনুইয়ের কিছু উপরের চামড়া কেটে বেরিয়ে গেল।

—কি সাংঘাতিকি। হঠাৎ—

—হঠাৎ নয় মিঃ ব্যানার্জী। সুযোগ খুঁজছিল লোকটা। ভাগ্যক্রমে যখন বেঁচে গেছি তখন ওর আর রেহাই নেই। জো ব্রান্তর রক্তপাত ঘটানর দায়িত্ব যে কত মর্মান্তিক তা উপলব্ধি করতে হবে।

—আপনি কি—

—চ্যাপেলকে আমি মেরে ফেলব।

সিগারেটের টুকরোটা খাটের পাশে রাখা টুলের উপরকার অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে তিনি সহজ গলাতেই বললেন আবার, ট্রিগারের উপর আঙ্গুলের চাপ পড়ার পর আমার গুলি কখন ব্যর্থ হয় না। বেশী সময়ও আম নেবো না। ঘা শুকিয়ে গেলেই—

—কিন্তু মিঃ ব্রান্ত—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার ছাড়পত্রে চ্যাপেল নিজেই সই করেছেন। আমার সুস্থ হয়ে ওঠার এক সপ্তাহের মধ্যেই সানজুয়ান পুলিশ ওর মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে খুঁজে পাবে।

এবার কি বলব ভেবে পেলাম না।

মিনিট কয়েক ধরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

—কি ভাবছেন?

—ভাবছি এইভাবেই কি চলতে থাকবে?

—হ্যাঁ। রক্তের বদলে রক্ত। আপনাকে তো আগেও বলেছি, এই পথে চলতে ওরাই আমাদের শিখিয়েছে। কিন্তু আর কথা নয়, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত বোধ করছেন! এবার আপনাকে হোটেলে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

— যাবার আগে একটা আগ্রহ মিটিয়ে নিতে চাই।

—কি বলুন তো?

—আপনি ব্ল্যাক পান্থার দলের সদস্য অনুমান করছি। ওই দলের কাজটা কি ?

নির্বিকার ভঙ্গীতে ব্রাস্ত বললেন, সাদা আমেরিকানদের খুন করার জন্য দেশের দিকে দিকে এই উগ্রপন্থী নিগ্রো-সংস্থার শাখা স্থাপিত হচ্ছে। ওদের নিগ্রো মারার দল তো লিঙ্কনের আমল থেকেই রয়েছে।

—চলি। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্য কিছুটা চিন্তা রয়েই যাচ্ছে।

—ভাববেন না। আমি তাড়াতাড়িই চাঙ্গা হয়ে উঠবো। আমাদের এই কিন্তু শেষ সাক্ষাৎ নয়। লস অ্যানজেলসে গেলেই আপনার অ্যাপার্টমেণ্টে উপস্থিত হব।

—নিশ্চয়। আমি খুশী হব।

কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালাম।

—ভাল কথা, সেই মিক্সচারের প্যাকেটটা কই ? লস অ্যানজেলসে পৌঁছে আপনার মাকে দিয়ে আসতাম।

—গুলি খাবার পর আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। আপনার ঘরের সামনেই কোথাও পড়ে আছে।

আমি জো ব্রাস্তর হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। হার্লি শেফার্ডকে দেখতে পেলাম না। একজন তরুণ নিগ্রো আমাকে বাইরে নিয়ে গেল। সেই ট্যাক্সি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে।

আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম।

আগে থেকে নির্দেশ দেওয়া ছিল নিশ্চয়। কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গাড়ী রাস্তায় এসে নামল। আমি চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে যেতে লাগলাম। ডিনারের পর থেকে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে নিঃসন্দেহে আমার জীবনে তা অভূতপূর্ব।

ওই অসময়ে মিঃ চ্যাপেলের হোটেলে উপস্থিতি কম বিস্ময়কর নয়। তিনি কি ভাবে জানলেন, ব্রাস্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে

আসছেন? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা আমাকে সচকিত করে তুলল। চ্যাপেল হয় তো হিল্ডার মন ভেজাতে ওই সময় হোটেলে এসেছিলেন—তারপরই নাটকীয়ভাবে ব্রাস্তুর সঙ্গে তাঁর দেখা।

তাই সম্ভব।

ট্যাক্সি দ্রুত ছুটে চলেছে। ড্রাইভারের মুখের একাংশ আমি দেখতে পাচ্ছি। কথা আরম্ভ করলে তা চালিয়ে যাবার আগ্রহ ওর আছে বলে মনে হয় না। আমি সিগারেট ধরাতে গেলাম—হাওয়ার ঝাপটায় সফল হলাম না।

ট্যাক্সি হোটেল কম্পাউণ্ডে যখন প্রবেশ করল, আমার রিষ্ট ওয়াচে তখন সাড়ে তিনটে। রাতের আয়ু আর বেশী নেই। না থাক, বিছানায় গা ঢেলে দেব গিয়ে—ঘুম থেকে উঠব অনেক বেলায়। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম ট্যাক্সি থেকে।

লাউঞ্জের সামনেকার প্রধান পথ স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ ছিল। আমি ছোট একটা প্যাসেজ দিয়ে প্রবেশ করলাম। কয়েকজন কর্মচারী নিদ্রালু ভঙ্গীতে বসে আছে। এদের থাকতেই হয়, কখন কি প্রয়োজন এসে পড়ে বলা তো যায় না।

আমায় কেউ কিছু বলল না।

এবার আমি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগুলাম। এই সময়ে লিফ্‌ট সচল থাকতে পারে না। বেশ ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে। মন্থর গতিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে এলাম। নিজের ঘরের সামনে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই সিগারেট ছোট হয়ে এসেছে। টুকুরোটা পায়ের তলায় মাড়িয়ে নিয়ে তাকালাম এধার ওধার।

রক্তের ছিটে ফোঁটাও কোথাও নেই। দামী মোজাইক করা মেঝে ঝকঝক করছে। বুঝলাম, আমি ব্রাস্তুকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবার পরই ম্যানেজার দ্রুত দুর্ঘটনার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করে দিয়েছেন। পাকা ব্যবসাদারের মত কাজ।

কিন্তু মিষ্টচারের প্যাকেটটা কোথায় গেল?

খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। হয়তো ম্যানেজার দেখতে পেয়ে তুলে রেখেছেন। পরে তাঁর কাছে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। ক্লান্তি যেন ক্রমেই চেপে বসছে। দরজার নব ঘোরালাম। পাল্লা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করার মুখেই আমার গতি রুদ্ধ হল।

একি !!!

এরকম যে হতে পারে আমি কল্পনাই করিনি। আমারই বিছানায় বিবসনা হিল্ডা ঘুমের কোলে ঢলে রয়েছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে। চিন্তা ঘোরাল হয়ে উঠছে মনের আনাচে কানাচে। বাকী রাতটুকু তো এই ভাবে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।

এখন আমি কি করব ?

দুর্বার প্রলোভন আমাকে প্রবলভাবে হাতছানি দিচ্ছে।

শাসনের বাঁধন নিজেকে আর কতক্ষণ বেঁধে রাখতে পারব ?

লস অ্যানজেলসে ফিরে লেখার চিঠি পেলাম। চিঠিখানা অবশ্য দিন দুয়েক আগেই এসেছে। আমি সানজুয়ান থেকে ফিরেছি আজই সকালে। ওখানে ফ্যাক্টরী বসাবার অনুমতি পাওয়া গেছে। দেশে ফেরার পর কোম্পানী যে আমাকে বড় রকম প্রমোশন দেবেন তাতে আর সন্দেহ কি ? লেখা বাড়ীর কথা, অন্যান্য আরো নানা সংবাদ খুঁটিয়ে লিখেছে। আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তাও চেপে রাখতে পারেনি। আমি নিজের শরীর সম্পর্কে যে বিন্দুমাত্র মনযোগী নই, বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে বসে সে অনুভব করতে পারে।

পাপ্পুও লিখেছে কয়েক ছত্র। সে তার বাবাকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেতে বলেছে। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। কিন্তু আমি আর কি করতে পারতাম ? যা অবশ্যম্ভাবী তা রোধ

করা যায় কি? হিল্ডা ডেভিসের মত মেয়েরা রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যই তো জন্মায়।

আমি সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে নিজেকে ঝাঁকুনি দিলাম। বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলাম টেবিলের সামনে। পাপ্পু আর লেখাকে চিঠি লেখা শেষ করতে আধ ঘণ্টাটাক সময় লাগল। ওদের মনোমত কথায় চিঠি পূর্ণ। পড়ে খুসী হবে।

আজ কাজে যাবার তাড়া নেই।

দুপুরের দিকে একাই হলিউডের দিকে রওয়ানা হব ভাবছি। এখানে পা দেবার পর থেকেই যাব যাব ভাবছি কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। একজন সঙ্গী থাকলে ভাল হত—অবশ্য একজনকে জুটিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না।

কিন্তু না, একাই যাব। স্বাবলম্বী হওয়া ভাল।

হঠাৎ খেয়াল হল দুধের বোতল আর সংবাদপত্র এখনও দরজার ওধারে পড়ে আছে। হকাররা খুব ভোরে এসেই নিজেদের কাজ সেরে চলে যায়। আমি উঠে গিয়ে, দরজা খুলে দুধের বোতল আর সংবাদপত্র ঘরে ঢুকিয়ে নিলাম।

বেলা এখন নটা।

এক গেলাস দুধ গরম করে নিতে খুব বেশী সময় লাগল না। আজকাল এ সমস্ত কাজে বেশ চটপটে হয়েছি। স্যাণ্ডউইচ সহযোগে জলযোগ সেরে নিয়ে সংবাদপত্রে মন দিলাম। ভারতের খবর বিশেষ থাকে না। আজকের প্রধান হেডিং যথানিয়মে ভিয়েৎনাম।

আমেরিকার শক্তির দম্ভ ওখানে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরো পাঁচ বছর লড়েও মার্কিন সৈন্য ওখানে সুবিধা করতে পারবে না। চতুর্থ ও পঞ্চম কলমের নীচের দিকে বক্স করে যে সংবাদ ছাপা হয়েছে আমার দৃষ্টি সেখানে আটকে গেল। দলীয়

পদপ্রার্থী নির্বাচনে, ক্যালিফোর্ণিয়া স্টেটে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছেন রবার্ট কেনেডি। আজই সন্ধ্যায় লস অ্যানজেলসের অ্যামবাসাডার হোটেলে বিজয় উৎসব পালিত হবে আড়ম্বরের সঙ্গে।

আমি জানতাম, ডেমোক্র্যাট পার্টির তিনজন - ম্যাকার্থী, হ্যামফ্রে আর রবার্ট কেনেডি দলীয় প্রার্থী হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যিনি প্রাথমিক নির্বাচনে জয়লাভ করবেন তিনিই ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য রিপাব্লিকান দলের রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে জাতীয় স্তরে লড়বেন।

মধবিত্ত সমাজ ও নিগ্রো সম্প্রদায়ে রবার্ট কেনেডির জনপ্রিয়তা কল্পনাতীত। ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী পদ যে তিনি পাবেন তাতে সন্দেহের আর অবকাশ নেই, এবং শেষে নিক্সনকে পরাজিত করে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার সম্ভাবনা দ্রুত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বিরুদ্ধবাদীরা আর কিছু না পেয়ে এক হাস্যকর অভিযোগ এনেছেন রবার্টের বিরুদ্ধে। তিনি নাকি এই নির্বাচনে অসম্ভব অর্থ ব্যয় করছেন। শুধু মাত্র ডেট্রিয়টেই খরচ হয়েছে কয়েক লাখ ডলার। এই খরচের বহরকে অস্বীকার করেন নি রবার্ট কেনেডি। তবে বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের কাছে চমৎকার উক্তি করেছেন—তিনি না, তাঁর জননী। রোজ কেনেডি বলেছেন, টাকাটা যখন আমাদের তখন কোথায় এবং কি পরিমাণে খরচ হবে তা আমরাই বিবেচনা করব।

একথা রোজের মুখে সাজে।

অর্থের অভাব নেই তাঁদের। তাঁর স্বামী জোসেফ কেনেডি লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন যে ব্যবসায় হাত দিয়েছেন উঠে গেছেন লাভের তুঙ্গে। যৌবনেই স্থির করেছিলেন, তাঁর যতগুলি সন্তানই হোক না কেন, যার যখনই একুশ বছর বয়স হবে তাকে তখনই দশ লক্ষ ডলার করে দেবেন।

কৃতি পুরুষ জোসেফ নিজের কথা রেখেছিলেন। তাঁর নটি

ছেলে মেয়েকেই তিনি দশ লক্ষ ডলার করে দিয়েছেন। দেবার সময় বলেছেন, ব্যবসা কর, রাজনিতী কর—যা ইচ্ছে তাই করতে পার। অর্থের জন্য কোন বড় কাজই তোমাদের আটকাবে না।

এই সদম্ভ উক্তি জোসেফ কেনেডির মুখে পুরোপুরি মানায়। এই বিশাল অঙ্কের অর্থ ছেলেমেয়েদের দেবার পরও নানা ব্যাঙ্কের জঠরে রয়েছে তাঁর লক্ষ লক্ষ ডলার। আছে বিপুল অস্থাবর সম্পত্তি, নানা কোম্পানীতে শেয়ার, বহু পেপার এবং অজানা আরো কত কি।

লক্ষ্মীর অপরিসীম কৃপালাভ করলেও. ভাগ্য অন্য দিক দিয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করে চলেছে। দুর্ঘটনার মৃত্যু এই পরিবারের যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বড় ছেলে জো মারা গেলেন গত মহাযুদ্ধে। এক জামাইও। তারপর মারা গেলেন এক মেয়ে ও আরেক জামাই প্লেন ক্র্যাসে। এরপর এল আরো মর্মান্তিক আঘাত। মেজ ছেলে—আমেরিকার ইতিহাসে তরুণতম প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি নিহত হলেন ডালেসের প্রকাশ্য রাজপথে। এবার সেজ ছেলে রবার্ট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। আদর করে সকলে যাকে ডাকে বব বলে।

জন কেনেডি একবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন দাদা মারা না গেলে রাজনীতিতে আমি আসতাম না। আমি যদি না থাকি তবে বব আছে—সে আমার জায়গা নেবে।

অগ্রজের সেই উক্তিকে সার্থক করেছেন রবার্ট কেনেডি। আজ তিনি আমেরিকার রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। অবশ্য তাঁকে দেখলে তেমন কিছু ধারণা করা সম্ভব হয় না। সাদামাটা মধ্যবিত্ত চেহারা। জামা কাপড়ে তেমন পারিপাট্য নেই। চুল চিরুণীর শাসন মানে না। সব সময় এলোমেলো।

মৃত্যু তাঁর পরিবারের পিছু পিছু রয়েছে, তবু মৃত্যু সম্পর্কে তিনি অকুতোভয়। তাঁর মত হল, ভয় পেলেই মৃত্যু দ্রুত নিকটবর্তী হয়,

সুতরাং ভয়কে জয় করে নাও। অধিকাংশ দিন সকাল বেলাই তিনি রাশিয়ান রুলেট খেলে থাকেন।

দারুণ বিপজ্জনক ব্যাপার। জীবনকে একরকম হাতের তালুতে রেখেই এই খেলা খেলতে হয়। পিস্তলের ব্যারেলে একটি মাত্র গুলি থাকবে—তারপর ঘুরিয়ে দিতে হবে ব্যারেল। ঘুরতে ঘুরতে আসার পরই নিজের কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপতে হবে। হয় গুলি বেরিয়ে আসবে বা বেরুবে না।

কি সাংঘাতিক খেলা।

এই খেলা প্রায়ই খেলছেন রবার্ট কেনেডি, আর ভাগ্য বলে বেঁচে যাচ্ছেন। বিচিত্র মানুষ তিনি। কতবার সাদায় কালোয় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে যাবার পর দুর্ঘটনাস্থলে গেছেন শুভাকাঙ্ক্ষীদের আপত্তি উপেক্ষা করেই। যে কোন মুহূর্তে হিংস্র ছুরি তাঁর উপর নেমে আসতে পারে তা জেনেও গেছেন। আহতদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, দাঙ্গা যাতে আর না বাধে তার চেষ্টা করেছেন।

বছর তিনেক আগে রবার্টের কি খেয়াল হল। কানাডায় যে পর্বত আরোহী দল চলেছে তাদের সঙ্গে তিনিও যাবেন। অনেকেই তাঁকে বাধা দিল। এই বিপজ্জনক অভিযানে তাঁর যাওয়ার কোন মানে হয় না। বব সেদিন মৃদু হেসে বলেছিলেন, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারলে নটি সন্তানের পিতা হিসাবে আমি একটা বিশ্ব রেকর্ড করব। তাছাড়া আমাদের পরিবারে দুর্ঘটনায় মৃত্যুই তো স্বাভাবিক ঘটনা।

ভাবপ্রবণ, সংবেদনশীল অথচ রবার্ট কেনেডি সম্পর্কে অনেকেই উদ্বিগ্ন। তিনি কিন্তু যথানিয়মে নির্বিকার আছেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় নিজের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি মৃদু হেসে জানিয়েছেন। মানুষ নিরাপদ পোতাশ্রয়ের জন্য সৃষ্টি হয়নি। জনতার সামনে উপস্থিত হতেই হবে—তারপর ভাগ্যে যা আছে।

১৯২৫ সালের ২০শে নভেম্বর ম্যাসাচুসেটসের ব্রুকলিনে রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি জন্মগ্রহণ করেন। হারভার্ট বিশ্ববিত্তালয় থেকে স্নাতক হবার পর, তিনি ভার্জিনীয়া বিশ্ববিত্তালয় থেকে আইনের ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুদিন নৌ-বিভাগে কাজ করার পর তিনি দাদা জন কেনেডির পাশে এসে দাঁড়ান। জন তখন মার্কিন সেনেটের নির্বাচনে প্রার্থী। সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে সাতাশ বছরের রবার্ট ভোটারদের জনের অনুকূলে এনেছিলেন।

এরপর তিনিও সেনেটে নির্বাচিত হন। কয়েকটি কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্বও এই সময় তাঁকে পালন করতে হয়। জন কেনেডি প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করার পর তিনি হন দেশের অ্যাটরনি জেনারাল। এই সময় তাঁর কাজ-কর্মে যে তৎপরতা, যে ঐকান্তিকতা দেখা গিয়েছিল তাতে পূর্বসূরীরা ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। জন কেনেডি নিহত হবার পর তিনি অ্যাটরনি জেনারালের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

এরপর চারটি বছর অপেক্ষা করেছেন রবার্ট।

দেশের রাজনীতি কোন পথে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করেছেন।

তারপর এই আটষট্টিতে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী হয়েছেন। তাঁর মত মানুষকে আমেরিকার পয়লা নম্বর নাগরিক হিসাবে আশা করাটা অন্যায় হবে না। যুদ্ধবাজ মনোভাবকে মুছে ফেলার এই হল মোক্ষম অস্ত্র। সাদা কালোর দাঙ্গা কমে যেতে পারে। এই সুযোগে নিগ্রোরা নিজেদের অনেক সমস্যাকে কাটিয়ে উঠবে।

পারিবারিক জীবনে রবার্ট কেনেডি একজন সুখী মানুষ। এথেলের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় বছর উনিশেক আগে। কেনেডি পরিবারের দুই মেয়ে ইউনিস আর জীন পড়তেন ম্যানহাট্টানভিল কলেজে। এথেল ছিলেন তাঁদের সহপাঠিনী। সেই সূত্রেই আসতেন মাঝে মাঝে কেনেডিদের বাড়ী। একদিন আলাপ হয়ে গেল

রবার্টের সঙ্গে। তারপর ঘনিষ্ঠতা। শেষে ১৯৫০ সালে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

এখন নটি সন্তানের স্নেহময় পিতা রবার্ট। দশম সন্তান আগত-প্রায়। তাই এথেল স্বামীর জয় সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত আছেন। কারণ ভাসুর জন কেনেডি আট বছর আগে যখন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন তখনও এথেল সন্তানসম্ভবা। ভাসুর জয়লাভ করেছিলেন। এবারও তিনি সন্তানসম্ভবা। সুতরাং স্বামীর জয় হবেই।

স্বাভাবিক কারণেই এথেলের শরীর এখন অপটু। তবুও তিনি স্বামীর সঙ্গ ছাড়ছেন না। দেশের প্রান্তে প্রান্তে যে সমস্ত নির্বাচনী সভা হচ্ছে, তার প্রতিটিতে যোগ দিচ্ছেন। আসন্ন দশম সন্তান সম্পর্কে রবার্ট কিন্তু পরিহাস করতে ছাড়ছেন না।

তিনি স্ত্রীকে বলেছেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। হোয়াইট হাউসে ঘর বাড়াবার দরকার হবে না। আমি না হয় একজনকে অ্যাটরনি জেনারাল করে দেব।

·········সংবাদপত্র মুড়ে সেন্টার পিসের উপর রেখে দিলাম। মন বেশ খুসী খুসী হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় পা দেবার পর থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল, শুধু টেলিভিশনে নয়, রক্ত মাংসর রবার্ট কেনেডিকে চাক্ষুষ দেখব কাছাকাছি থেকে।

এতদিন পরে সেই সুযোগ এসেছে। আজ সন্ধ্যায় অ্যামব্যাসাডার হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আরো বহুলোক সেখানে জমায়েত হবে সন্দেহ নেই। রবার্ট নিশ্চয় একসময় বেরিয়ে আসবেন হোটেল থেকে—জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করবেন।

কিন্তু অ্যামব্যাসাডার হোটেলের অবস্থান কোন পথের উপর আমার জানা ছিল না। লস অ্যানজেলস বিরাট শহর। অসংখ্য পথঘাট। আমার মত বিদেশীর পক্ষে সর্বত্র যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া হোটেলগুলি লক্ষ্য করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিনি।

কেয়ারটেকারকে ফোন করলাম।

সাড়া পাবার পর প্রশ্ন করলাম, অ্যামব্যাসাডার হোটেল কোন রাস্তায় বলতে পারেন ?

— কি ব্যাপার ? ওখানে উঠে যেতে চান নাকি ?

—এত রেস্ত আমার কোথায় ? ঠিকানাটা শুধু জানতে চাই।

— ৩৪০০, উইলশায়ার বুলেভার্ড।

—ধন্যবাদ।

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

উইলশায়ার বুলেভার্ড শহরের একটি বিখ্যাত রাস্তা। নিয়মিত ওখান দিয়ে আমার যাওয়া-আসা করতে হয়। অথচ আমি অ্যামব্যাসাডার হোটেল লক্ষ্য করিনি। অবাক কাণ্ড। ওই পথটি আমার আস্তানা থেকে বেশী দূরও নয়। ভালই হল, ডিনার সেরে ধীরে-সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকালাম।

সাড়ে নটা।

কোন উপলক্ষ্যে ফ্যাক্টরী আজ বন্ধ নয়। গত সন্ধ্যায় পোরটরিকো থেকে ফিরেছি—আজ বিশ্রাম করার জন্য আমাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিছানায় এপাশ ওপাশ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিশ্রাম করতে থাকার মত অবস্থা আমার নয়।

প্রচুর সময় হাতে থাকায় এখন আমি স্বচ্ছন্দে হলিউডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি। শুটিং দেখার সুযোগ পাব না এটা ঠিক। ওখানে জানাশুনা কেউ নেই। চারধার ঘুরে-ফিরে আসতে বাধা নেই। ঘণ্টা চারেকের বেশী সময় লাগবে বলে মনে হয় না। দুপুরের খাওয়া কোন রেষ্টুরেণ্টে স্বচ্ছন্দে সেরে নেওয়া চলবে।

কালো ঘেঁসা বেগুনে রংএর টেরিডেকের সুট পরে আমি যখন ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম তখন সবে মাত্র দশটা বেজেছে। ট্যাক্সিতে নয়। স্থির করেছি বাসেই যাব। কিছু পয়সা বাঁচান যাক্। এক

প্রান্তে হল আমাদের ডাউন-টাউন হলিউড আরেক প্রান্তে—মাঝে বিশাল লস অ্যানজেলস ছড়িয়ে রয়েছে।

হলিউডগামী বাস পেতে অসুবিধা হল না।

আমাদের দেশের মত বাদুড়ঝোলা অবস্থা নয়। সিটের অতিরিক্ত একজন মানুষকেও স্থান দেওয়া হয় না। চমৎকার সিটের ব্যবস্থা। বাসে যে এত স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় অভিজ্ঞতা না থাকলে ধারণা করা সম্ভব নয়।

অজস্র গাড়ীর সঙ্গে গা মিশিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলল। আমেরিকার সর্বত্র গতিবেগের বড় কদর। নব্বুই বা একশ মাইলের কম গতিবেগে হাইওয়ের উপর দিয়ে কেউ গাড়ী চালাতে চায় না। অনিবার্য কারণস্বরূপ দুর্ঘটনাও ঘটে প্রচুর। কার অ্যাক্সিডেন্টে আমেরিকায় যত মানুষ মরে পৃথিবীর আর কোন দেশের হিসাব তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারে না।

হলিউড অঞ্চলে যখন পৌঁছালাম তখন বেলা চড়েছে।

আগেই বলা ছিল, কনডাক্টার আমাকে বোর্নসন এভিনিউ-এ নামিয়ে দিল।

অ্যাসফাল্টে মোড়া ছায়াঘেরা পথটি ধরে একটু এগুতেই বিখ্যাত কলম্বিয়া ষ্টুডিও দেখতে পেলাম। বড় বড় গাছপালা আর বাগান সম্বলিত বিরাট কম্পাউণ্ড। অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন ছবির স্যুটিং চলছে বোধ হয়। বাইরে থেকেই কিছুটা ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমি এগুলাম।

অনাহূত আগন্তুক আমি। এই রঙ্গীন জগতে এসেছি কিছু জানার কিছু দেখার আগ্রহ নিয়ে। এখানে আমাকে কেউ জানে না—কেউ চেনে না। কারুর মনে এক ফোঁটা কৌতূহলও আমি জাগাতে পারব না। না পারি। কি যায় আসে তাতে। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যেতে পারলেই হল।

একে একে এম জি এম, প্যারামাউন্ট, আর কেও, টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি ফক্স, ইউনাইটেড আর্টিষ্ট, ইউনিভার্সাল, ওয়াল্ট ডিজনে, ওয়াণার ব্রাদার প্রভৃতি ষ্টুডিওর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। এই সমস্ত জায়গায় রোনাল্ড কোলম্যান, চার্লস বয়ার, হ্যামফ্রে বোগাটর মত আরো কত অভিনেতা এবং গ্রোটাগার্বো, ইনগ্রিড বার্জম্যান, ভিভিয়ানলের মত অভিনেত্রীরা অবিস্মরণীয় অভিনয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এখানেই এখন কার্যরত আছেন সাসপেন্সের রাজা আলফ্রেড হিচকক।

ঘুরতে ঘুরতে যে একটা বেজে গেছে বুঝতে পারিনি। কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ঘর্মাক্ত হইনি। রৌদ্রের আজ তেজ নেই। আকাশময় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে একটু অসুবিধায় পড়ে যাব। অবশ্য ওই ভাবনায় নিজেকে এখন ব্যস্ত রাখলে চলবে না। খিদে পেয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়াটা আগে সেরে নেওয়া দরকার।

যে বিলাসবহুল রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম—একজন পুলিশম্যানের কাছে অনুসন্ধান করতে জানা গেল এর নাম মানসেট বুলেভার্ড। আমাদের দেশের মত নিরাসক্ত পুলিশ কর্মচারী সে নয়। ভদ্রতা করে জানতে চাইল আমি কিছু খুঁজছি কিনা।

বললাম, এই রাস্তায় কোন রেষ্টুরেণ্ট আছে ?

—অনেক ভাল ভাল রেষ্টুরেণ্ট আছে। প্রথমেই পাবেন বিট ও সুইডেন।

—অনেকটা যেতে হবে কি ?

—মোটেই না। সামান্য কয়েক পা।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এগুলাম।

শ'দেড়েক গজ এগুবার পর সত্যি বিট ও সুইডেন-এর সাক্ষাত পেলাম। কিন্তু রেস্তরাঁর অভিজাতদর্শন চেহারা আমাকে চিন্তিত করে তুলল। যে রকম জায়গায় এসে পড়েছি খাবার-দাবারের দাম

আকাশ ছোঁয়া হওয়াও বিচিত্র নয়। ভেতরে যাব কি যাব না—কি করব বেশ কয়েক মিনিট স্থির করতে পারলাম না। পকেটে আছে এখন শ' দুয়েক ডলার। যা হবার হবে। শেষে দুর্গা বলে ভেতরে ঢুকেই পড়লাম।

সুসজ্জিত বিশাল হল। অধিকাংশ টেবিল পূর্ণ। ওয়েটাররা ব্যস্তভাবে পরিবেশন করে চলেছে। এখন লাঞ্চ টাইম, ভীড় হওয়াই স্বাভাবিক। আমি প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলাম। ওধারে একটি টেবিল নিয়ে একজন মাত্র ভদ্রলোক বসেছিলেন।

তাঁর কাছে পৌঁছে বললাম, এই টোবল কি আপনি রিজার্ভ করেছেন ?

—না। বসবেন ?

—আপনার অসুবিধা না হলে—

—কোন অসুবিধা নেই। বসুন।

এবার ভদ্রলোককে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ভারী চেহারার মধ্যবয়স্ক মানুষ। মাথার সোনালী চুল পাতলা হয়ে এসেছে। মুখ দেখে মনে হয় চিন্তা-ভাবনা বলে তাঁর কিছু নেই। আমি বসলাম তাঁর মুখোমুখি। পানীয়র প্রতিই তাঁর আসক্তি দেখা গেল। এই নিদাঘ দুপুরে ভদ্রলোক ড্রাই মার্টিনির সদ্ব্যবহার করছিলেন।

একজন ওয়েটার আমার হাতে মেনু দিয়ে অর্ডারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। মেনু পড়ে তো আমার চক্ষুস্থির। কোন খাবারের নামই আমার পরিচিত নয়। কোনটা যে কি বোঝার উপায় নেই। এমন জানলে এখানে কে ঢুকতো ?

—আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি ?

ভদ্রলোকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। আমার অসহায় অবস্থার কথা তিনি নিশ্চয় অনুভব করেছেন। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না।

আবার বললেন, খাবারগুলো সবই আপনার অচেনা মনে হচ্ছে বোধহয় ?

—হ্যাঁ। মানে……

—এই রেষ্টুরেণ্টে প্রথম দিন প্রত্যেককেই এই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। সুইডিস নাম।

ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একটু ঘুরে এস। আমরা ততক্ষণ খাবার বাছার কাজ শেষ করে ফেলি।

ওয়েটার চলে যাবার পর মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললাম, রেষ্টুরেণ্টের নাম দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল ভেতরে গেলে বিপাকে পড়তে পারি। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। ব্যাপারটা এবার সামলে নেওয়া যাবে।

—মনে যাই থাক। সুখাদ্য বলতে যা বোঝায় তাই পাবেন। আমার অনেকদিন থেকে এখানে যাওয়া-আসা।

ভদ্রলোক মেনুর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

আমি সসংকোচে বললাম, খাদ্যতালিকা স্থির করার আগে আমার পকেট সম্পর্কে আপনার কিছু জেনে নেওয়া ভাল। মানে…

—আচ্ছা—আচ্ছা। কোন অসুবিধা হবে না। আমার এখনও খাওয়া হয়নি।

আমিই দুজনের লাঞ্চের অর্ডার দেব।

—আপনি! না না—আপনি কেন আমার জন্য খরচ করবেন?

ভদ্রলোক একটু শব্দ করেই হাসলেন।

—লোকে বলে ইদানিং নাকি আমি প্রচুর আয় করছি। আমি বলব, খরচ করবার মত চওড়া হৃদয় আমার আছে। তাছাড়া আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে বিদেশী—হলিউড দেখতে চলে এসেছেন। আপনাকে একদিন লাঞ্চ খাওয়ালে আমি মোটেই অসুবিধায় পড়ব না।

আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। অবশ্য জানি ধনাঢ্য আমেরিকানদের খাম-খেয়ালীপনার সীমা নেই। তারা কখন কি

করবে অথবা কি বলবে তার হিসেব তাদের নিজেদেরও জানা নেই। বুঝলাম সেই রকমই কোন একজনের মুখোমুখি হয়েছি।

আমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকার মত ধৈর্য তাঁর নেই দেখলাম। ইসারায় ওয়েটারকে ডেকে দুই প্রস্থ লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে দিলেন। তারপর গেলাসে যেটুকু পানীয় অবশিষ্ট ছিল তা গলায় ঢেলে দিয়ে তৃপ্তির উদ্গার তুললেন। পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে এগিয়ে ধরলেন আমার দিকে।

একটা সিগারেট তুলে নিলাম।

—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

—রেক্স মরিসন। চিত্র পরিচালক। আপনি—

নিজের নাম বললাম। কি উদ্দেশ্যে আমেরিকায় এসেছি তাও জানালাম।

মরিসন বললেন, বছর দশেক আগে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। থাকতে হয়েছিল মাস দুয়েক।

—তাই নাকি! কোথায় ছিলেন—দিল্লীতে?

—বম্বে আর মাইশোরের মধ্যে আমার সময় কেটেছে। আপনি জানেন কি 'ভবানী জংশন' নামে হলিউডের একটা ছবির বেশ কিছু অংশ আপনাদেব দেশে তোলা হয়েছিল? ওই ইউনিটের আমি ছিলাম প্রডাক্সন ম্যানেজার।

লাঞ্চ এসে গেল। চমৎকার গন্ধ যুক্ত কয়েক প্লেট খাদ্য। পাক-প্রণালীর বৈচিত্র্যের জন্য কোনটাই পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না। খেতে আরম্ভ করলাম আমরা। স্কাণ্ডিনেভিয়ান প্রথায় তৈরী খাদ্য এই প্রথম খাচ্ছি—খারাপ লাগছে না কিন্তু।

খেতে খেতে কথাবার্তা চলতে লাগল।

—'ভবানী জংশন'-এর সুটিং ওখানে হয়েছিল জানি। তবে আমার দেখা হয় নি।

—ভালই করেছেন। ফ্লপ ছবি।

—আপনি বোধ হয় এখন নিজের ইউনিট করেছেন ?

—ইতিমধ্যে খান তিনেক ছবি তুলেছি। নাম না হোক, পয়সা দিয়েছে। অর্থ প্রাপ্তিই তো হল সমস্ত সমস্যার সমাধান। কি বলেন ?

রেক্স মরিসন নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন।

বললাম, এখন কোন ছবি করছেন নাকি ?

—করছি বইকি। সুটিং ব্রেকের পরই তো এসেছি এখানে লাঞ্চ সারতে। ইণ্ডোরের কিছু কাজ সেরে নিচ্ছি আর কি। চারটে থেকে আবার সুটিং আরম্ভ হবে।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম মিঃ মরিসন। বলতে পারেন কোন চিত্র-পরিচালকের মুখোমুখি এই আমি প্রথমবার হচ্ছি। আপনাদের ওই জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্য আমার খুবই সীমিত।

—সময় আছে হাতে ?

—তা আছে কিন্তু—

—চলুন তাহলে সুটিং দেখবেন। নতুন অভিজ্ঞতাও হবে। আবার আমাদের কাজ-কর্মের নেপথ্যে কি হয় তাও কিছুটা বুঝতে পারবেন।

এ এক অভাবনীয় সুযোগ। হলিউডের কোন ফ্লোরে সুটিং দেখার আমন্ত্রণ পাওয়া কম কথা নয়। হলিউড দেখতে আসার আগে কল্পনাই করতে পারিনি এরকম যোগাযোগ ঘটবে। খাম-খেয়ালি হোন আর যাই হোন, রেক্স মরিসনের উপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল।

—আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না মিঃ মরিসন। তবে একথা বলতেই হবে, যে সুযোগ আমায় দিচ্ছেন আমার জীবনে তা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

আর অল্পকালের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা উঠে পড়লাম। রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরালাম দুজনে।

মরিসনের গাঢ় লাল রং-এর বিশাল গাড়ীখানা কাছেই পার্ক করা ছিল। সিগারেট ছাই করে আমরা গাড়ীতে গিয়ে বসলাম।

—কোন্ ষ্টুডিওতে আপনার সুটিং চলছে?

—কলম্বিয়াতে। আপনার উপাধিটা কি যেন—?

—ব্যানার্জী।

—মিঃ ব্যানার্জী, আপনি আমার ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তো আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। আমি কিন্তু একটু উত্তেজনাপূর্ণ গল্পই সব সময় দর্শকদের সামনে উপস্থিত করতে ভালবাসি।

—কোন রহস্যঘন উপন্যাসের চিত্ররূপ দিচ্ছেন?

—না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। একজন্ মাত্র লোক বিপক্ষের শিবিরে ঢুকে চরম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে নিজের কার্যোদ্ধার কি ভাবে করেছিল আমি তাই দেখাতে চাই।

মরিসন গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন।

ষ্টুডিও চত্বরে পৌঁছে দেখি সে এক এলাহি ব্যাপার। জার্মান বন্দী শিবিরের সেট পড়েছে। একজন বৃটিশ ইণ্টেলিজেন্স অফিসার—জার্মান ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি—তিনি জার্মান সৈনিকের বেশে মিশে গেছেন বন্দীদের সঙ্গে। উদ্দেশ্য হল কৌশলে তাদের পেট থেকে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ বার করে নেওয়া।

এই দৃশ্যটিই এখন তোলা হবে।

বৃটিশ ইণ্টেলিজেন্স অফিসারের চরিত্রে রূপদান করছেন লেসলি হাওয়ার্ড। মেকআপ সেরে তিনি সেটে এসে পড়েছিলেন। চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে! তাঁর অভিনীত কোন ছবি আমি দেখেছি কিনা এখনই মনে করতে পারলাম না।

রেক্স মরিসন এখন অন্য মানুষ। নিজের কাজে একেবারে লীন হয়ে গেছেন। সহকারীদের ঘন ঘন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। পরীক্ষা করে নিচ্ছেন সাউণ্ডের তারতম্য। লাইট কোথায় এগিয়ে আসবে আবার কোথায় পিছিয়ে যাবে—তার জন্য ছুটোছুটি করছেন।

স্যুটিং আরম্ভ হল।

ভীষণ একঘেয়ে ব্যাপার।

সিনেমার পর্দায় যে দ্রুততা লক্ষ্য করা যায় এখানে তা পুরোপুরিই অনুপস্থিত। একই সংলাপ কয়েকবার করে টেক করা হচ্ছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। নতুন অভিজ্ঞতা। তবুও অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হতে লাগল।

আড়াই ঘণ্টা পরে শেষ হল স্যুটিং।

রেক্স মরিসনের সঙ্গে আমি ক্যান্টিনে গিয়ে বসলাম। বিয়ার এসে পড়ল। এই পানীয়ের এখন প্রয়োজন ছিল। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। সমস্তই স্যুটিং সংক্রান্ত। আউট ডোর জার্মানী আর ফ্রান্সের বর্ডারে—যেখানে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেখানেই করবেন জানালেন। আগামী মাসের মাঝামাঝি ইউনিট নিয়ে যাত্রা করছেন ইউরোপের উদ্দেশ্যে।

আরো আধ ঘণ্টাটাক পরে আমরা উঠে পড়লাম। বিয়ার দুজনকেই বেশ সতেজ করে তুলেছে। সহকর্মীদের কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মরিসন আমাকে নিয়ে গাড়ীতে এসে বসলেন। শহরে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে চলেছেন। কাজেই আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। আজকের সারা দিনটাই চমৎকার কাটল।

আমার মত বিদেশীর পক্ষে কিছুটা শ্লাঘার বিষয়।

মরিসন বললেন, স্যুটিং আপনার ভাল লাগেনি বুঝতে পাচ্ছি। কারুরই ভাল লাগে না। তবে এই ছবি যখন পর্দায় দেখান হবে তখন ভাল লাগতে বাধ্য। বাস্তব যে সময় সময় কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায় এই ঘটনা তাবই প্রমাণ।

—আপনি কল্পনার আশ্রয় কোথাও নেননি ?

—একেবারেই না। দরকার পড়েনি। চিত্রনাট্যের সামারিটা বরং আপনি পড়ুন। আমার কাছেই রয়েছে।

তিনি এক হাত স্টিয়ারিং-এর উপর রেখে অন্য হাত দিয়ে পাশে

রাখা ব্রিফকেশের মধ্যে থেকে টাইপ করা খান কয়েক পাতা বার করে আমাকে দিলেন। বুঝলাম চিত্রনাট্য থেকে মূল গল্প বার করে নিয়ে কোন প্রয়োজনে আলাদাভাবে টাইপ করে রাখা হয়েছে।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে।

আমি পড়তে আরম্ভ করলাম।

······লেনাস নামে শহরটি তখন জার্মানদের অধিকারে। অথচ ভৌগোলিক গুরুত্বের জন্য ওই জায়গাটি মিত্রপক্ষের অধিকারে আসা দরকার। পরিকল্পনা স্থির হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। উত্তর দিক থেকে ইংরাজরা আক্রমণ করবে আর দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসবে ফরাসীরা। তবে যুদ্ধ চলাকালে জার্মানরা যদি নিজেদের রিজার্ভ ফোর্স এনে উপস্থিত করে তাহলে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। এই রকম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইংরাজপক্ষের প্রধান স্যার ডাগলাস হেগ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

জার্মান রিজার্ভ ফোর্সকে কোন মতেই ঘটনাস্থলে আসতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব কোন মতেই স্থির করা যাচ্ছে না। অবশ্য দিন দুয়েক চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাবার পর স্যার হেগ আশার আলো দেখতে পেলেন। এ সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান চালিয়ে স্থির নিশ্চিত হবার পর ডেকে পাঠালেন ক্যাপ্টেন বার্ণাড নিউম্যানকে।

নিউম্যান আগে সামান্য ডেসপ্যাচে রাইডারের কাজ করতো। হঠাৎ একদিন কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করলেন সে জার্মানদের মতই জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টে বদলি করা হয়। উঁচু পদ দেওয়া হয় নিউম্যানকে। তারপর জার্মান সৈনিকের পোশাক পরিয়ে চালান করে দেওয়া হয় তাকে বন্দী শিবিরে।

নিউম্যানের কাজ ছিল বন্দী জার্মানদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের পেট থেকে কথা বার করা। তার নিখুঁত উচ্চারণের জন্য কেউ তাকে

সন্দেহ করেনি। সকলেই ভেবেছে সেও একজন তাদেরই মত বন্দী জার্মান সৈন্য। এই কাজে নিউম্যান সাফল্য লাভ করেছিল অসাধারণ। জানা গিয়েছিল অনেক গোপনীয় সংবাদ। বলা বাহুল্য, কর্ম তৎপরতাই তাকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করেছে।

স্যার হেগ-এর সামনে এসে দাঁড়াল নিউম্যান।

—তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে চাই ক্যাপ্টেন।

—আমি প্রস্তুত স্যার।

—লেনাস আক্রমণ করার ব্যাপারে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধান আমি বার করেছি।—স্যার হেগ বললেন, ওখানকার জংশন স্টেশনটাকে অকেজো করে ফেলতে হবে। তাহলে ট্রেনভর্তি করে রিজার্ভ সৈন্যদের আনা সম্ভব হবে না জার্মানদের পক্ষে।

—আমায় কি করতে হবে স্যার?

—তোমাকে জার্মান সৈনিকের বেশে ওখানে গিয়ে মূল কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। তবে তার আগে তুমি গিয়ে ঢুকবে বন্দী শিবিরে।

নিউম্যান ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না।

সমস্ত কিছু সরল করে দিলেন স্যার হেগ।

১৩৮ নম্বর ব্যাভেরিয়ান রেজিমেণ্টের আর্নস্ট কারকেলন জার্মান বন্দীদের মধ্যে একজন। তার মুখ এবং উচ্চতা নাকি অনেকটা নিউম্যানেরই মত। তার সঙ্গে গিয়ে ভাব জমাতে হবে। তার হাবভাব, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি নিখুঁতভাবে নকল করা চাই। কারণ পরে নিউম্যানকে আর্নস্টের ভূমিকা নিয়েই যেতে হবে লেনাসে।

নিউম্যান জার্মান সৈনিকের পোশাক গায়ে চাপিয়ে বন্দীশালায় প্রবেশ করল। অচিরেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল আর্নস্টের সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই নিউম্যান তার পারিবারিক সমস্ত কথা জেনে ফেলল। এমন কি তাদের বাড়ীতে গৃহপালিত জন্তু কি কি আছে তাও অজানা রইল না। প্রেমিকা ইর্মা সম্পর্কেও অনেক কিছু

জানা গেল। তার একখানা ছোট ফটোগ্রাফও নিউম্যানকে দেখাল আর্নস্ট।

হপ্তাখানেক পরে বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এল নিউম্যান। এবার লেনাস যেতে হবে তাকে। ওই শহরটি এবং তার আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ম্যাপ দেখে মনের পর্দায় এঁকে নিতে হল। এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল কিভাবে ওখানে প্রবেশ করা যাবে।

ইংরাজ ও জার্মান সৈন্যদের অবস্থানের মধ্যেকার বেশ কিছুটা অংশ নো ম্যানস ল্যাণ্ড। স্থলপথে ওই অংশ পার না হয়ে লেনাসে যাবার আর কোন উপায় নেই। অথচ ওখানে পা দিলেই বুলেটের ঝাঁক শরীর ঝাঁজরা করে দেবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির হল প্লেনে করেই নিউম্যানকে যেতে হবে ওখানে। লেনাসের দক্ষিণ প্রান্তের গভীর জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা পরিষ্কার অংশ আছে। বিপদের ঝুঁকির কথা মনে রেখেই ওখানে ছোট ধরনের একটা প্লেনকে নামাতেই হবে।

২১শে জুলাই গভীর রাত্রে বহু চেষ্টার পর ওই অংশে প্লেন ল্যাণ্ড করান সম্ভব হল। দুর্ঘটনা যদি সত্যি নিউম্যান ঘটাতে পারে তাহলে এই প্লেন আবার আসবে তাকে এখান থেকে তুলে নিতে। নিউম্যানের গায়ে এখন পুরোদস্তুর জার্মান সৈনিকের পোশাক। কালো চুলকে বহু আয়াসে বাদামী করে তোলা হয়েছে। কারণ আর্নস্টের চুল বাদামী। আর্নস্টের আসল কাগজপত্র এবং ইর্মার একখানা ছবিও এখন নিউম্যানের পকেটে। ভাবটা এমন যেন সে লেনাসে এসেছে, এবার নিজের রেজিমেণ্টে ফিরে যাবে।

সমস্ত রাত সেই জঙ্গলের মধ্যে কাটাতে হল নিউম্যানকে। ভোরে শহরের দিকে পা চালাল। আর দশজন জার্মান সৈন্যের মত বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে লেনাস এসে পোঁছাল একটু বেলায়। পথে অবশ্য মিলিটারি পুলিশ তাকে আটকে ছিল। পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছে এই কথা শুনে ভ্রূকুঁচকে উঠেছিল মিলিটারি

পুলিশের। অবশ্য নিখুঁত পরিচয়পত্র দেখার পর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

শহরে তখন মিলিটারি গিসগিস করছে। বিভিন্ন রেজিমেন্ট রয়েছে। কে কার খোঁজ রাখে। নিউম্যানের এখন মাথা গোঁজার একটা জায়গা চাই। ভবঘুরের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়ালে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। নিউম্যান একটা বার'এ ঢুকে পড়ল। সেখানে অনেক জার্মান সৈনিক বিয়ার আর হুইস্কি নিয়ে হাসছে আর উঁচু গলায় কথা বলছে।

বিয়ার খেতে খেতে নিউম্যান বারলেডীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। বারলেডী স্থূলাঙ্গী, বয়স চল্লিশের কম হবে না, তবু সাজ-পোশাকে বেশ চটক আছে। এখনও কোন কোন জার্মান সৈনিক তাকে রাতে সঙ্গিনী হিসাবে পাবার জন্য যে লালায়িত তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

নানা প্রসঙ্গের পর নিউম্যান আসল কথায় এল।

—এখনও দিন কয়েক ছুটি বাকী আছে। রাত কাটাবার মত কোন আস্তানার সন্ধান দিতে পার?

চোখ নাচিয়ে বারলেডী বলল, এত ঢাক ঢাক কেন? পরিষ্কার করেই বল না একটু ফূর্তি-টুর্তি করতে চাও?

—তা ইয়ে···বলতে পার। তবে একটা আস্তানাও তো চাই। মানে···

—বুঝেছি—বুঝেছি। আস্তানাও চাই আবার ফুর্তি করার জায়গাও চাই—এই তো? তুই হবে।

বারলেডীর কাছ থেকে জানা গেল, কাছেই একজন রেলকর্মী আছেন। তিনি ঘর ভাড়া দিয়ে থাকেন। কোন গোলমাল ঝামেলা ওখানে নেই। রুগ্না স্ত্রী আর এক মেয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের সংসার। যতদূর জানা আছে, খালি ঘর এখন পাওয়া যাবে। এরপর বারলেডী বুক নাচিয়ে জানাল, রাতে-বেরাতে এখানে চলে এলে অন্য ব্যবস্থাও হবে।

ঠিকানা পেয়ে নিউম্যান ওখান থেকে বিদায় নিল।

ডিউটিতে বেরুবার উপক্রম করছিলেন গৃহকর্তা, নিউম্যান উপস্থিত হল। কি প্রয়োজনে এসেছে এবং পরিচিতা বারলেডী তাকে পাঠিয়েছে শুনে ঘর ভাড়া দিতে রাজী হলেন ভদ্রলোক।

তাঁর তাড়া ছিল।

কাজে বেরিয়ে যাবার আগে তিনি বলে গেলেন, আমি এখন ডিউটিতে বেরুচ্ছি। আমার মেয়ে সুজান আপনাকে ঘর দেখিয়ে দেবে। ভাড়ার ব্যাপারে গাফিলতি না দেখালে যতদিন ইচ্ছে আমার বাড়ীতে থাকতে পারেন।

তিনি চলে গেলেন।

সুজান দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। নিউম্যান এবার তাকে খুঁটিয়ে দেখল। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা সে নয়। তবে চেহারায় বেশ আকর্ষণ আছে। চমৎকার স্বাস্থ্য। যে ধরনের খাটো ফ্রক পরে আছে তাতে যে কোন পুরুষই তার সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে পড়বে। অবশ্য কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিউম্যান নিজেকে কঠিন শাসনে রাখবার চেষ্টা করবে।

সুজানরা যে খাঁটি জার্মান নয় তা অনুমান করে নিল নিউম্যান। কথায় ফরাসী টান। অবশ্য বর্ডারের অধিবাসীদের রক্তে একটু হেরফের হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সুজান নিউম্যানকে ঘর দেখিয়ে দিল। বিয়ার খেতে খেতে গল্প হতে লাগল দুজনের মধ্যে। যুদ্ধ, পারিবারিক প্রসঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সময় গড়িয়ে চলল।

একসময় সুজান মুখে হাসি টেনে বলল, আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি তুমি জার্মান নও।

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল।

নিউম্যানের পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবুও সে জোরের সঙ্গে বলল, কি সমস্ত আজে-বাজে বকছো? আমি

ঐকজন জার্মান সৈনিক ছাড়া আর কিছু নই, তাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ?

—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। তুমি যাই বল না কেন, আমি ঠিক জানি তুমি জার্মান নও। আসল ব্যাপারটা কি বলতো ?

নিউম্যান বুঝতে পারল আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া বৃথা। সে ধরা পড়ে গেছে। মিলিটারি পুলিশ তার জালিয়াতি ধরতে পারেনি, অথচ ধরা পড়ে গেল একজন সাধারণ যুবতীর কাছে। পিস্তলের এক গুলিতে ওকে শেষ করে এখান থেকে সরে পড়বে কিনা এই চিন্তা দ্রুত তার মনে ওঠানামা করতে লাগল।

—কি ভাবছো ?

নিউম্যানের হাত হোলস্টারের উপর চলে গেছে।

—আমি হয়তো তোমার অনেক কাজে লাগতে পারি। কেন এখানে এসেছো এবার আমায় বল ?

লেনাস স্টেশনে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটানই হল মূল উদ্দেশ্য। সুজানের বাবা সান্টিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া মেয়েটি হয়তো জার্মান নিপীড়ন সহ্য করেছে—প্রতিশোধ স্পৃহা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

হোলস্টারের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল নিউম্যান।

—তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে নিশ্চয় ?

সুজান কাছে এগিয়ে এসে বলল, নির্ভয়ে বলতে পার। কেউ একটি কথাও জানতে পারবে না।

নিউম্যানের সাহস আবার ফিরে এসেছে।

—তুমি আমাকে সাহায্য কর সুজান। মনে হচ্ছে জার্মানদের প্রতি তোমার কোন দুর্বলতা নেই।

—কি ধরনের সাহায্য ?

—এখনও ঠিক জানি না কি ধরনের সাহায্য তুমি আমায় করতে

পারবে। যে কাজে নেমেছি তাতে একজন সহকারার প্রয়োজন। খর, তুমি আমার সহকারী হয়ে রইলে।

নিউম্যান এবার খুলে বলল কি করতে সে লেনাসে এসেছে।

পরের দিন রাত্রে সুজানের বাবার সঙ্গে নানা ধরনের গল্প হল নিউম্যানের। এই তরুণ সৈনিকটি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে গৃহকর্তা মোটেই আঁচ করতে পারেন নি। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় জংশন স্টেশনের কথা উঠতে লাগল।

নিউম্যান জানতে পারল রাত্রের দিকে কখন কখন ট্রেন আসে। কখন আবার একই সময় দুদিক থেকে ট্রেন এসে পড়ে। সিগ্ন্যাল বক্সের কাছে একজন পাহারা দেয়। দ্বিতীয় পাহারাদার আছে ওখান থেকে অনেক দূরে। সিগ্ন্যাল বক্সের পাহারাদার আবার ঠিক রাত দুটোর সময় সিগ্ন্যালম্যানের ঘরে গিয়ে কফি খায়। নিজের জায়গায় ফিরে আসে মাত্র দশ মিনিট পরেই ইত্যাদি।

বিকালের দিকে নিউম্যান বাড়ী থেকে বেরুল।

এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর আরো একটু এগিয়ে, দূর থেকে সিগ্ন্যাল বক্স এবং তার চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা ভাঁজা হয়ে গেছে। আর ঘোরাঘুরি না করে সুজানদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল নিউম্যান। কিছুদূর এগুবার পর একজন মিলিটারি পুলিশ তার পথ আটকাল।

কাগজপত্র পরীক্ষা করার পর সে বলল, তুমি এখনও এখানে ঘোরাঘুরি করছো কেন? তোমার ছুটি শেষ হতে আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকী দেখলাম।

ঘাবড়ে গেলেও যতদূর সম্ভব সহজভাবে নিউম্যান বলল, ট্রেন ফেল করায় দারুণ অসুবিধায় পড়ে গেছি।

— তোমার আর এখানে দেরী করা ঠিক নয়। ডিপো থেকে কতকগুলো লরি মাল নিয়ে ওধারে যাচ্ছে। তুমি তারই একটাতে গিয়ে চেপে বস। তোমার ডিপোর সামনে দিয়ে যাবার সময় নেমে পড়ো।

—ধন্যবাদ। তাই করি গিয়ে।

মিলিটারি :পুলিশম্যানটি তার পথ ছেড়ে দিতে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে যদি বলে বসতো, চল তোমাকে লরিতে তুলে দিয়ে আসি গিয়ে। তাহলেই হয়ে গিয়েছিল। ধরা তো পড়েই যেত। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে উপস্থিত করা হত সঙ্গে সঙ্গে।

নানা পথ ঘুরে বাসায় যখন এসে পৌঁছালাম তখন রাত দশটা। সুজান বসে ছিল খাবার টেবিলের সামনে। তার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। ভাল লাগল নিউম্যানের। আহার শেষ করল দুজনে নীরবে। তারপর শুতে গেল যে যার ঘরে। নিউম্যান অবশ্য ঘুমিয়ে পড়বে না। আজ রাত্রেই তাকে যে ভাবেই হোক কাজ শেষ করতে হবে।

সময় যেন কাটতে চায় না।

ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছাবার মুখে একটা বাজল। নিউম্যান বিছানা থেকে উঠে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল। সন্তর্পণে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে বেরুবার দরজার কাছ বরাবর পৌঁছাবার পর তাকে থামতে হল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সুজান দাঁড়িয়ে রয়েছে।

— তুমি ঘুমাও নি ?

— না।

—আমি যাচ্ছি সুজান।

—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—তা হয় না। বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সহজ হতে পারব না।

—আমায় নিয়ে যাবে না ?

—অবুঝ হয়ো না সুজান।

নিউম্যান দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সুজান এসে দাঁড়াল তার খুব কাছে। তার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। একটু বিরতি, তারপরই সে সবলে জড়িয়ে ধরল নিউম্যানকে। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল তার মুখ। ক্ষণিকের জন্য সচকিত হয়েছিল। নিউম্যান—সেও সাপটে ধরল নিজের অসামান্যা সাহায্যকারিণীকে। মন থেকে মিলিয়ে গেল কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে। আত্মবিস্মৃত দুই নারী পুরুষ কতক্ষণ নিজেদের উদ্দামকে প্রশ্রয় দিয়েছিল তার হিসাব কেউ রাখেনি।

শেষে—

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সরে এল নিউম্যান।

কাঁপা গলায় সুজান বলল, যাচ্ছ—

—হ্যাঁ। আবার তোমার কাছে ফিরে আসতে পারব কিনা জানি না। বিদায় সুজান—

নিউম্যান বাড়ী থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করল। ভাগ্যক্রমে সে রেল লাইন সুজানদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। সিগ্ন্যাল কেবিনের কাছাকাছি যখন পৌঁছাল তখন দুটো বাজতে সামান্য দেরী আছে। পাহারায় রত সৈনিকটিকে পরিষ্কার দেখা গেল।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। ঝোপের মধ্যে গুটিসুটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল নিউম্যান। দুটো বেজে গেল ক্রমে। পাহারারত সৈনিকটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সিগ্ন্যাল কেবিনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। তার কফি খাওয়ার সময় হয়েছে।

নিউম্যান এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না করে দৌড় দিল লাইনের সংযোগস্থলগুলির কাছে। পিঠের ব্যাগের মধ্যে থেকে বিশেষভাবে তৈরী বোমা বার করে বসিয়ে দিল এখানে ওখানে। তারপর দ্রুত সরে এল আড়ালে। প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ট্রেনের আলো দেখা গেল আরো কিছুক্ষণ পরে। শব্দ তুলে যন্ত্রদানব এগিয়ে আসছে। উত্তেজনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সময় অপর দিকের ট্রেনটিও দৃষ্টিগোচর হ'ল। দুদিক থেকে দুটি ট্রেন এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে।

উত্তেজনার চরমে বিরাজ করতে লাগল নিউম্যান।

ট্রেন দুটি যদি দুর্ঘটনায় পড়ে তাহলে জংশন স্টেশন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। রিজার্ভ সৈন্য এখানে আনার কোন পথই থাকবে না। সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে নিতে দিন সাতেকের কম লাগবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে বৃটিশ আর ফরাসী সৈন্যরা লেনাস অধিকার করে নিতে পারবে সহজেই।

ট্রেন দুটি আরো কাছে এগিয়ে এসেছে।

নিউম্যান আর স্থির থাকতে পারছে না। সাফল্য না নিরাশা—কোনটির মুখোমুখি হতে হবে। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তেই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে প্রথম ট্রেনের কয়েকটি বগি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দ্বিতীয় ট্রেনের ড্রাইভার পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে প্রাণপণে যন্ত্রদানবকে থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন সমস্ত কিছু আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। দ্বিতীয় ট্রেনখানিও দুর্ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল।

তারপর আরম্ভ হ'ল একটানা বিস্ফোরণের শব্দ। দ্বিতীয় ট্রেন খানিতে নিশ্চয় বিস্ফোরক পদার্থ বয়ে আনা হচ্ছিল। মোট কথা ধ্বংসাত্মক কাজ প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও নিউম্যান অক্ষত রইল না। কোন কিছু একটা ছিটকে এসে তাকে আঘাত করেছে। যন্ত্রণাবোধ কিন্তু তাকে কাতর করে তোলেনি —সে এখন সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা।

চতুর্দিকে তখন ছুটোছুটি হৈ-হাল্লা আরম্ভ হয়ে গেছে। কতলোক মরেছে তার হিসাব এখনই দেওয়া সম্ভব নয়। নিউম্যান এখানে অপেক্ষা করা আর সমীচীন মনে করল না। সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তা ছাড়া ক্ষতস্থানে ওষুধপত্র লাগান এখন আশু প্রয়োজন

নিউম্যানের কিন্তু সেখান থেকে সরে আসা সম্ভব হল না। ঠিক তখনই চতুর্দিকের বড় বড় আলোগুলি জ্বলে উঠল। আলোয় আলো হয়ে উঠল বহুদূর পর্যন্ত। তাছাড়া উদ্ধারকারীদের যাওয়া আসার বিস্তার তার প্রায় কাছাকাছি এসে পোঁছে গেছে।

পালাবার আর কোন পথ নেই দেখে উদ্ধারকারীদের সঙ্গে মিশে গেল নিউম্যান। এখন আর কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। উদ্ধারকারী আর দশটা জার্মান সৈন্যদের মত সেও একজন এই কথাই সকলে ভাববে।

নিউম্যান নিজের আঘাতের কথা ভুলে ভীষণভাবে উদ্ধারের কাজে লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে তার কর্মতৎপরতা অনেকের কাছে প্রশংসা পেতে লাগল। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার পিঠ ঠুকে উৎসাহিত করলেন। এই সময় তিনি দেখতে পেলেন সৈন্যটি আহত অবস্থাতেই কাজ করে চলেছে!

—তুমি তো আহত হয়েছো দেখছি। তোমারও চিকিৎসার দরকার।

—আমি ঠিক আছি স্যার।

—একেবারেই ঠিক নেই। এখুনি তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

নিউম্যানকে তিনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। বলতে গেলে এরপরই বড় রকম বিপদের মুখোমুখি হতে হল তাকে। ক্ষতস্থানে ওষুধপত্র লাগাবার পর, একটু ব্যাণ্ডি খেয়ে নিজের বেডে আরাম করে শুয়ে পড়ল নিউম্যান। কিন্তু পাশ ফিরতেই তার চক্ষুস্থির। পাশের বেডেই শুয়ে রয়েছে সেই মিলিটারি পুলিশ। নিউম্যানকে দেখে সে মহা আশ্চর্য।

তারপরই ঝাঁজিয়ে উঠল এ কি! এখনও রেজিমেণ্টে ফিরে যাওনি? শাস্তির ভয়ও নেই তোমার?

—না···মানে···আমি রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছিলাম। ডিপোয় গিয়ে তাই লরি ধরতে পারিনি।

—মিলিটারি ডিপো খুঁজে পাওনি এও আমায় বিশ্বাস করতে হবে? যাক, যা হবার হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আর অপেক্ষা করবে না, সোজা রেজিমেণ্টে গিয়ে যোগ দেবে।

নিউম্যান অবশ্য বুঝতে পেরেছে, মিলিটারি পুলিশটি এখনও ধরতে পারেনি সে শত্রুপক্ষের লোক। তার ধারণা হয়েছে হয়তো, এই সৈনিকটি ডিউটির ভয়ে রেজিমেণ্ট থেকে দূরে থাকতে চাইছে।

ওদিকে ইংরাজরা লেনাস আক্রমণ করে বসেছে। স্টেশন অকেজো হয়ে যাবার পর আর অপেক্ষা করা অর্থহীন বিবেচনা করে শত্রু সৈন্যের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মরণপণ যুদ্ধ চলেছে। আহত জার্মান সৈন্যদের হাসপাতালে স্থান করে দেবার জন্য আগেকার সকলকে বেড খালি করে দিতে বলা হল।

হাসপাতালের বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নিউম্যান। যাক, ফাঁড়া কেটে গেল। অবশ্য সে তখন কি ভাবেই বা জানবে সামনে আরো বড় ধরনের বিপদ ওৎ পেতে বসে রয়েছে। নিউম্যানের উচিত ছিল আর ঘোরাঘুরি না করে গা ঢাকা দেওয়া।

কিন্তু সে খানিক এদিক-ওদিক করে যেখানে বোমা বসিয়েছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। উদ্দেশ্য, জার্মান বিশেষজ্ঞরা ওই জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখছেন, না যান্ত্রিক গোলযোগে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ওখানে গিয়ে দেখল কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন—আর সেই মিলিটারি পুলিশটি তাঁদের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিউম্যান আর অপেক্ষা না করে সরে পড়ার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু তখন সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। চোখ এড়িয়ে আর সরে পড়ার উপায় নেই। মিলিটারি পুলিশটি তাকে দেখতে পেয়ে গেছে। সঙ্গে, সঙ্গে তার কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

—তুমি এখানে ঘুর ঘুর করছো যে?

নিউম্যান যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি কার্ভিনে

গিয়েছিলাম লরির সন্ধানে। ওখানে গিয়ে দেখলাম ডিপোতে কেউ নেই, তাই চলে আসতে হল।

পুলিশম্যানটি একজন অফিসারকে কার্ভিনের ডিপো সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি আকাশ থেকে পড়লেন, ডিপোতে কেউ নেই মানে! কি সমস্ত বলছো? কিছুক্ষণ আগেও তো ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল।

—আর তোমাকে ছাড়া চলতে পারে না। ব্যাপার বেশ গোলমেলে। আমি টাউন মেজরকে ফোন করে দেখি, তিনি কি বলেন।

নিউম্যানকে পাহারায় রাখা হল। নিজের পরিণামের কথা ভেবে এবার সে ঘামতে আরম্ভ করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফোনে কথা শেষ করে মহা উত্তেজিতভাবে মিলিটারি পুলিশটি ফিরে এল।

—ঠিক ধরেছি। বেশ গোলমাল পাকিয়েছো তুমি। পাঁচ সপ্তাহ ধরে তোমার কোন সন্ধান নেই।

—আমি ইংরাজদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। কোনরকমে ফিরে এসেছি।

—রেজিমেণ্টে ফিরে যাওনি কেন? হঠকারিতার ফল এখন ভোগ কর। কোর্টমার্শাল ঠেকান যাবে না।

নিউম্যানকে রেজিমেণ্টের অ্যাডজুটাণ্টের সামনে উপস্থিত করা হল। সেখানে একজন স্টাফ অফিসারও ছিলেন। এঁকেই দুর্ঘটনাস্থলে পরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল। নিউম্যানকে লক্ষ্য করেই অ্যাডজুটাণ্ট এবং স্টাফ অফিসারের মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগল।

অ্যাডজুটাণ্ট যা বললেন তার সারমর্ম হল, আর্নস্ট কারকেলনের ছুটি নেওয়া বা নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে কোন রেকর্ড নেই। সে পাঁচ সপ্তাহ ধরে কোথায় ছিল তা তিনি বলতে পারেন না। চেহারাটা একই রকম মনে হচ্ছে বটে, তবে চুলের রংটা যেন অন্যরকম।

এরপর আত্মপক্ষ সমর্থনে সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে নিউম্যান অনেক

কথাই বলল—গম্ভীর মুখে সমস্ত কিছু শোনার পর ষ্টাফ অফিসার এমন কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন আর্নস্টের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। শেষরক্ষা আর হল না। আর্নস্টের প্রেমিকা ইর্মার ভাইকে চিনতে পারল না নিউম্যান।

অ্যাডজুটান্ট এবার এক সক্ষম প্রশ্ন করে বসলেন, তোমার পিঠের ব্যাগ থেকে ইংল্যাণ্ডের তৈরী ফিউজ কেন পাওয়া গেছে বলতে পার?

নিউম্যান আর কি বলবে?

সে শুধু অনুভব করল তার জীবনের উপর অন্ধকার পর্দা নেমে আসছে।

—কিছু বলতে পারবে না জানি। তুমি ধরা পড়ে গেছো। আর্নস্ট কারকেলন তুমি নও—অন্য কেউ। তুমি যে ধ্বংসাত্মক কাজ করেছো তার বহু প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। দিন তিনেকের মধ্যেই তোমার কোর্ট মার্শাল হবে।

জেলের একটি ছোট ঘরের মধ্যে চরম হতাশায় ডুবে আছে নিউম্যান। নিজের বোকামির খেসারত যে জীবন দিয়ে দিতে হচ্ছে এ আক্ষেপ রাখার জায়গা নেই। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই যদি লেনাস থেকে পালিয়ে যেত তাহলে আর এই অবস্থায় পড়তে হত না।

আগামীকাল সকালে নিউম্যানকে গুলি করে মারা হবে।

সুজানের কথা মনে পড়ছে। চমৎকার মেয়ে। সেও নিশ্চয় তার জন্য চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে। নিউম্যান সেলের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। হঠাৎ তার খেয়াল হল মাকে শেষ বারের মত একটা চিঠি লেখা দরকার।

দরজার ফোকরের কাছে গিয়ে শাস্ত্রীকে ডেকে সে বলল,

জেলারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই জেলার দেখা দিলেন। যে কয়েদী আগামীকাল মারা যাবে তার ছোট-খাট অনুরোধ তিনি রাখবেন। নিউম্যান কালি-কলম, কাগজ আর খাম চাইল তাঁর কাছে।

তিনি সান্ত্বনাসূচক দুচার কথা বললেন। কলম খাম ইত্যাদি অবশ্যই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সেল থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি জানালেন, একজন ধর্মযাজককেও তিনি পাঠিয়ে দেবেন। এই সময় নাকি ধর্মের কিছু কথা শোনা নিউম্যানের একান্ত প্রয়োজন।

কাগজ কলম ইত্যাদি এসে পড়ার পরই চিঠি লিখতে বসে গেল নিউম্যান। মাকে যখন দীর্ঘ চিঠি লেখা শেষ করেছে তখন ধর্মযাজক দেখা দিলেন। বাইবেল থেকে কিছু ভাল ভাল অংশ পড়ে শোনালেন তিনি। মহা বিরক্তভাবে সমস্ত শুনে গেল সে। তারপর মাকে লেখা চিঠিখানা পড়তে দিল তাঁকে।

এই সময় নিউম্যানের মাথায় এক পরিকল্পনা খেলে গেল। বড় বেশী ঝুঁকি নেওয়া হবে। তা হোক। এখান থেকে পালাবার এই হল শেষ সুযোগ। ধর্মযাজক একটু ঝুঁকে চিঠি পড়ছেন। নিউম্যান তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করার পর, দুই হাত একত্রিত করে ঘাড়ে আঘাত করল তাঁর। অস্ত্র ছাড়া আঘাত করার এ এক বিশেষ পদ্ধতি।

মুখ গুঁজে যাজকমশাই মাটিতে পড়লেন।

একটুও সময় নষ্ট না করে নিউম্যান তাঁর পোশাকগুলি একে একে নিজে পরে ফেলল। বিশাল গ্রেট কোটটি অনেকটা আড়াল দেবে তাকে। মৃদু শব্দ করতেই দরজা খুলে দিল শান্ত্রী। মুখ একপাশে সরিয়ে সেল থেকে বেরিয়ে নিউম্যান এগিয়ে চলল। সেলের ভেতরে একবার উঁকি মেরে দেখলেই সর্বনাশ হয়ে যেত—শান্ত্রী সে রকম কিছু করল না। দরজায় তালা লাগিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল নিজের জায়গায়।

ভয়ে প্রায় আধমরা অবস্থায় দীর্ঘ করিডর অতিক্রম করে বাগানে নামল। প্রতিটি সেলের সামনেই শান্ত্রী ছিল—ধর্মযাজক ফিরে যাচ্ছেন, কাজেই কেউ নিউম্যানকে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কিন্তু নির্বিঘ্নে গেটের কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

কয়েকজন শান্ত্রী জটলা করছে সেখানে। যাজকদের যাওয়া-আসা লেগেই আছে, তাছাড়া তাঁদের আটকে নানা রকম প্রশ্ন করে তবে ভেতরে আসতে দিতে হবে বা বাইরে যেতে দিতে হবে—এমন কোন আদেশ নেই। কাজেই নিউম্যান বাধা পেল না।

বাইরে এসেই সে যতদূর সম্ভব দ্রুত সুজানদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে পা চালাল। তখন রাত দশটার কম হবে না। আলোকিত রাস্তা এড়িয়ে চলারই সে চেষ্টা করছিল। বলা যায় না আবার সেই মিলিটারি পুলিশের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে পারে।

কুগ্রহ বোধহয় একেই বলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিউম্যান গন্তব্যস্থলে পৌঁছাল। তখন সে হাঁপাচ্ছে। টোকা মারল দরজায়। সে জানে এই সময় গৃহকর্তা থাকেন না। তিনি ডিউটিতে গেছেন। সুজান দরজা খুলে দিল। দুশ্চিন্তায় তার মুখ শুকিয়ে রয়েছে। নিউম্যান ঢুকে পড়ল ভেতরে।

—তুমি ফিরে আসবে আমি ভাবিনি।

—আমিও না। উপস্থিত বুদ্ধি আর ভাগ্যের জোরে পালিয়ে আসতে পেরেছি। তুমি আমার জন্য খুবই চিন্তা করছিলে, তাই না?

সুজান নিউম্যানকে জড়িয়ে ধরল।

—চিন্তা হবে না? বুঝতে পেরেছিলাম তুমি ধরা পড়ে গেছো।

—আমার হাতে কিন্তু বেশী সময় নেই।

—জানি। খেয়ে নাও এসে। তারপর—

—তারপর?

—আমিও তোমার সঙ্গে খেয়ে নেব। তারপর বেরিয়ে পড়ব দুজনে।

তুমি! তা হয় না সুজান।

—হয়। হতেই হবে। এস—

খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবার পরই কিন্তু বিপদ দেখা দিল। প্রচণ্ড বিরক্ত হল নিউম্যান নিজের উপর। অনর্থক সময় নষ্ট করে আরেকবার সে নিজের মৃত্যু আমন্ত্রণ করেছে। জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখল কয়েক লরি মিলিটারি পুলিশ এসেছে এই পাড়ায়। অর্থাৎ নিউম্যান যে জেল থেকে অদৃশ্য হয়েছে এ সংবাদ জানাজানি হয়ে গেছে। এখানে শুধু নয়, প্রতিটি অঞ্চলেই মিলিটারি পুলিশ গেছে। লেনাসের প্রতিটি বাড়ী তারা খুঁজে দেখবে।

সুজান টানতে টানতে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এল।

—তুমি তাড়াতাড়ি তোমার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেল।

—জামা-কাপড় খুলে ফেলব?

—হ্যাঁ। এছাড়া বাঁচার আর কোন উপায় নেই।

নিউম্যান তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের সমস্ত কিছু খুলে ফেলল। সুজান সেগুলি রেখে এল অন্যত্র লুকিয়ে। তারপর নিজেও গায়ের সব কিছু খুলে ফেলে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

—এস। শোবে এস।

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছ না! তুমি ভাড়া করা মেয়ে মানুষের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছ। এস—আর দেরী কর না—

নিউম্যান শুয়ে পড়ল সুজানের পাশে।

মাতাল করে তোলবার মত এই পরিবেশ কিন্তু উপভোগ করতে পারছে না দুজনের মধ্যে কেউই। ভয় প্রতিটি শিরার উপর নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। মিনিট কুড়িও কাটেনি বোধ হয়, কয়েক জোড়া লাথির আঘাতে সদর দরজা ভেঙ্গে পড়ল। জন চারেক মিলিটারি পুলিশ হুড়মুড় করে ঢুকলো ঘরে।

সঙ্গে সঙ্গে সুজান লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। সামনেই

একজন উলঙ্গ যুবতীকে দেখতে পাবে তারা আশা করেনি। হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই অশ্লীল মন্তব্য ভেসে এল।

তীক্ষ্ণ গলায় সুজান বলল, একি! কি চাই?

নিউম্যানও উঠে বসেছে বিছানায়।

—এই অসময়ে আপনারা—

—দেখছো না আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি।—সুজান বলল, কাল এস। সারারাত থাকলেও খরচ খুব বেশী হবে না।

লোভে সব কজোড়া চোখই চকচক করছিল। ওদের দোষ দেওয়া যায় না। সুজানের একে মনমাতান স্বাস্থ্য তার উপর আবার উলঙ্গ অবস্থা—যে কোন পুরুষের পক্ষেই নির্বিকার থাকা অসম্ভব। এখন নেহাত ডিউটিতে আছে বলে বাড়াবাড়ি আর কিছু করল না।

একজন শুধু বলল, কালই আসব।

—দল বেঁধে আবার এস না যেন। আমি একা তো। এত ধকল সহ্য করতে পারব না। কাল একজন, পরশু একজন এই ভাবে—কেমন।

যাবার আগে তারা অবশ্য সুজানের গায়ে একটু হাতটাত বুলিয়ে নিল। পলাতক ইংরাজ আর যেখানেই থাকুক এই বাড়ীতে নেই এ বিশ্বাস নিয়েই তারা ফিরে গেল। আবার দুজনে শুয়ে রইল পাশাপাশি। নিউম্যানের বুকের উপর থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। সুজানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মন।

ওকে কাছে টেনে নিল নিউম্যান।

—আমার জন্য তোমাকে কত নীচে নামতে হল বলতো?

—তা হোক। আমি তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি।

—কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমাকে ছোট করতে চাই না সুজান। তবে এই স্বার্থত্যাগের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে রাখব।

আর কথা হল না। ওরা চুপচাপই শুয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ।

মিলিটারি পুলিশের লরিগুলি চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

বিপদের শেষ রেশও মিলিয়ে গেল এই ভাবে। তবুও তারা তখনই বিছানা ছেড়ে উঠল না। উঠল আরো আধঘণ্টা পরে।

জামা-কাপড় পরে নিল তুজনে।

প্লেন নিউম্যানকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছে এবার যেতে হবে সেখানে। প্রতি শেষ রাত্রে প্লেন ওখানে আসবে তাকে তুলে নিয়ে যেতে এই রকম স্থির হয়ে আছে। আজও আসবে নিঃসন্দেহে। শেষবারের মত সুজানকে বোঝাবার চেষ্টা করল নিউম্যান। বৃথা পরিশ্রম। ও সঙ্গে যাবেই।

ওরা যাত্রা করল।

.........আমি পড়া শেষ করলাম। সিনেমার পর্দায় এই ঘটনা যে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে তা আমি স্পষ্টই বুঝলাম। মরিসন ঠিকই বলেছিলেন, বাস্তব সময় সময় গল্পকে হার মানিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা তখন শেষ ধাপে।

মরিসন চমৎকারভাবে বাঁক নিয়ে উইলসায়ার বুলেভার্ডে প্রবেশ করলেন। এই সময়কার লস অ্যানজেলসের বর্ণনা দেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলব, প্রাচুর্য আর বিজ্ঞানের এমন মেশামেশি আমাদের দেশের কোন শহরে দেখা যাবে না।

—কেমন পড়লেন ?

—ভাল লাগল।

—শেষের দিকে দর্শকের মুখ চেয়েই আমাকে একটু হেরফের করতে হয়েছে। নিউম্যান একাই ফিরে গিয়েছিল। আমি সুজানকে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি।

—সুজানের মত মেয়েদের ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত। ওদের কি একেবারেই মিল হয়নি ?

—হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর।

গাড়ী অ্যামব্যাসাডার হোটেলের সামনে এসে থামল। একটি

চমৎকার দিন উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ দিলাম রেক্স মরিসনকে। আমাকে তিনি নিজের ঠিকানা লেখা কার্ড দিলেন। আবার দেখা হবে এই আশা প্রকাশ করে স্টার্ট দিলেন গাড়ীতে।

হোটেলের সামনে তখন নানা মডেলের অজস্র গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে ওখানে কিছু মানুষ জটলা পাকাচ্ছে। একজনের কাছ থেকে জানা গেল, ভেতরে রবার্ট কেনেডির বিজয় উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি যে কোন সময় ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের সকলকে দেখা দিতে পারেন।

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেনেডি পরিবারের নানা উত্থান পতনের ইতিহাস আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল, আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। পৌনে দশটা বেজে গেল ক্রমে। আমি অল্প কিছু দূরের একটি ফিলিং স্টেশনে গিয়ে ভেজিটেবিল সুপ আর হ্যাম স্যাণ্ডউইচ দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম।

এখানকার পেট্রোল স্টেশনগুলিতে খাবার রাখার ব্যবস্থা থাকে।

রাত বাড়তে লাগল।

বারটা বেজে যাবার পর আমি ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। রবার্ট কেনেডিকে চাক্ষুষ করার এই ব্যস্ততার জন্য আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমেরিকায় যখন আরো বহুদিন আমায় থাকতে হবে তখন এই ব্যস্ততা অর্থহীন। তাঁকে পরে চাক্ষুষ দেখবার বহু সুযোগ আমার হাতেই ছিল।

অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর আমায় থামতে হল। মন বলছে, এসে পড়া গেছে যখন—এত সময় নষ্টই হল যখন, তাঁকে না দেখে ফিরে যাওয়া তখন অর্থহীন। আমি আবার ফিরে এলাম হোটেলের গেটের সামনে।

স্থির করলাম আর এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব না। ভেতরে গিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করব। আমার মত বিদেশীর এই অনুরোধ উপেক্ষিত নাও হতে পারে। যে হলে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে।

অল্প সময়ের মধ্যে একটি সিগারেট শেষ করে নিয়ে আমি সাহস সঞ্চয় করে নিলাম। তারপর বাগান পেরিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। সুদৃশ্য কাউণ্টারের সামনে এত রাত্রেও কয়েকজন কর্মচারী কর্মব্যস্ত। ব্যস্তভাবে আসা-যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে কিছু লোককে। চড়া পর্দায় বাঁধা পরিবেশ।

কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে একজনকে বললাম, আমি একজন ভারতীয়। মিঃ কেনেডির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তরুণ হোটেল কর্মচারী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা করতে পারেন।

—যে হলে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে যাবার অনুমতি না পেলে—কথা শেষ হবার আগেই আমার পাশ দিয়ে যিনি যাচ্ছিলেন তিনিই উত্তর দিলেন, একটু দেরী করে ফেলেছেন। অনুষ্ঠান এই মাত্র শেষ হয়ে গেল।

—শেষ হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। অন্ততঃ মিনিট পনেরো আগে এলেও ভাল করতেন। কাল সকালে আসুন দেখা হবে।

বুঝলাম, ইনি ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য এবং কেনেডি উপদল-ভুক্তও বটে। বেশ নিরাশ হলাম। সেই হোটেলের ভেতরে এসে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে চাইলাম—ঘণ্টা খানেক আগে এই ইচ্ছা আমার মনে উদয় হল না কেন! আমি বড় দেরীতে সমস্ত কিছু ভাবি।

বহু লোককে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। এঁরা বিজয় উৎসবে অংশ গ্রহণ করে ফিরে যাচ্ছেন। শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়, বহু

কৃষ্ণাঙ্গও রয়েছেন এঁদের মধ্যে। অনর্থক আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করব। আমিও হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালাম।

ঠিক এই সময়—অবিশ্বাস্য এক ঘটনার মুখোমুখি হলাম।

কয়েক গজও বোধহয় এগুইনি—গুলির শব্দ। উপর্যুপরি কয়েকবার তার পরই মেয়ে পুরুষের মিলিত আর্তচিৎকার। হুড়ো-হুড়ি, কাঁচ ভাঙ্গা—এক কথায় মহা বিশৃঙ্খলার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। যাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন, এক লহমার জন্য হতভম্ব হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁরা দিক পরিবর্তন করে ছুটলেন ঘটনাস্থলের দিকে।

আমি এখন কি করব ভেবে পেলাম না।

এক ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে ছুটতে ছুটতে এলেন।

—মিঃ কেনেডিকে গুলি করা হয়েছে। ডাক্তার—একজন ভাল ডাক্তার চাই। হে ঈশ্বর একি হল—

তিনি কাউন্টারে রাখা ফোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

সত্যি একি হল ?

ওদিকে—

হাসি আনন্দ আর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বিজয় উৎসব শেষ হল।

সকলের সঙ্গে সম্ভব নয়, তবু রবার্ট কেনেডি অনেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। কয়েক সপ্তাহ এক নাগাড়ে সভাসমিতিতে যোগ দিয়ে চলেছেন, আবার আজ সারাটা দিনই ছুটোছুটি গেছে—কতক্ষণ আর ক্লান্তিকে জয় করে থাকা যায়।

মৃদু হেসে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

স্বামীর সঙ্গেই আছেন এথেল।

রবার্ট ভীড় থেকে গা বাঁচাবার জন্য হলের পিছন দিকের দরজা

দিয়ে বেরুলেন। তবুও কিছু লোক তাঁর পিছু ছাড়ল না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। তাঁর শ্যালক আছেন পিছনে। শর্টকার্ট করে নিজের ঘরে পৌঁছাবার জন্য রবার্ট কেনেডি কিচেনের মধ্যে দিয়ে এগুলেন।

দীর্ঘ কিচেনের মাঝামাঝি এসেছেন—একজন খর্বাকৃতি ব্যক্তি দ্রুত এগিয়ে এল তাঁর দিকে। চরম বিপদের যে মুখোমুখি হয়েছেন মোটেই বুঝতে পারেন নি। তাঁর পিছনে বা পাশাপাশি যাঁরা ছিলেন, কি ঘটতে চলেছে তাঁদের পক্ষেও অনুমান করা কঠিন ছিল।

খর্বাকৃতি ব্যক্তিটি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিভলভার বার করল পকেট থেকে। কেনেডি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন এবার কি ঘটবে, কিন্তু বাধা দেবার সুযোগ পেলেন না, তার আগেই গুলি ছুটে এল। প্রথমে একটি। তারপর একঝাঁক। সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে যায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

রবার্ট রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে যান মাটিতে। পড়বার সময় জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বললেন। গুলি আরো কয়েক জনের গায়ে লেগেছে। ততক্ষণে একজন নিগ্রো ভদ্রলোক আততায়ীকে ধরে ফেলেছেন। প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়া এথেল পা মুড়ে বসে পড়লেন স্বামীর পাশে।

—বব—বব—একি হল আমার—

রাত তখন ঠিক সওয়া বারটা।

আমি ফিরে চলেছি।

মধ্য রাত্রে ঝিমিয়ে পড়া লস অ্যানজেলসের বিলাসবহুল উইলশায়ার বুলেভার্ড মাড়িয়ে আমি ফিরে চলেছি নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে। আমি আমেরিকান নই, আমেরিকার রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কেনেডি পরিবারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই, এমন কি

রবার্ট কেনোডকে কোনদিন চাক্ষুষ করার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি—তবু —তবু—আমি বুকের মধ্যেকার হাহাকারকে থামাতে পাচ্ছি না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান চূড়ান্ত পর্যায়ে কাজ করবে সন্দেহ নেই। তবু কি রবার্ট কেনেডিকে বাঁচান যাবে? হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শুনেছি, তিনটি গুলি তাঁর শরীর ভেদ করেছে। তার মধ্যে একটি আবার প্রবেশ করেছে মস্তিষ্কে।

আমেরিকার রাজনীতি রক্তপিচ্ছিল পথের উপর দিয়েই এগিয়ে চলেছে। চক্রান্তের বিরাট জাল বিস্তারিত চতুর্দিকে। ওই জালেরই শিকার লিঙ্কন, কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, এবং প্রশাসন যাই বলুন না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবার্টও ওই চক্রান্তেরই বলি।

উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গরা এবং শাসন-চক্রের কয়েকজন কখনই তাঁকে পছন্দ করেনি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন ভিয়েৎনামের যুদ্ধ বন্ধ হোক। বলেছিলেন, ওখান থেকে আমাদের সরে আসা উচিত। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসন ব্যবস্থায় ভিয়েৎকংদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের অভ্যন্তরেই আমাদের এখন প্রচুর কাজ। বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দাঙ্গা—এগুলির সুষ্ঠু সমাধান দরকার।

তিনি বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে আমেরিকা একটি উন্নত দেশ। তবে ইদানিং যে লক্ষ্যহীনতা, যে হানাহানি চলেছে তা আশঙ্কার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

—এই সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আপনারা যদি পাবলাম ( Publum ) আর ট্যাংকু লাইজার-এ শান্তি চান তবে আর কাউকে ভোট দিন—মিসিসিপির কালো বালক যখন না খেতে পেয়ে মারা যায় তখন আমার কাছে শান্তির রাজনীতি অবান্তর!

কথা ও কাজে যিনি এত অনমনীয় তাঁকে কি বাঁচিয়ে রাখা যায়?

ভেঙ্গে পড়া মন নিয়ে আমি যখন নিজের আস্তানায় পৌঁছালাম তখন রাত তিনটে। অ্যালার্ম সুইচ টিপতেই গার্ড এসে দরজা খুলে

দিল। আমি লিফ্‌টের কাছে এগিয়ে গেলাম। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। লিফ্‌টম্যানের দরকার পড়ে না, নইলে বাকী রাতটুকু আমাকে এখানেই কাটিয়ে দিতে হত।

পাশাপাশি বেশ কয়েকটি লিফ্‌ট আছে।

আমি একটিতে প্রবেশ করতে যাব দেখলাম, হিল্ডা নেমে এল। বাইরে বেরুবার মত সাজ-পোশাক থাকলেও মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। এত রাত্রে কোথায় চলেছে। সেও নিশ্চয় এই সময় আমাকে এখানে আশা করেনি।

থমকে দাঁড়াল।

প্রশ্ন করলাম, কোথায় চলেছো এখন?

সে পাল্টা প্রশ্ন করল, কোথা থেকে আসছো তুমি?

—মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি অ্যামব্যাসাডার হোটেল থেকে আসছি। রবার্ট কেনেডিকে গুলি করা হয়েছে।

—তুমি জান তাহলে? ওখানেই ছিলে—কি আশ্চর্য।

বিস্মিত গলায় বললাম তাঁকে গুলি করা হয়েছে তুমি কিভাবে জানলে?

তোমার তো ঘুমিয়ে থাকার কথা।

—ঠিকই ধরেছো। মাত্র মিনিট পনেরো আগে ফোনে সংবাদ পেয়েছি। তুমি বোধহয় জান না, আমার বোন মিঃ কেনেডির সেক্রেটারী।

—সত্যি জানতাম না। তুমি এখন—

—হাসপাতালে যাচ্ছি।

—এত রাত্রে তোমার একা যাওয়াটা কি ঠিক হবে। আমি বরং তোমার সঙ্গে যাই।

—ধন্যবাদ। চিন্তার কোন কারণ নেই। বাইরে গাড়ীটা পার্ক করা রয়েছে। আমি একা বেশ চলে যেতে পারব। তুমি বরং একটু বিশ্রাম করে নাও।

ফিকে হেসে হিলের মৃদু শব্দ তুলে হিল্ডা চলে গেল।

আমি লিফ্‌টে প্রবেশ করলাম।

*　　　　*　　　　*

সারাটা দিন কাজে মন বসাতে পারলাম না।

রবার্ট কেনেডি এখনও বেঁচে আছেন এ সংবাদ এর তার মুখ থেকে পেয়েছি। তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে কেউই বলতে পাচ্ছে না। আজকের দৈনিকপত্রে নিশ্চয় অনেক সংবাদ আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাইনি। কাজে মন বসাতে না পারলে কি হবে, ভাগ্যগুণে আজকেই কাজের চাপ অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী।

সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ কর্মী এবং কিছু শ্বেতাঙ্গর বেশ মুহ্যমান অবস্থা। রবার্ট কেনেডির জীবন শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে কি না এই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে অবিরাম আলোচনা চলেছে। আবার এমন অনেকে রয়েছেন যাঁদের ভাব দেখে মনে হয়, গত রাত্রে এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য উদ্বিগ্ন অবস্থায় সময় কাটাতে হবে।

আজ হিল্ডা কাজে আসেনি।

তার বোন অর্থাৎ রবার্ট কেনেডির লেডি সেক্রেটারীও আহত হয়েছে। আততায়ী যখন এক ঝাঁক গুলি বৃষ্টি করে তখন একটি গুলি মহিলাটির গায়েও লাগে। কাল কিন্তু একথা আমায় হিল্ডা বলেনি। হয়তো সে তখন নিজেও জানত না। আমি ব্যাপারটা জানতে পারলাম ফ্যাকট্রিতে এসে। বললেন আমার ওপরওয়ালা।

এখন তার বোন কেমন আছে কে জানে?

আজ আবার আরেক ঝামেলা আছে।

প্রতিদিন যে সময় কাজ শেষ করে ফিরে যাই, আজ সে সময় যাওয়া সম্ভব হবে না। ভেষজ বিজ্ঞানের উপর এক সেমিনারের ব্যবস্থা হয়েছে। বক্তৃতার কচকচি আমার ভাল লাগে না। লাগলে কি হবে ওখানে আমার উপস্থিত থাকতেই হবে। ওই সমস্ত বক্তৃতা শোনা নাকি আমার শিক্ষারই অঙ্গ।

দুপুর কেটে গেল কোন রকমে।

ছুটির পর আমি সেমিনারে যোগ দিলাম। যোগ দিতে
হলাম আর কি। আমেরিকার তিনজন বিখ্যাত ভেষজ বি
ছাড়াও পশ্চিম জার্মানী থেকে একজন এসেছেন। এছাড়া
বিশেষজ্ঞরা তো আছেনই।

বক্তৃতা আরম্ভ হল।

একের পর এক বক্তা বলে চলেছেন। এই সমস্ত পাণ্ডিত
তথ্যবহুল বক্তৃতা শোনার সুযোগ পাওয়া আমাদের লাইনে
কোন লোকের পক্ষে চরম ভাগ্যের বিষয়। আমি কিন্তু তবু মন
হতে পাচ্ছিলাম না। তেতো মন নিয়ে বসে ছিলাম মাথা হেঁট

অনুষ্ঠান শেষ হল সাড়ে নটার সময়।

এরপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

মোট কথা, আমি সমস্ত কিছু শেষ করে নিজের অ্যাপার্ট
পৌঁছালাম রাত এগারটার পর। বেশ ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। বে
গা এলিয়ে দেবার পর দ্রুত চিন্তা করলাম, রবার্ট কেনেডির
পেতে হলে এখন কোথায় অনুসন্ধান করা যায়?

কোন পুলিশ স্টেশনে অনুসন্ধান করাই বোধহয় সবচেয়ে
হবে। গাইড থেকে ডাউন টাউনের প্রধান পুলিশ কার্য
ফোন নম্বর দেখে নিয়ে ওখানে যোগাযোগ করলাম। সংবাদ
গেল মিঃ কেনেডি বেঁচে আছেন। তাঁকে স্বাভাবিক করে ে
আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দরজার কাছেই দৈনিক পত্রখানা পড়েছিল। ঘুমতে
আগে আজকের সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে নেবার লোভ সংবরণ
পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে সবে মাটি থেকে তুলে নিতে
দরজায় মৃদু করাঘাত হল। এত রাত্রে আবার কে এল।

দরজা খুলে দিলাম।

হিল্ডা ডেভিস।

জামা-কাপড়ে তেমন পারিপাট্য নেই। শ্যাম্পেনে জড়...

বাদামী রং-এর চুল উস্কখুস্ক—নীল চোখের তারায় তারায় ক্লান্তি। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ওর বোন বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছিল। সে ভালো আছে তো? নাকি তার কিছু—

হিল্ডা আমাকে পাশ কাটিয়ে সোফায় গিয়ে বসল।

ঘরে ব্র্যাণ্ডি আর বিয়ারের বোতল ছিল। গেলাসে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ওর হাতে দিলাম। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই উত্তেজক পানীয়টুকু খেয়ে ফেলল ও। তারপর সেণ্টারপিসের উপর রাখা সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। আমি বসলাম ওর পাশে।

—কোথা থেকে আসছো এখন?

—ওয়েষ্ট বে নার্সিং হোম থেকে। সারাটা দিন ভীষণ ধকল গেছে।

—তোমার বোন—

—ঘুমচ্ছে দেখে এসেছি। ওয়েষ্ট বে-তে ওকে রাখা হয়েছে। ডাক্তাররা বললেন আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

—সত্যি কথা বলতে কি আমারও কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল। বুলেট বের করে নেবার পরই বোধহয়—

—বুলেট ওর শরীরে প্রবেশ করেনি, বাঁ ধারের উরুর মাংস কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাইতো বেঁচে গেল এ যাত্রায়।

হিল্ডা সিগারেট ধরাল।

আমিও সিগারেট একটা নিয়ে বললাম মিঃ কেনেডির কোন সংবাদ জান? নানা ঝামেলায় আমি খবরের কাগজ পড়তে পারিনি। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে ফোনে জানতে পেরেছি, চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

—অ্যামব্যাসাডার হোটেল থেকে ওঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় সেণ্ট্রাল এমারজেন্সি রিসিভিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ওখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে গুড সামারিটান হাসপাতালে। মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এখন তিনি একটু ভালর দিকে।

—এখনও গুড সামারিটান হাসপাতালেই আছেন বোধহয়?

—হ্যাঁ। শুধু তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্ত করা হয়েছে।

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, আক্রমণকারী ধরা পড়েছে শুনলাম। কোন ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেছে নাকি? এ ব্যাপারে তুমি কিছু জান?

পুলিশের অজস্র প্রশ্নের উত্তরে সে নাকি কিছুই বলেনি এখন পর্যন্ত। লোকটার নাম শিরহান। তুমি শুনলে অবাক হবে, তোমারই মত এশিয়াবাসী।

সত্যি অবাক হলাম।

—বল কি! ইণ্ডিয়ার লোক নয় তো?

—না জর্ডন থেকে আমেরিকায় এসেছিল। এখন এখানকার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে।

সিগারেটের টুকরো অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে হিল্ডা বলল, ভেবেছিলাম এসে শুয়ে পড়ব। এখন মনে হচ্ছে সামারিটান হাসপাতালে একবার যাওয়া দরকার। তুমি আমার সঙ্গে?

মন্দ প্রস্তাব নয়।

যদিও ক্লান্ত আছি তবু যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

—যেতে আপত্তি নেই। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে না হয়ে থাকলে বল, ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—খাবার ইচ্ছে একটুও নেই। বেরিয়ে পড়ি চল।

আমার তৈরী হবার কিছু ছিল না। অফিস থেকে এসে খোলার অবসর আর পেলাম কোথায়? বেরিয়ে পড়লা গতকাল থেকে ঘুমের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নে সামারিটান হাসপাতালের সামনে যখন পৌঁছালাম তখ কাঁটায় একটা কুড়ি।

লোকে লোকারণ্য।

কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গ দুই দলের লোকেরই ভীড়।